যুক্তরাষ্ট্রে জীবন ধারা

ব্রেডফোর্ড স্মিথ

—: অনুবাদ :—

অজয় চক্রবর্ত্তী

পরিচয় পাবলিশার্স

প্রকাশক :
পরিচয় পাবলিশার্স
২১, হায়াৎ খাঁ লেন
কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৭

মুদ্রাকর :
সত্যেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত
নিরুপমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২১, হায়াৎ খাঁ লেন,
কলিকাতা —৯

ভূমিকা

মানব সংস্কৃতির মিলন চিরকালই আমার উৎসাহ সৃষ্টি করে এসেছে এবং আমার প্রথম পূর্ণাঙ্গ বৃত্তি, যা আমাকে শিকোগলকে জাপানে নিয়ে গিয়েছিল, তা হচ্ছে আমার স্বদেশ নিউ ইংল্যাণ্ডের চেয়ে বহুলাংশে ভিন্নতর একটি সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হওয়া। তারপর থেকে কোন না কোন উপায়ে আমি সংস্কৃতি বিনিময়ের সঙ্গেই জড়িত আছি এবং উপন্যাস ও উপন্যাস-নয় এমন অনেকগুলি পুস্তকে আমি এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।

এক অথবা একাধিক বৎসরের জন্য বিদ্যার্জনের অভিলাষে যুক্তরাষ্ট্রে আগত পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের ছাত্রদের নিকট গত দশবছর ধরে প্রতি গ্রীষ্মকালে একটি ছ'সপ্তাহব্যাপী আমেরিকান্ 'সেমিনার' উপস্থাপিত করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। বিভিন্ন বিদ্যায়তনে ছড়িয়ে পড়বার আগে তাদের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ জন ভারমণ্ট-এর বেনিংটন কলেজের গ্রাম্য 'ক্যাম্পাসে' সমবেত হয়। আমেরিকান্ 'ক্যাম্পাসগুলি' প্রত্যেকটি অনাড়ম্বর জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ সমেত এক একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ সংস্থা। ছাত্ররা 'ক্যাম্পাসে' বাস করে (পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক হোটেল রয়েছে), একত্রে আহার গ্রহণ করে এবং শিক্ষকদের অন্তরঙ্গ সাহচর্য লাভ করে। এই সাহচর্য কেবলমাত্র বক্তৃতা এবং আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ নয়। আহারকালে এবং অবসর বিনোদনকালীন কার্যাবলীতেও তারা পরস্পরের নিকট সান্নিধ্য লাভ করে। ছাত্ররা নিকটবর্তী অঞ্চলের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ, নৈসর্গিক অথবা শিল্পসুষমামণ্ডিত স্থানগুলিও পরিদর্শন করে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ছাত্ররা আমেরিকান পরিবারগুলির সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হতে পারে। ক্যাম্পাস-জীবনের শেষ পাঁচদিন তারা কোন একটি পরিবারের সঙ্গে পরিবারস্থ একজনের মতই বাস করে। অধিকাংশ ছাত্রদের মতে সমগ্র কার্যক্রমের মধ্যে শেষোক্তটিই সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ। তাদের এই অভিমত আমাদের বক্তৃতাবলীর প্রতি কটাক্ষপাত করলেও আমাদের মনক্ষুন্ন হবার কোন প্রয়োজন হয়না কারণ আমরা জানি যে কোন সংস্কৃতির অংশীদারী হবার মনোভাবটা কেবলমাত্র চিন্তার সাহায্যেই আসেনা, এ জিনিস উপলব্ধি সাপেক্ষ। মায়ামমতা এবং বিভিন্ন পরিস্থিতির সমাবেশ, যা পরিবার—পরিজন, প্রতিবেশী, শিক্ষক অথবা সমবয়সী বান্ধব প্রভৃতি সকলের সঙ্গে আমাদের সংযুক্ত করে রেখেছে,

তার দ্বারা আমরা আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গেও অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রয়েছি। সুতরাং, একইভাবে অন্য সংস্কৃতির রসাস্বাদনের জন্যও আমাদের সহজবোধ্য মানবিক আবেদনের পথ খুঁজে নিতে হবে। আলোচ্য পুস্তক এ ধরণের ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতার স্থান গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু পরস্পরকে বোঝবার জন্য একমাত্র ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতাই গ্যারান্টিবিশেষ নয়। কোন দেশ এবং জাতিকে বোঝবার জন্য বহুবিধ বিষয় জানবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু কোন দেশের অধিবাসীদের কাছ থেকে তাদের নিজেদের দেশ সম্বন্ধে প্রায়শঃই কিছু জানা যায়না কারণ তারা তাদের দেশের সব কিছুকেই সবার জানা বিষয় মনে করে থাকে, সে সম্পর্কে বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন আছে তারা ভাবতে পারে না।

আলোচ্য পুস্তকের উদ্দেশ্য হল যুক্তরাষ্ট্রের জাতি, জনপদ এবং সংস্কৃতির মর্মানুধাবনের জন্য কয়েকটি পথ উন্মোচনের চেষ্টা করা। পৃথিবীর সকল অংশের অধিবাসীদের সমন্বয়ে গঠিত বলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংস্কৃতির ব্যাখ্যা সহজসাধ্য নয়। তথাপি পৃথিবীর অন্যান্য সংস্কৃতির সঙ্গে যোগসূত্র এত নিবিড় বলেই এ সংস্কৃতি বোঝাপড়ার উদ্দেশ্যে নিজেকে অনেক ব্যাপকভাবে মেলে দিয়েছে। এর সঙ্গে প্রাচীন রোমাণ এ্যাম্ফিথিয়েটারের তুলনা করা চলে। কোন সাধারণ গৃহে প্রবেশ করবার উপায় একমাত্র সম্মুখবর্তী প্রবেশপথটি, সে ক্ষেত্রে এ্যাম্ফিথিয়েটারের চতুষ্পার্শ্বেই ছড়ানো থাকে ভিতরে ঢুকবার রাস্তা।

যুক্তরাষ্ট্রীয় জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হতে নবাগত বৈদেশিক ছাত্রদের সহায়তা করবার জন্য এই পুস্তকটি রচিত হয়। এর অপর একটি উদ্দেশ্য হল যে এর সাহায্যে আমেরিকাবাসীর নিজেদের সম্বন্ধে চিন্তার পথও অধিকতর স্বচ্ছ হয়ে উঠবে।

আলোচ্য পুস্তকটি প্রধান ভারতীয় ভাষাসমূহে মুদ্রিত করার ব্যবস্থা চলেছে এবং সৌভাগ্যক্রমে ঠিক এই সময়েই আমি সস্ত্রীক কয়েক বছরের জন্য ভারতে বসবাস করতে এসেছি। লেখকের পক্ষে এ ধরণের স্বাগত সম্ভাষণই একান্ত কাম্য। এ ছাড়া এ কথাও আনন্দের সঙ্গে স্মরণযোগ্য যে, যেসময়ে আমরা এই মহান দেশের সঙ্গে পরিচিত হতে গিয়ে বিভিন্ন ভারতীয় বন্ধুদের কাছ থেকে উদার সহায়তা লাভ করে অপরিসীম উপকৃত হয়েছি, সে সময় ভারতে এই পুস্তকটি প্রকাশিত হয়ে আমাদের নিজেদের দেশকে বোঝাবার পথেও সামান্য কিছু পাথেয় প্রদান করেছে।

আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার ব্যাপারে অনেক প্রলাপোক্তি করা হয়েছে। পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করে বলেই মানুষ প্রায়শঃই পরস্পরকে অপছন্দ করে। তথাপি একথাও সত্য যে অজ্ঞতা—প্রসূত ভীতির মধ্যথেকেই অনেকাংশে এই অসদ্‌ভাবের জন্ম। যেসবক্ষেত্রে সুষ্ঠু বোঝাপড়া পরস্পরকে একমত হতে অথবা বিদ্বেষহীন মত পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে সেসবক্ষেত্রে বর্তমান পুস্তকের নিশ্চয়ই কিছু উপযোগীতা আছে। যা হোক, বর্তমান প্রসঙ্গকে ভারতবর্ষে বসবাস করবার সৌভাগ্য অর্জনের যৎকিঞ্চিত ধন্যবাদস্বরূপ নিবেদন করতে পেরে আমি আনন্দিত। এই ভারতবর্ষ, যার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভূত পার্থক্য থাকা সত্বেও যারা অতিথিকে আমাদেরই মত সাদর অভ্যর্থনা জানাতে অভ্যস্থ, আত্মিক এবং নৈতিক শক্তিতে যারা আমাদের মতই অকুণ্ঠ বিশ্বাসী এবং যারা আমাদেরই মত আনন্দস্পন্দিত।

ব্রেডফোর্ড স্মিথ

সংস্কৃতির অনুভূতি

সকল সভ্যতাই এক একটি পরীক্ষা আর টিকে থাকাটাই তার সাফল্যের মাপকাঠি। অধিকাংশ সভ্যতার সঙ্গে মার্কিন সভ্যতার তফাত এই যে, সুরু থেকেই সে পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে চলেছে। প্লাইমাউথ আর বোষ্টনের ছোট ছোট ধর্মীয় গোষ্ঠী, কন্‌টিনেন্‌টাল কংগ্রেস, সংবিধান অনুযায়ী গঠিত ফেডারেল গভর্ণমেন্ট, জ্যাকসনধর্মী গণতন্ত্র, থিয়োডোর রুজভেল্টের স্কোয়ার ডিল, ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের নিউ ডিল, মার্শাল প্ল্যান, তারপর ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন—সবই আশাজনকভাবে তৎপর, বুঝেসুঝে পরীক্ষামূলক।

ইউরোপীয়েরা আমেরিকায় এলে যে নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হন, তা তাঁদের নতুনকে পরীক্ষা করে দেখতে বাধ্য করে। সার দিতে হলে বীজের পাহাড়গুলোর ভিতরে মাছ পুরে দিতে হয়—রেড ইণ্ডিয়ান বন্ধু স্কোয়ানটোর কাছে এ কথা জানবার আগে আর ধর্মগোলার বদলে নিজেদের চাহিদানুযায়ী উৎপাদনে মন না দেওয়া অবধি, নবাগতের দল চাষবাসে ব্যর্থই হয়েছে। প্লাইমাউথ-এ পৌঁছনোর পরের প্রথম ক'বছরের অপূর্ব বিবরণে উইলিয়ম ব্র্যাডফোর্ড অরণ্যপ্রকৃতি আয়ত্ত করতে গিয়ে তিনি আর তাঁর বন্ধুরা বারবার কি ভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তা লিখে গেছেন। জেমস টাউন ও প্লাইমাউথ-এর বাসিন্দারা টিকে থাকবার পথের সঙ্গে পরিচিত হবার আগেই বেশ কতকগুলো ইংরেজ উপনিবেশ ধ্বংস হয়ে যায় অথবা পরিত্যক্ত হয়। তাই, সুরু থেকেই, আমেরিকানদের* নতুন ভাবধারা গ্রহণ করতে হয়েছে, সেগুলো যাচাই করতে গিয়ে ব্যর্থ হতে হয়েছে, তারপর আবার নতুন করে চেষ্টা করতে হয়েছে।

লিঙ্কলন তাঁর এক মহত্তম ভাষণে—যা প্রতিটি আমেরিকানের কানে এখনও অনুরণিত হয়—বলেছিলেন যে, আমেরিকান ভাবধারার সার কথাই হল পরীক্ষা; সমান করে সব মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে—এই ভাবধারার

---

* অপর যে সব জাতের লোকেরা সমভাবে আমেরিকান হিসেবে অভিহিত হবার দাবী রাখেন, তাঁদের বিরাগভাজন হবার ঝুঁকি নিয়েই বলছি যে, কথাটার প্রচলিত ধারা অনুসরণ করাই বিধেয়। ইংরেজী ভাষায় অন্তত পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের আমেরিকান এবং বাকী যাঁরা আমেরিকান হিসাবে গ্রহণযোগ্য নন, তাঁদের যুক্তরাষ্ট্রীয় বলা হয়।

উদ্দেশ্যেই এই পরীক্ষা উৎসর্গীকৃত। গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, "এই ভাবধারায় এইভাবে উৎসর্গীকৃত কোন দেশ দীর্ঘদিন সইতে পারে কি'না গৃহযুদ্ধ ছিল তারই পরীক্ষা।"

তবুও, বলতে গেলে, নিজস্ব সংস্কৃতি সম্পর্কে আমেরিকানদের সামান্যই ধারণা আছে। আমাদের সাগরপারের বন্ধুদের ধারণা অবশ্য আরও কম। জানবার দিকে আছে অনেক কিছুই, কিন্তু বুঝবার দিকটা শূন্য। আমাদের জীবনের বাইরের প্রকাশটা ব্যাপকভাবে পরিচিতি পেয়েছে। ঐহিক উন্নতি, শিল্প ও সামরিক-শক্তি, ব্যবসায় আর বে-সরকারী শিল্পের প্রতি আমাদের আগ্রহ, মেয়েদের স্মার্টনেশ, ছেলেদের আধিপত্য পরায়ণতা—এসব কথাই সবাই জানে। কিন্তু যে-ভাবধারা এগুলোকে জীয়িয়ে রেখেছে তার খবর কেউ রাখে না। আমেরিকানদের আচরণ আর তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, প্রায়শঃই তাঁরা বাইরেরটা দেখেই থেমে যান; যে ঐতিহাসিক অথবা সাংস্কৃতিক কাঠামোর উপর মূল সঙ্গীতটি দাঁড়িয়ে আছে, না বুঝে তার প্রশংসা, নয়তো নিন্দে করেন।

আর একটা বড় রকমের বাধা হল ব্যক্তিবিশেষের সব রকমের স্বভাবকে 'আমেরিকান' বলে চালিয়ে দেওয়া। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমেরিকানদের তথাকথিত জড়বাদের উল্লেখ করা যেতে পারে। খুব বেশী হলে ওটা মধ্যবিত্ত সমাজের সার্বজনীন ব্যাপার, কারণ অধিকাংশ আমেরিকানই মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে এসেছে। উদ্ধত স্বভাব, হুল্লোরবাজ, রক্ষণশীল, হুঁশিয়ার আর অমিতাহারী হিসেবে যে আমেরিকান বিদেশী পর্যবেক্ষকদের বিস্মিত করে, সে হয়ত শুধুমাত্র তার পেশা, পারিবারিক ঐতিহ্য, ধর্ম, বয়েস আর বিত্তেরই অভিব্যক্তি। পেশাগত ঐতিহ্য, ধর্ম অথবা সমৃদ্ধি যেখানে সমান পর্যায়ের, সেখানেই এই বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হতে পারে। তা হলেও এমন প্রকৃতি, ধরন-ধারন, ভাবভঙ্গি, আবেগ, উচ্চাশা, বিশ্বাস আর আনুগত্যও আছে যা শুধুমাত্র আমেরিকানদেরই বৈশিষ্ট্য। এমন সংগঠন, দল, সংস্থা আর উৎসবও আছে যা, বিশেষ করে, মার্কিন সমাজেই পাবেন। সাংস্কৃতিক অনুভবের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এগুলো জানবার চাবিকাঠি।

সংস্কৃতি কি?

সমাজের জীবন যাপন পদ্ধতিই হল তার সংস্কৃতি। এই পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে তার বিশ্বাস, সঞ্চিত জ্ঞান আর যে মূল্যবোধ নিয়ে সে সমাজ বেঁচে থাকে।

আরও রয়েছে শিল্পকলা, পারিবারিক জীবন, শিশুপালন, বিবাহ আর বাগ্‌দান রীতি, শিক্ষা, পেশা, সরকার, সংক্ষেপে—সমাজের সমস্ত সক্রিয় ঐতিহ্য যা সমাজের সকলের নাগালের বাইরে নয়।

সংস্কৃতির প্রত্যয় আমাদের সমাজটাকে সামগ্রিকভাবে দেখবার সুযোগ দেয়। পরিস্কার হয়ে যায় যে, সাংস্কৃতিক সত্তার অংশ হিসেবে না নিলে কোন গোষ্ঠীর আচরণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোন ধারণাই করা যায় না। অতীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে যা কিছু লেখা হয়েছে, তার বেশীর ভাগই অপর্য্যাপ্ত, কারণ তাতে আলাদা করে কিছু "মার্কিন" প্রকৃতি দেখান হয়েছে; এই ব্যাপারে নৈতিক বিচারবোধের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে এবং সূত্রানুসন্ধানের অথবা সার্বিক সত্তার সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেখবার কোন চেষ্টাই হয়নি। কোন জাতিকে "জড়বাদী" অথবা "অর্থগৃধ্নু" কিংবা "অতি-কামাতুর" বা "অত্যন্ত অনুগত" আখ্যা দেবার অর্থই হল অতীত ঐতিহ্যের পরোয়া না করে নৈতিক দণ্ড চাপিয়ে দেওয়া।

যে মানুষকে নিয়ে সমাজ গড়ে ওঠে, তাকে নানানভাবে বিভক্ত আর সংগঠিত করা হয়ে থাকে। বয়েস, নারীপুরুষ, মর্য্যাদা, বিশেষ ধরণের পেশা ও পরিবার অনুসারে এবং নানান ধরণের সংগঠিত দলে—ছাত্র, সম-সামাজিক ভ্রাতৃত্ব, গোপন নির্দেশ, খেলাধূলা, ক্লাব, অচি-মণ্ডলী তথা সমাজের সকলেরই স্থান আছে। তফাত থাকলেও সমাজের সকলের আচরণের মধ্যে কিছু মিলও আছে বৈকি। আবার সমাজের বিশেষ কোন গোষ্ঠীর বিশেষ ধরণের ক্ষমতাও থাকতে পারে।

সংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব নির্ধারণে সহায়ক। নিজের গণ্ডীর মধ্যে সংস্কৃতি আবার নানান ধরণের ব্যক্তিত্ব সৃষ্টিও করে। ব্যক্তিত্বের এই বৃহত্তর ক্ষেত্র থেকে জাতীয় চরিত্রকে চিনে নেয়া যায়, কারণ এই সংস্কৃতির আওতায় যাঁরা থাকেন, একই ঐতিহ্য তাঁদের প্রভাবিত করে। তাই কল্পিত, অস্পষ্ট, পরিবার অথবা জাতিগত প্রকৃতির পরিবর্তে সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত যোগসূত্রের অনুসন্ধান করাই বিধেয়।

মার্কিন পিতা-মাতা এবং মার্কিন মুলুকে জন্ম নিলেও ছেলেকে যদি ছেলে বেলাতেই ফ্রান্সে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে একটি ফরাসী পরিবারে সে যদি লালিতপালিত হয়, খতিয়ে দেখতে গেলে সে-ছেলে যে জাতেরই হোক না কেন, বড় হয়ে সে ফরাসীই হবে। সেই রকম একজন চীনা তরুণ কোন মার্কিন পরিবারে মানুষ হলে, সে আমেরিকানদের মতোই কথা বলবে, কাজ করবে,

ভাববে। এমন কি, দেখতেও সে আমেরিকানদের মতোই হবে, কারণ আবহাওয়া আর আহার্য তার আয়তন বাড়িয়ে দেবে, আর যে পরিবারে মানুষ হ'ল তাদের মুখের ভাবভঙ্গি সে অনুকরণ করবে। দেহের গড়ন আর গায়ের রং মা বাবার মতো মঙ্গোলীয় ধাঁচের থেকে গেলেও তার আচরণ, স্বভাব আর আশা-আকাঙ্ক্ষা যে পরিবারে প্রতিপালিত হল, তাঁদের মতোই হবে।

তাই কোন জাতিকে বুঝতে হলে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ (ভৌগলিক অবস্থিতি, আবহাওয়া, প্রাকৃতিক সম্পদ, খাদ্য, বিদ্যুৎসম্পদ ও শিল্প), মানবিক প্রভাব (পিতা-মাতা, বন্ধু-বান্ধব, পাড়াপ্রতিবেশী, সহকর্মী, শিক্ষক, পুলিশ ও অন্যান্য পদস্থ কর্মচারী), সামাজিক সংগঠন (পরিবার, স্কুল, ধর্ম-সংস্থা, সমগোত্রীয় সংস্থা, সরকার, পেশা), তার শিল্প অভিব্যক্তি, আদর্শধারা (যা প্রকাশ পায় স্থানীয় অনুষ্ঠানে, সংবিধানে, ধর্মে, দলীয় আনুগত্যে, পূর্বপুরুষ আরাধনায়) এবং আত্ম-সংরক্ষণ, আত্ম-জনন ও আত্ম-অভিব্যক্তি,—এই মৌলিক তিনটি চাহিদা পূরণের জন্যে যে ভাবে তারা বেরিয়ে পড়ে।

সংস্কৃতি মাত্রেই বোনা বস্ত্রখণ্ডের মতো—যার প্রতিটি অংশ অপরটার সঙ্গে মিশে থাকে। মনে মনে অর্থনীতি আর সরকার অথবা শিক্ষা আমোদ-প্রমোদ (স্পষ্ট বলেই এই দুটো দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করছি) সম্পর্কে যে পার্থক্যই আমরা করি না কেন, তা বাইরের যতটা, আসলে ততটা নয়। কর-নির্ধারক, আন্তর্রাজ্য বাণিজ্যনিয়ামক, শ্রম-বিরোধে সালিশ এবং বাকী সব ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা বর্ণনা না করে আমাদের অর্থনীতির আভাস দেওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের মন সীমাহীন নয়, তাই মানুষের হাতে বোনা এই বস্তুটিকেও—যাকে বলি সংস্কৃতি—বিভিন্ন সুতোয় বিভক্ত করতে হয়। তা হলেই আবার এই সুতোগুলো সামগ্রিকভাবে দেখতে চেষ্টা করতে পারি।

মিশ্র সংস্কৃতি

আন্তর্জাতিক আদানপ্রদান আজকাল এমন অনায়াসসাধ্য আর সহজ যে, আগের তুলনায় অন্য সংস্কৃতির সঙ্গে এখন সংযোগ অনেক বেশী। দেড় কোটির অধিক আমেরিকান প্রতি বছর ইউরোপ যান। এমন কি বাইরে না গিয়েও এই ধরণের সংযোগ স্থাপন করতে পারি আমরা, কারণ আমাদের মাঝেই রয়েছেন পঞ্চাশ হাজার বিদেশী ছাত্র আর বিশেষজ্ঞ।

সংস্কৃতির এই মিলন চেতনা জাগায়, সমৃদ্ধি আনে। সত্যি বলতে কি, এই

ধরণের মিলন-মিশ্রনের ফলেই সভ্যতা এগিয়ে গেছে। পূর্ব দিগন্তের প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলোর কাছ থেকে যা-কিছু নিয়েছিল, তাতেই উর্বর হয়ে ওঠে গ্রীস। গ্রীক সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হবার পরেই রোম বর্বরতা ত্যাগ করে। রোমান সংস্কৃতির সঙ্গে স্থাপিত সংযোগ থেকেই উত্তর ইউরোপের সভ্যতা উন্নীত হয়। অন্ধকার যুগের পর ইসলামের সঙ্গে সংযোগ এবং পৌরাণিক গ্রন্থাদির পুনরাবিষ্কার ইউরোপকে নতুন জীবন দান করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুধু ইহুদী-গ্রীক রোমান ইউরোপীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকারীই নয়, আফ্রিকা, এশিয়া, স্প্যানিশ আমেরিকা, দেহাতি রেড ইণ্ডিয়ান সংস্কৃতি—পৃথিবীর সকল দেশের প্রভাবই তার উপর পড়েছে।

আমাদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে নানান দেশের খাবার—জার্মান, মেক্সিকো, আর জাপানের। রেড ইণ্ডিয়ানরা আমাদের মকাই আর স্কোয়াশ লাগাতে আর ধান ও মকাইয়ের শাঁসের তরকারি—সাকেটাশ খেতে শিখিয়েছে। সারা দেশ চীনা রেষ্টুরেন্টে ছেয়ে গেছে, বড় বড় সব বাজারেই চীনা খাবার পাটি আছে। সয় সস, জড্‌লস্‌, চো মো উপাদেয় খাদ্য। ঘরের বৌয়েরা এগুলি কিনে বাড়ীতে পরিবেশন করতে পারেন। এগুলো সাবেকীর মার্কিন সংস্করণ হলে কিছু মনে করবেন না, কারণ সংস্কৃতির সম্মিলন ঘটলে কাটছাঁট কিছু হবেই।

আমাদের সঙ্গীতের অনেকটাই এসেছে ইটালি আর জার্মানি থেকে, চিত্রাঙ্কন এসেছে ফ্রান্স থেকে। ইংল্যাণ্ড থেকে পেয়েছি বিচার ধারনা, আফ্রিকান ছন্দ থেকে আমাদের লোকপ্রিয় সঙ্গীত।

সংস্কৃতির সম্মিলন সমৃদ্ধি আনে, আবার এদিকে বিপদও আছে। মিশ্রিত সংস্কৃতি থেকে মিশ্রিত ভঙ্গিও প্রকাশ পেতে পারে, যেমন ইণ্ডিয়ানরা এক পাশে মাথা নাড়লে 'না' মনে করা হলেও ওর আসল মানে হল 'হ্যাঁ', অথবা জাপানীরা "তুমি যাওনি ?" ধরণের নেতিবাচক প্রশ্নের উত্তরে "হ্যাঁ" বলে যার আসল মানে হল "না।"

এই সব মিশ্রিত ভঙ্গী আরও গুরুতর হয়ে দেখা দেয় যখন এদের আমরা শালীনতা বিরোধী অথবা প্রবঞ্চনামূলক বলে ধরে নিই।

জাপানে অসুবিধাজনক অথবা পীড়ামূলক কিছু বলাকে অশিষ্টাচার হিসেবেই গণ্য করা হয়। শালীনতা আর বিবেচনার এই সূক্ষ্ম অনুভূতিকে প্রায়শঃই সাদাসিধে আমেরিকানদের কাছে ধানাইপানাই বলেই মনে হয়।

কর্তব্য এবং পদের প্রতি শ্রদ্ধা থেকে জার্মানদের মধ্যে যে নম্রতা আর

শ্রদ্ধার ভাব সৃষ্ট হয়েছে, আমেরিকানদের কাছে তা সুখপ্রদ নয়, কারণ তারা সকলকে সমানভাবে দেখতে চেষ্টা করে এবং পদমর্যাদা বলে যে কিছু আছে তা স্বীকার করতে চায় না। এমন কি একে আন্তরিকতাহীন, তাই বিরক্তিকর বলেও মনে করে।

মিশ্রিত ভঙ্গী থেকে মিশ্রিত কথা, এমন কি হাতাহাতিও হতে পারে। এখন আমরা এমন এক আন্তর্জাতিক দুনিয়ার বাসিন্দা, যেখানে এই ভঙ্গিগুলোর অর্থ উপলব্ধি করার প্রয়োজন অনেক বেশী। নইলে, বিদেশভ্রমণের বন্যা থেকে বন্ধুভাব অপেক্ষা বৈরভাবই আসবে বেশী করে।

বিদেশে অবস্থান করা কিংবা ঘুরে বেড়ান একটা সূক্ষ্ম কাজ। যাঁদের দ্রুত উপলব্ধির ক্ষমতা নেই, নতুন জায়গায় গিয়ে তাঁরা আনন্দ থেকে বঞ্চিত হন, তিক্ত সমালোচক হয়ে ওঠেন। আমেরিকান টুরিষ্টরা এই ভুলের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিদেশে সেখানকার খাবার, বিছানা আর ট্রেনগুলো আমেরিকার মতো নয়—এই ধরণের অভিযোগের জন্যে তাঁরা সুপরিচিত। এক রকমের তো নয়ই! এই তফাৎটুকু যদি দেখতে নাই চাও, তবে বাইরে আসাই বা কেন?

অথচ এই আমেরিকানরাই তাদের দেশের সমালোচনা সইতে পারেন না। বিদেশীদের তাঁরা ভালবাসেন, অতিথি হিসেবে আপ্যায়ন করতে চান, মার্কিন জীবনের সৌন্দর্য আর সুবিধেগুলো তাঁদের দেখানও। কিন্তু সমালোচনা সইতে পারেন না। বলতে কি, বিদেশীরা আমেরিকার যে সমালোচনাই করুন না কেন, তার জন্যে ধরাবাধা উত্তর তৈরী হয়েই আছে:

"তা হলে যেখান থেকে এসেছেন, ওঁরা সেখানে ফিরে যান না কেন?"

এই ধরনের আন্তঃসাংস্কৃতিক ভুল বোঝাবুঝি চলতে থাকলেও মানুষ যে বিদেশে যায়, মনে হয়, তার একটা কারণ এই যে, তার জন্মভূমি যে সবার চেয়ে সেরা তা সে নিশ্চিত করে জানতে চায়। তাই দেশভ্রমণের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ, সম্ভবতঃ তার সবচেয়ে শিক্ষনীয় অংশই হল নতুন পরিবেশের সমালোচনা।

সমালোচনা গৃহকাতরতার পরিণতিও হতে পারে; নিরাপদ নোঙর খুলে গেলে যেমন ভয় হয়, তেমন, ভবিষ্যতের ভয়। এই পরিবেশের উপর দর্শকের মনোভাব প্রকাশ পায় তাঁর সমালোচনায়। তিনি যখন বলেন, "মার্কিন খাদ্যের কোন স্বাদ নেই, ভালও লাগে না," তখন তাঁর মনের আসল কথাটি হ'ল ভারতীয় খাদ্যই ভাল। তা ছাড়া, ওয়েট্রেশকে দেখেও তেমন ভক্তি হয়না। নিউইয়র্কের লোকেরা ইংরেজী বোঝেনা; আমার খাঁটি উচ্চারণে কিছু যদি

বুঝতে না পারেন ওঁরা, যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছি, সেখানে ভাল কিছু দেখাতে পারব কি? ভাল নম্বর পেয়ে পাশ করতে পারব কি?"

ফ্রয়েড মানুষকে ভয় আর অশান্তি থেকে মুক্তি দিতেন তাদের নিজেদের আর অপর সবাইকে ব্যক্তি হিসেবে উপলব্ধি করা সম্ভবপর ক'রে তুলে। সংস্কৃতির অনুভূতিও অনুরূপভাবে মানুষকে বুঝতে সাহায্য করে যে, যে ব্যবধান মানুষকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে সেটা বড় নয়, মানবতার যে মূলধারা তাকে এক করে, সেটাই হল আসল কথা। সাংস্কৃতিক পার্থক্য নিয়ে চর্চা করলে, কিছুটা মেনে নিলেও দেখা যাবে,—ঐক্য, পার্থক্য, সব মিলেমিশে আন্তর্জাতিক জীবনযাত্রাপযোগী এমন এক দুনিয়ার দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি যেখানে মানুষ আরও বেশী বিদেশ যাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠবে।

একটা জাতির জীবনযাত্রা তার ইতিহাস, ভৌগলিক অবস্থিতি, জলবায়ু, ভাষা, সংগঠন আর রীতিনীতির চেয়ে বড়। একদিকে এ কতকটা রহস্যের মতোই, কারণ সমাজ-বিজ্ঞানের কৃতিত্ব যতই হোক না, এমন অনেক প্রশ্ন আছে যার উত্তর সেখানে নেই। প্রতিবেশী সাম্যে বিশ্বাসী হলেও একটা জাত কেন রক্ষণশীলতার সঙ্গে শ্রেণীভিত্তিক জীবন যাত্রা বেছে নেয়? সহজ জীবন-যাপনে অভ্যস্থ একটা জাতি অবসর বিনোদনে সময় কাটায়ই-বা কেন আর অপর একটা জাতিই-বা কেন অধিক শক্তি আর কর্মক্ষমতার পরিচয় দেয়? সাধারণতঃ এসব প্রশ্নের যে উত্তর দেওয়া হয়, আর যাই হোক সহজভাবে গ্রহণ করবার মতো সেগুলো নয়।

মার্কিন সংস্কৃতি ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, কারণ এর অনেকগুলি মূল, অনেক উৎপত্তি স্থল, শাখা প্রশাখাও অনেক। একটি 'পালা' নয়, এ হল বিচিত্রানুষ্ঠান, আমাদের আমোদ-প্রমোদ উৎসবের যা একটি বিশেষ রূপ। এক সঙ্গে বেশ জোর আর শক্তি দিয়ে নিক্ষিপ্ত সব-কিছুর সামান্য কিছু—এই-ই, মনে হয়, আমরা চাই।

উপলব্ধির পথে

সমুদ্রের প্রান্তদেশের উপরে যখন সূর্য ওঠে, পর্ব্বতসঙ্কুল উপকূল আর উপকূলোত্তর দ্বীপপুঞ্জ তখন আলোকিত হয়ে ওঠে; কিন্তু কালিফোর্ণিয়ায় তখনও অন্ধকার, করসা হতে তখনও ঘণ্টা তিনেক বাকী থাকে। দুই মহাসমুদ্রের মাঝে পৃথিবীর বিরাট এই অংশটুকু কিছুদিন আগেও মানুষের মাপকাঠিতেও অরণ্যভূমি ছিল। আজ বিশ্বের সকল অংশের মানুষ এসেছে সেখানে, নিজেদের তারা একজাতি আর এক দেশের মানুষ বলে পরিচয় দেয়।

ধর্ম, ভাষা, গায়ের রং, পেশা, ঐতিহ্য, জলবায়ু, রীতিনীতি অনেক কিছুই এদের পৃথক করে রেখেছে। নিউ ইংল্যাণ্ডের পঞ্চায়েতগুলো (ভিলেজ রিপাব-লিক) এখনও নিজেদের সব কিছু পরিচালনা করে। তিনশ বছর আগে যেমন করত, আজও ঠিক তেমনিভাবে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়, নামমাত্র অথবা বিনা বেতনে তারা শহরের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে। তাও শহরের বার্ষিক সভায় যেমন নির্দেশ দেওয়া হবে, ঠিক তেমন ভাবেই। এখান থেকে মোটর-পথে একঘণ্টা দূরে বিরাট বিরাট শিল্প-শহর। ইউরোপের নানান জায়গার শ্রমিকরা এসে সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের সমাজ পত্তন করেছে। সেখানকার সমস্যা আর উত্তেজনা সম্পর্কে গাঁয়ের মানুষের কোন ধারণাই নেই।

যারা মার্কিন জীবনযাপন পদ্ধতিকে ছকে বাঁধা কিছু মনে করেন, নিউইয়র্কের ককটেল লাউন্জ্ থেকেই তাঁরা আমেরিকাকে দেখেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জানবার শুধুমাত্র একটি পথই আছে, সে হল আগাগোড়া ঘুরে বেড়ান—তাও ট্রেন বা প্লেন-এ নয়, মোটর গাড়ীতে করে, অবসর সময়ে।

নিউ ইংল্যাণ্ড থেকেই সুরু করুন। এখানে কতকগুলো এক্সপ্রেস হাইওয়ে আছে, পাঁচমাইল অন্তর যার উপর আপনার গাড়ীর গতিবেগ মন্থর করে দিতে হবে, নয়তো এমন একটা শহর হামাগুড়ি দিয়ে পার হতে হবে যার জনবহুল রাজ-পথগুলো কখনই এত মানুষের জন্যে তৈরী হয়নি। দুর্ভাগ্য এই যে, উচ্চ রাজপথ থেকে শহরের সবচেয়ে খারাপ অংশটুকুই আপনি দেখতে পাবেন—প্যাকিং বাক্সর মত করে তৈরী কারখানার বাড়ীগুলো, ভেঙে পড়া সেকেলে বড় বড় বাড়ী

সস্তায় যেখানে ঘর ভাড়া পাওয়া যায়, মেন স্ট্রীটের দোকানগুলোর সামনের দিকটা বা ইট নয়তো ক্ল্যাপ বোর্ড-এর * সেকেলে আর কুৎসিত অঙ্গ বিন্যাসে ঠাসা। অবশ্য সাম্প্রতিক গৃহ-উন্নয়ন কার্যক্রমও হয়ত আপনার চোখে পড়বে। যুদ্ধ শেষ হতেই আমেরিকাকে গৃহ নির্মানের নেশায় পেয়েছে, ফলে গোটা দেশটার চেহারাই পাল্টে গেছে। এই নতুন বাড়ীগুলোতে প্রকাশ পাচ্ছে এখনকার মেজাজ। এগুলো ঘরোয়া ধরণের, প্রতিপত্তির ছাপ নেই; বড় বড় জানলা, যেন গোটা বিশ্বের দিকে বন্ধুভাবে খোলা রয়েছে। একটার পর একটা, রাস্তার উপরে ঘনিষ্ঠভাবেই দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়ীগুলো; নিরুত্তাপ সমকোন নয়, কিছুটা কাত হয়েই আছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে।

ওদের ধারে কাছেই পাবেন কেনাকাটির কোন নতুন কেন্দ্র। বিরাট বাজার। গৃহস্থবধূরা এখানে মালটানা গাড়ী নেবে যার একপাশে তাদের বাচ্চারা বসতে পারে, তারপর লম্বা গলিগুলো চষে ফেলবে। খাবারের চমৎকার সব প্যাকেটের পাহাড় সে-গলির দু'পাশে। ক্যাশ রেজিষ্টার-এ একজন কেরাণী গৃহস্থবধূর প্যাকেটগুলো পরীক্ষা করে দেখবে আর দরকার হলে অন্য একজন সেগুলো তাঁর গাড়ীতে পৌঁছে দেবে। না, তিনি নিজেই নিজের দাসী হবেন। শ্রমের মূল্য আজ এত বেশী যে অপচয় করবার উপায় নেই। ক্রেতা, তাই, নিজের দায়িত্ব নিজেই নেন। তবুও আগের তুলনায় অনেক আমেরিকান এই সহায়কের কাজ নিয়েছেন।

নিউ-ইংল্যাণ্ড থেকে নিউ-ইয়র্ক যাবার পথে যাত্রীকে একটা উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। পার্ব্বত্য এলাকার ভিতরে অবস্থিত একশত মাইলের এই উদ্যানে থামবার জায়গা (ষ্টপ), ট্রাফিক লাইট কিংবা ট্রাক একটিও পাওয়া যাবে না। গাড়ীগুলো এত সহজে চলে যে সপ্তাহের শেষ দিকটা কিংবা ভীড়ের সময় ছাড়া যে কেউ নিউইয়র্ক সিটি অতিক্রম করে পশ্চিমে নিউজারসি টার্ণপাইকে পৌঁছতে পারেন, একবারও থামতে হবে না, এতটুকুও দেরী হবে না। তারপর সংলগ্ন পেনসিলভানিয়া টার্ণপাইকের দিকে গেলে সোজা একেবারে ওহিও সীমান্তে পৌঁছে যাবেন। দ্রুতগতির জন্যে পরিকল্পিত এই রাস্তাগুলোর পিছনে রয়েছে চমৎকার ইন্‌জিনীয়ারিং কৌশল। এই রাস্তাগুলো গ্রামাঞ্চলের যে অংশের উপর দিয়ে যায় তা ঝক্‌ঝকে, তক্‌তকে। আমেরিকার প্রাকৃতিক শোভার

---

* পাতলা বোর্ড; একটা দিক অন্যদিক থেকে পুরু। কাঠের বাড়ি ঢেকে দেবার জন্যে আমেরিকায় ব্যবহৃত হয়।

অনেকটাই সাইনবোর্ডগুলো নষ্ট করে, কিন্তু এখানে তাদের পাত্তা পাওয়া যাবে না।

টার্ণপাইকগুলো (চেকপোষ্ট) শুধু ভ্রমণকে সহজ করে না, ওগুলো আশীর্ব্বাদ-স্বরূপও। প্রতিটি পেট্রোল পাম্প মুঠো মুঠো চমৎকার মানচিত্র সরবরাহ করতে পারে। নম্বর দেওয়া যাত্রা পথগুলোর একটা বেছে নিয়ে রাস্তার ফলকে সেই নম্বর দেখতে দেখতে এগিয়ে যাওয়াটা কিছুই কঠিন কাজ নয়। আগে থেকে যাত্রাপথ সম্পর্কে যদি পরামর্শ চান, যে কোন তেল কোম্পানীতে একটা কার্ড ফেলে দিন, বিনামূল্যে পেয়ে যাবেন।

গাড়ি পশ্চিম দিকে ধাবিত হতেই দেখতে পাবেন, দেশটার আকারটাই শুধু নয়, মাটির রংও পাল্টে যাচ্ছে। নিউ জারসিতে মাটির রং হল্‌দে, বালুকাময়। পেনসিলভানিয়ার মাটি লাল, ওহিও-র তামাটে, ইলিয়নস-এর নিকষ কালো। পৃথিবী যেমন বিচিত্র রকমের, পৃথিবীর উপরে অথবা তার মাটি নিয়ে মানুষ যা গড়ে তোলে, তাও সেইরকম বৈচিত্রপূর্ণ—পেনসিলভানিয়ার গোলাঘর আর তার সুন্দর তোরণ, সবুজ রং-করা দরজাগুলো থেকে পশ্চিমের শস্যের প্রকাণ্ডকায় লিফট্‌গুলো অবধি।

আর হোটেলতো সর্বত্র। বৃষ্টির পর ব্যাঙের ছাতা যেমন গজিয়ে ওঠে, সেই রকম রাজপথগুলো ছেয়ে গেছে হোটেলের পর হোটেলে। টুরিষ্টদের জন্যে ওগুলো পাল্লা দিয়ে সুন্দর হয়ে উঠেছে। পশ্চিমের হোটেলগুলো সুন্দর আর সস্তা, ঘরের সর্বত্র কার্পেটে ঢাকা, টেলিভিসন থেকে খবরের কাগজ, আইস কিউব আর স্বয়ংক্রিয় তাপ অবধি সবই বিনা পয়সায় দেবে। নতুন ফার্নিচার, পরিস্কার আর পর্যাপ্ত তোয়ালে, রুমাল প্রভৃতিতো পাওয়া যাবেই।

পূর্বপ্রান্তের জনবহুল শহরগুলো সুদূর কন্টিনেন্টের উপাঙ্গ, অনুকরণে রচিত উপনেত্রের ন্যায়। আরও যত পশ্চিমে যাবেন, ওদের আরও ছোট মনে হবে; কারণ এ এমন একটা মহাদেশ যেখানে শহরগুলোকে তুচ্ছ মনে হয়। ছুটে চলা গাড়ীর চাকা যত মাইলের পর মাইল পেরিয়ে চলবে, দেশের চেহারাটাও পাল-টাতে থাকবে। এমন কি নীরস আর সমতল জায়গা হিসেবে সুপরিচিত যে কানসাস, তাকেও বিচিত্র মনে হবে। শরৎকালে এখানকার কালো আপাত উর্বর ক্ষেতে শীতের শেষে সবুজ গম মাথা তুলে দাঁড়ায়। এখানে, মিসিসিপি পেরিয়ে, পৃথিবী নিরালা দিক্ চক্রবাল রেখার সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। সামনের চক্রাকার পৃথিবীর কোন দিকেই দু-তিনটের বেশী বাড়ী চোখে পড়বে না।

শহরের কাছে এলে তাদের অস্পষ্ট আর নগ্ন মনে হবে। দোকানগুলোর সামনের দিকটা দেখতে থ্যাবড়া, বাড়ীগুলো বাক্সের মতো আর শস্যের লিফট-গুলো চার্চের চূড়ো ভেদ করে শোভা পাচ্ছে।

নিউ মেক্সিকোতে ধূলোর উড়ন্ত পাহাড় দেখে আপনি নদীর হদিশ বার করতে শিখবেন। কোন মাসেই এই নদীগুলোতে জল থাকে না। ঝড়ে উড়ে আসা শরৎকালের শুকনো গাছগুলো দুরন্ত বেগে রাস্তার উপরে গিয়ে পড়ে। চাষ করা জমি ধূসর আর তামাটে রঙের রুক্ষ পাহাড়ে পরিণত হয়, তার মধ্যে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ছোট ছোট সব গাছ। রাস্তার ধারের শুক্‌নো মাটিতে শুধু সেজ গাছই হতে পারে, তাদেরও মৃত বলে মনে হয়।

গাঁথা দেয়ালের মত উঁচু আরিজোনার বিক্ষিপ্ত পাহাড়, তার শৃঙ্গ আর ক্ষয়ে যাওয়া প্রস্তরস্তম্ভগুলো দেখে কোন শহরের ধ্বংসাবশেষ বলেই মনে হবে। এখন আর গাছ গাছড়ার কোন পাত্তাই নেই, এমন কি ক্যাকটাসও নয়।

যেখানে পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় অথবা গিরিখাত আরও অভ্যন্তরে যায়, সেখানে আবার গাছপালা দেখা যায়। কয়েকটা ছোট গিরিখাতে দুনিয়ার ছটা ঋতুরই উদ্ভিদ পাশাপাশি দেখা যাবে; কয়েক পা এগোলেই চিরসবুজ উত্তরাঞ্চল থেকে আপনি গিয়ে পড়বেন উষর আর উত্তপ্ত মরুভূমির ক্যাকটাস আর য়ুক্কা'র মধ্যে। এদিকটা বেশ ফাঁকা; রেল-লাইনের ধারের রাস্তাগুলোতে যেখানে বেড়া শেষ হয়েছে, সেখানে ইস্পাতের থামগুলো একটার গায়ে আর একটা থাকায় গরু বাছুর রাজপথে ঢুকতে পারে না।

এদেশের আকাশে প্রতিদিন মেঘ দেখা যায় না। প্রখর সূর্য সোজাসুজি এসে পড়ে শুক্‌নো পৃথিবীর উপর; গরু বাছুরগুলো যা কিছু সবুজ তার জন্যেই হন্যে হয়ে থাকে।

এ অঞ্চলটা প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্যেও খ্যাত; গ্রাণ্ড ক্যানিয়ন-এর জাঁকজমক সমারোহই এই লম্বা পথে পাড়ি দেওয়াকে সুন্দর করে তোলে। এখানকার বিক্ষিপ্ত আদিবাসী বস্তিগুলোর জীবনযাপন পদ্ধতি এখনও সেই সেকেলে ধরণের। শহরের রাস্তাগুলোতে "অ্যাংলো"দের চেয়ে রেড ইণ্ডিয়ানদেরই অধিক সংখ্যায় দেখা যাবে—মেয়েদের গায়ে উজ্জ্বল ব্লাউজ, পরনে সুন্দর স্কার্ট; পুরুষদের চুল প্রায়শঃই সেকেলে ধরণে ছাঁটা, রঙীন স্ট্রাইপ দেওয়া কাপড়ের পটি, মাথায় বাধা। পেট্রোল পাম্প পার হতেই পাওয়া যাবে কেনা-কাটার আড্ডাগুলো যাতে বিশেষ করে আদিবাসীদের তৈরী জিনিসপত্রই পাওয়া যাবে। ব্র্যাকেট, রাগ, গয়নাগাটি, মোকাসিন জুতো, কিন্তু পেট্রোল নয়।

এদিকটাকে থ্যাবরা মনে করলে ভুল হবে। কারণ মিসিসিপি থেকে জায়গা ক্রমশঃ উঁচুই হচ্ছে। নিউ মেক্সিকো আর আরিজোনা সমুদ্রতল থেকে মাইল-খানেক উঁচু, কিন্তু গ্রাণ্ড ক্যানিয়ন এর উচ্চতা সাত হাজার ফুটের কম হবে না।

ঘণ্টায় সত্তর মাইল বেগে মোটর চালালেও আপনার মনে হবে এই বিরাট অনুর্বর অঞ্চলের বুঝি শেষ নেই। এই বিরাট অঞ্চলে এখনও মানুষ তেমন কিছু করতে পারে নি। দুজন চালক থাকলে এ দেশটা আট দশ দিনে পাড়ি দেওয়া সহজ। তার চেয়ে কিছু কম হলেই কঠোর পরিশ্রমের কাজ। আশে পাশের দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখাবার জন্যে কয়েক মাইল যোগ করলে এই লম্বা পাড়ির জন্যে লাগবে দু'শ গ্যালনের পেট্রোল আর কিছু মবিল। দু'একবার পেট্রোল ভর্তি করতে হবে। প্রতিবার থামলে সামনের কাঁচটা ঝাড়পুছ করতে হবে আর হতভাগ্য শত শত পোকামাকড় সরিয়ে ফেলতে হবে—সত্তর মাইল বেগে এগিয়ে চলা কাঁচটা তাদের কাছে মৃত্যুর ফাঁদই। গাড়ীটা গোলমাল না করলে অথবা ভুল না হলে তিন হাজার মাইল পথ ঘুরে আসবে। যান্ত্রিক ত্রুটি-হীনতাটাকেই আমেরিকানরা ধরে নেয়।

মোটরগাড়ী না থাকলে আমেরিকানরা কোথায় যাবে? মোটরগাড়ীই তার ঘোড়া, তার ঢাল; এই ঢাল দিয়ে সে গহন অরণ্য আর সীমাহীন দূরত্বকে জয় করতে পারে। মোটরের গুন্ গুন্ আর গতির শব্দই তার কবিতা। অসভ্য মানুষের কাছে জপমালা আর আয়না যেমন, মোটরগাড়ীর উজ্জ্বল রং আর চাকচিক্য তার কাছে অনেকটা সেই রকমের। উজ্জ্বল আর সুন্দরের প্রতি তার যে ভালবাসা গাড়ী থেকেই তা প্রকাশ পায়। মোটর গাড়ী তার সমৃদ্ধির প্রতীক; লোভ দেখিয়ে মেয়েদের মন জয় করার ব্যাপারে এই গাড়ীই হল তার টোপ। এর ক্ষমতা হল তার শক্তি আর আত্মরক্ষার আচ্ছাদন, কারণ উপরওয়ালা ধম-কালে অথবা স্ত্রী যন্ত্রণা দিলে, এই তার ক্ষতিপূরণ দেবে—তার ডান পায়ের নিচে শত অশ্বের শক্তি ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করছে। মানুষের ভীড় যত বড়ই হোক না কেন, অতি দ্রুত আর সামান্য সময়ে তাকে আগে ঠেলে নিয়ে যাবে, বউ আর উপরওয়ালার উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবে।

পশ্চিম মুখো যাওয়া মানেই, আমেরিকার পুনরাবৃত্তি করা, কারণ আমেরিকানরা চিরদিনই পশ্চিমমুখো গিয়েছে। পশ্চিমমুখো যাওয়ার অর্থই হল আমাদের পূর্বপুরুষেরা যা সুরু করেছিলেন, তারই অনুসরণ করা।

আবার এ পথে গেলে শিক্ষাজগতের সকল শাখা সম্পর্কেই কিছু জানাও

হবে—মৃত্তিকা, নদী, সমতল ভূমি আর নানান ধরণের পার্ব্বত্য ব্যবস্থা, উৎ-ক্ষিপ্ত ভূগোল আর ভূ-বিদ্যাকে আমাদের সামনে তুলে ধরবে। এখানে হরিণ, কৃষ্ণসার মৃগ, মহিষ, খরগোস, প্রেরি অঞ্চলের কুকুর, ছোট কাঠবেড়াল আর আরও নানান ধরণের জীবজন্তুকে তাদের নিজস্ব এলাকায় দেখা কঠিন কিছু নয়। ইউরোপের প্রায় সকল জাতের মানুষ আর মেক্সিকান, ভারতীয় ও জাপানীদের এই পথের কোথায়ও না কোথায়ও পাওয়া যাবে। আবহাওয়াও পালটে যায়, পূর্বাঞ্চলের অনিশ্চিত অথবা মেঘাচ্ছন্ন আকাশের জায়গায় দেখা দেয় পশ্চিমাঞ্চলের বৃষ্টিহীন উজ্জল পরিষ্কার আবহাওয়া। দেখা যায় নদী ব্যবস্থা, জনসাধারণের সঙ্গে ভূমি সম্পদের সম্পর্ক, শিল্পের অবস্থিতি, কানসাসের সমতল ভূমিতে তৈল কূপের বাঁধ। এই বাঁধই বন্যা থেকে এ অঞ্চলকে রক্ষা করে। তারপর আসবে সব চেয়ে যা উত্তেজনাকর—মরুভূমি অঞ্চলে মানুষ কি করতে পারে।

আরিজোনার উত্তর পশ্চিম কোনে বিক্ষিপ্ত পাথরের পাহাড় আর প্রাকৃতিক শোভার ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে রাস্তা। তারপর অকস্মাৎ আপনাকে আবার নীচে নামতে হবে, একটা বাঁক ঘুরলেই দেখবেন হুভার ড্যাম-এর প্রায় গোটাটাই আপনার সামনে এসে গেছে। এখানকার জলাধার থেকে জল গেছে সেই গ্রেট ক্যানিয়ন অবধি। এখানকার শুষ্ক অঞ্চলে বসন্তকালের বন্যায় বারবার প্লাবিত হয়েছে। উষর অঞ্চলে জল যায় এই বাঁধ থেকে, তারপর সেখানে অঙ্কুরোদ্গম হয়। এখান থেকে যে বিদ্যুৎ তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, পঁচাত্তর লক্ষ মানুষের চাহিদা মেটানোর পক্ষে তা যথেষ্ট। জলের গতি নিয়ন্ত্রণ করে নদীর নিচের দিকে আরও বাঁধ চালু করা সম্ভব হয়েছে; সেখানেও আবার বিদ্যুৎ তৈরি, পঙ্কোদ্ধার আর জলসেচের কাজ করা হয়ে থাকে।

হুভার বাঁধ থেকে নেভাডার লাস ভেগাস মাত্র কুড়ি মাইল। কিন্তু এরই মধ্যে আপনি গণতন্ত্রের সা, ঋ, গ, ম শুনতে পাবেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় (ফেডারেল) ভাবধারা এবং তার রূপায়িত চিত্র (স্থানীয় সংস্থাগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা করে যা সকল মানুষের সেবা ক'রে) থেকে জুয়োখেলার শহর অবধি যার উজ্জল আলো, রঙ্গমঞ্চের অগণিত জন-সমুদ্র, থিয়েটার আর সুরার স্রোত যা কিছু চটকাদার আর বিস্বাদ, তার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় এবং পরে আরও চাকচিক্যের আড়ালে এসবের নোংরামিকে ঢেকে ফেলতে প্রয়াস পায়।

লাস ভেগাস থেকে ক্যালিফোর্ণিয়া মাত্র কয়েক মাইল। মহাদেশের বৃহত্তর অংশই এখন আমাদের পিছনে ; তবুও সেই প্রতিশ্রুত স্থানে এখনও এসে পৌঁছইনি আমরা, কারণ পূর্ব ক্যালিফোর্ণিয়া কতকটা অ্যারিজোনা অথবা নেভাদার মতোই—ফাঁকা, উঁচুনিচু পাহাড়, ধূসর আর লালচে মরুভূমি অঞ্চলের উপর ক্যাকটাস আর সেজ (ভুঁই তুলসী) গাছ, তারপর খর্বাকৃতি গাছের সারি।

স্যান বেরনার ডিনো-তে মরুভূমি শেষ হয়েছে। ছাই সবুজ ভুঁই তুলসীর জায়গায় দেখা যাবে পাম আর কমলালেবুর ঝাড়, জশুয়া গাছের বাঁকানো কাণ্ড, গাঢ় সবুজ জুনিপার। ঊষর ভূমির বদলে দেখা দেবে জলসিঞ্চিত জমি। প্রকৃতি আবার সবুজ হয়ে দেখা দেবে।

ফাঁকা জায়গাগুলো আমরা পেছনে ফেলে এসেছি। প্রকৃতি যেখানে মত্ত, মানুষ সেখানেই ভিড় করে। জনস্রোত সেখানে স্থির নদীতে পরিণত হয়। একটা শহর থেকে আর একটাতে পৌঁছতেই নজরে পড়বে তার কমলালেবুর কুঞ্জ আর রাস্তার ধারের বাজারগুলো। এখনও পাহাড়গুলো উচু নিচু আর পাথরে ভর্তি, কিন্তু উপত্যকা-ভূমি, বাইবেলের ভাষায়, সঘন শস্যসম্ভার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মনে হয়—হাসছে আর গান গাইছে। এই হল পশ্চিমমুখো যাত্রার লক্ষ্য-স্থল, রোমাঞ্চকর অভিযানের ভৌগলিক শেষবিন্দু।

ক্যালিফোর্ণিয়া আর ফলের গাছ আর সবুজ ক্ষেতের দেশ নেই, হলিউডের স্বপ্ন-কারখানা অথবা বিচিত্র ধরণের ধর্মীয় কৃষ্টির আশ্রয়স্থলও নয়। ক্যালি-ফোর্ণিয়া এখন শিল্পের দেশ—শিল্প এত প্রসারিত হয়েছে যে গোটা দেশটাতে আয়তনের দিক দিয়ে লস্‌এনজেলসই বৃহত্তর শহর। কতকগুলো রাজ্যে সব মিশিয়ে আছে। এখানকার মোটর গাড়ির সংখ্যা তার চেয়ে বেশি। সমগ্র দেশের মধ্যে এখানকার ধোঁয়া সমস্যাও সবচেয়ে বড়।

গোটা দেশটা পাড়ি দেওয়া যেমন একঘেয়ে, ঠিক তেমন রোমাঞ্চকর ; সামান্ত কাজ, আবার চ্যালেঞ্জও। তাড়াতাড়ি যাবার সময় যা নেওয়া যায় তার চেয়ে শিক্ষনীয় অনেক কিছু আছে ; কারণ যা চাক্ষুষ করা যায়, বইতে তার সবটুকু পাওয়া যাবেনা। তবে একটা কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় : এ দেশ সম্পর্কে যা-কিছু নির্ণয় করা হোক না কেন, আয়তনের কথা সব তাতেই উঠবে। এই বিরাটত্বের মধ্যে সব রকমের বৈচিত্রই আছে—প্রাকৃতিক দৃশ্য, মানুষ, জলবায়ু, পেশা, মানুষের ধরন-ধারন, কথাবার্তা, পোষাক-পরিচ্ছদ, ধর্ম, সংস্কার, সরকার, অপরাধ-প্রবণতা, মহত্ব, নীচতা, ভাল, মন্দ।

দেশের মাঝ বরাবর পূব-পশ্চিম পাড়ি দিলে এই বৈচিত্র সমারোহের সামান্যই চোখে পড়বে। দেশের বিস্তীর্ণ জলপথতো নজরেই আসবে না, গ্রেট-লেক্স-এর ভিতর দিয়ে ইউরোপ থেকে অথবা দু'হাজার মাইল নদীপথ ধরে মেক্সিকো উপত্যকা থেকে মিনেসোটা'র সেন্টপল-এ, যে পথে মাল বোঝাই জাহাজ আসে। মেন থেকে জর্জিয়া অবধি অ্যাপালাশিয়ানস অরণ্যানীর ভিতর দিয়ে দু'হাজার মাইলের যে পাঁয়ে হেটে চলার পথ আছে, তা-ও এ পথে পড়বেনা। মন্থর-গতি প্রশস্ত নদী, সুন্দর সুন্দর সেকেলে বাড়ি আর ভগ্নদশা ভাড়াটে বাসা-গুলো, সেকেলে স্যাভানার বিধিবদ্ধ স্কয়ারগুলো আর চ্যাপ্টা আর প্রায়-গ্রীষ্ম মণ্ডলীয় উপদ্বীপ ফ্লোরিডা'র দক্ষিণাঞ্চলও এ পথে পড়বেনা। আরও বাদ পড়বে টেক্সাসের সীমাহীন বৈচিত্র, লাউসিয়ানার শেওলাঘেরা ছোট নদীগুলো, উত্তর-পশ্চিমের বড় বড় বন, পার্বত্য অঞ্চলের উজ্জল সবুজ মাঠগুলো, গোল্ডেন গেট থেকে উদ্ভূত ঢালু জমির সংলগ্ন সান ফ্রানসিস্‌কো'র সৌন্দর্য, আলোর মালায় শোভিত তার ব্রিজগুলো। একটা জীবনে এই দেশের সবটুকু দেখবার আশা কেউই করতে পারেনা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাদেশীয় সীমান্তরেখার মধ্যে রয়েছে তিন লক্ষ বর্গমাইল জল আর স্থলভূমি। এই জমির শতকরা চল্লিশ ভাগ চারণভূমি, আঠাশ ভাগ জঙ্গল। বাইশ ভাগে শস্য উৎপন্ন হয়, দশভাগে আছে ঘর বাড়ি আর রাস্তা। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মালিকানাধীনে রয়েছে গোটা দেশের শতকরা তিরিশ ভাগ জমি। এর অনেকাংশই জাতীয় বনাঞ্চল, গোচারণভূমি অথবা পার্ক যার মধ্যে গ্রাণ্ড ক্যানিয়ন, কার্লসবাড ক্যাভার্নস অথবা ইওলোষ্টোনের উষ্ণ জলপ্রপাত অথবা পশ্ববন প্রভৃতির ন্যায় প্রকৃতির চমকপ্রদ বিস্ময়গুলোও রয়েছে। পাঁচ কোটি ষাট লক্ষ একর জমি যা ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড আর ওয়েলস্-এর মত হবে—এখানে তা কেবল ইণ্ডিয়ানদের জন্যেই সংরক্ষিত আছে।

প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে বিশ্বের বিচিত্র ধরণের বন্য প্রাণীগুলো রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন খাদ্য শস্যের পরিমাণ অবিশ্বাস্য: ৩০ কোটি বুশেল মকাই, ১০ কোটি বুশেল গম, সাড়ে ৩৫ কোটি বুশেল আলু। এ সব ১৯৫৪ সালের পরিসংখ্যা। ঐ বছরেই ২৫০ কোটি পাউণ্ড মাংস উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হয়। (১ বুশেল=প্রায় /১॥ সের)

কয়লা, পেট্রোল, ইস্পাত, বৈদ্যুতিক শক্তি, তামা, তুলো, আজে-বাজে জিনিস পত্র এবং আরও অনেক কিছুর উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান সর্বাগ্রে। এই

সব প্রাকৃতিক সম্পদের অনেক কিছুই অতীতে আমেরিকা বেপরোয়াভাবে আহরণ অথবা অপব্যয় করছে, নয়তো অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিশ্বকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে অথবা জয়লাভের পর দুর্গত অঞ্চলের পুনর্বাসনের জন্যে যথেষ্ট ব্যয় করেছে। তবুও আমেরিকার মৃত্তিকা, খনিজ আর বনজ সম্পদের ঐশ্বর্য এখনও প্রচুর। এই সম্পদ যথাযথভাবে সংরক্ষণ সম্পর্কেও আজকের আমেরিকানরা আগের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন।

দর্শকেরা সাধারণত মার্কিন জীবন যাপন পদ্ধতির সাদৃশ্য আর প্রামাণ্য রূপটাই দেখেন। এখানকার চলচ্চিত্র ও রেডিও, মোটর আর কাপড়ের বাজার, প্যাক-করা খাবার আর সাময়িক পত্রিকাগুলোকে ধন্যবাদ, আমেরিকানদের আকার আর আচরণ প্রায় একই ধরণের। মার্কিন সংস্কৃতির অনেক ধারাই সকলের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু সাদৃশ্য থাকলেও বিচিত্রের রোমাঞ্চ থেকে কেউ বঞ্চিত নয়। ভেরমন্ট-এর চাষী, দক্ষিণাঞ্চলের ভাগ-চাষী, মিসিশিপির মাঝি, কানসাস-এর দোকানদার, শিকাগোর অধ্যাপক, টেকসাস-এর রাখাল অথবা তেলি, নিগ্রো শিল্প শ্রমিক, গ্রীক বংশোদ্ভূত রেষ্টুরেন্ট-মালিক, পোলাণ্ডে জন্ম পিত মাতার চিকিৎসক সন্তান, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ফলের বাগানের নিসেই (জাপানী-বংশোদ্ভূত আমেরিকান) মালি—দেখলেই বোঝা যাবে এঁরা সবাই আমেরিকান। আবার একটু তাকালে এঁদের পার্থক্যও ধরা পড়বে।

অরাজকতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে না পড়ে বৈচিত্র্যকে বাঁচিয়ে রাখা, ব্যক্তিত্ব হারাতে বাধা না করে একই সংস্কৃতির বাঁধনে মানুষকে মিলিত করা—মানুষের কৃষ্টির মহান উদ্দেশ্য কি এই নয়? বৈচিত্র উপভোগের অবকাশ এবং সেই সঙ্গে সমাজের সক্রিয় সদস্যের শক্তি আর আনন্দ যোগানের মধ্যে বিচিত্র ধরণের মানুষকে একসূত্রে গাঁথাই কি সংস্কৃতি যাচাই করে নেওয়ার পথ নয়? অন্য সব কিছুর উপরে আমেরিকাকে যাঁরা নির্মাণ করেছেন তাঁদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব কি এটাই নয়?

মিলিত মহাজাতি

মানুষের ইতিহাসে এর আগে এমন ঘটনা আর ঘটেনি। ইতালী, আয়ারল্যাণ্ড, জার্মানি, রাশিয়া, গ্রীস এবং বলকান আর স্কান্দেনেভিয়ার দেশগুলো থেকে দলে দলে ওরা এসেছে। গ্রামের পর গ্রাম পিছনে ফেলে এসেছে। সেখানে পরিবারগুলো কত যুগ যুগ ধরে ছিল তা কারও আর মনে নেই। পরিচিত রীতিনীতি আর চেনা মুখে পরিবৃত নিরাপদ জীবন ছেড়ে ফেলে এসেছে সবাই। এই ভিটে ছাড়ার আর ভিটে ফিরে পাওয়ার, মানুষের দুঃখ-কষ্ট আর অপমানের এই কাহিনীগুলো সংখ্যা দিয়ে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

এ কাহিনী যাদের তারা ইউরোপের বন্দরগুলোতে পৌঁছনোর জন্যে সীমান্ত এলাকায় আর সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে যেভাবে লড়েছে, তার তুলনা নেই। আমেরিকার বন্দরগুলোতে পৌঁছে হতবুদ্ধি হয়ে দেখল ওরা প্রবঞ্চকদের শীকারে পরিণত হয়েছে। তবুও, সেই ১৮৫০ সালে নবাগতদের সংখ্যা বছরে তিনলক্ষ সত্তর হাজারে দাঁড়িয়েছিল। অতলান্তিকে দুই পাড়ের অবস্থানুযায়ী এই সংখ্যা ওঠানামা করলেও, অঙ্কটা সব সময়েই উপরমুখো ছিল। ১৯০৫ সালের মধ্যেই দেখা গেল ফী বছর দশ লক্ষের বেশী মানুষ আসছে। তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মানুষের এই স্রোত বন্ধ হয়ে গেল। যুদ্ধের পর আবার এই অঙ্ক উর্দ্ধমুখী হতে যাচ্ছিল, কিন্তু আইন করে তাকে নামিয়ে আনা হল। অধিকাংশ আমেরিকানের কাছেই মনে হল, এখনকার কাজ হল যারা এসে গেছে তাদের ঠিক মত গুছিয়ে নেওয়া। তবুও, আজও পর্যন্ত, এই একমুখো মানুষের স্রোত অক্ষুন্ন আছে। বছরে হাজার দুই হবে। এত বড় একটা দেশের পক্ষে এই সংখ্যা অবশ্য খুব বেশী নয়। তবুও অটওয়ার মত সহরের পক্ষে এই সংখ্যাই যথেষ্ট।

১৮২০ থেকে ১৯৫৩ সাল অবধি এদেশে বসবাস করতে এসেছে চার কোটির মত লোক। এর মধ্যে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ এসেছে গ্রেট ব্রিটেন থেকে, আয়ারল্যাণ্ড থেকে এসেছে আরও কিছু বেশী। পঁচিশ লক্ষ এসেছে স্কান্দেনেভিয়া থেকে, ইতালী থেকে অর্ধ লক্ষ, জার্মানি থেকে নব্বুই লক্ষ আর মধ্য ও পূর্ব-ইউরোপ থেকে আশী লক্ষেরও অধিক। যারা এসেছে, তারা এমন বারংবার বিভক্ত হয়েছে যে, সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে আর তাদের পৃথক করা সম্ভব নয়।

ফলে জন্ম নিয়েছে এক মহাজাতি, এমন এক দেশ যেখানে পৃথিবীর সকল প্রধান ভাষাই কথিত হয়—যেখানে এখনও মিউনিকের মত জার্মান, মাদ্রিদের মতো স্প্যানিশ আর জুরিকের মত সুইস সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। হ্যামট্র্যামাক একটি পোলিশ সহর যার নিজের সরকার আছে আর তাকে পুরোপুরি ঘিরে রয়েছে ডেট্রোয়িট। লস এঞ্জেলস পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মেক্সিকান সহর। চীনের বাইরে চীনা সম্প্রদায়ের একটি বৃহত্তম নগরী সান ফ্রানসিসকো, তার নিজের হাসপাতাল, পোষ্ট অফিস, থিয়েটার, রেডিও-ষ্টেশন, দৈনিক সংবাদপত্র এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জ নিয়ে সে সম্পূর্ণতা পেয়েছে। এই এক্সচেঞ্জ-এর অপারেটাররা ছ'রকমের চীনা ভাষাই জানেন এবং গ্রাহকদের সকলের নাম আর নম্বর তাঁদের মুখস্ত। মিলানের পরেই চিকাগোর ইতালীয় জনসংখ্যা সর্বাধিক। সেখানকার পোলিশ জনসংখ্যাও সংখ্যার বিচারে ওয়ারশ'র পরেই স্থান পাবে। পিরেনীস-এর এদিকে ইডাহো ষ্টেটেই রয়েছে সব চেয়ে বড় বাস্কুই কলোনি। আগত সুইসরা উইসকনসিনের গ্রীণ সিটিকে পৃথিবীর সুইস চীজ রাজধানীতে রূপান্তরিত করেছে।

নিউ মেক্সিকো দ্বিভাষিক রাজ্য। সেখানে সরকারী নোটিশগুলো অবশ্যই স্প্যানিশ আর ইংরাজীতে পোষ্ট করতে হবে। এমন কি রাজ্যের সংবিধানও এই দুই ভাষাতেই অনুমোদিত হয়। নিউ মেক্সিকোতে পুরাতন স্পেনের দিনগুলো বহন করে-আনা গ্রামগুলোওআ ছে, যেখানে একটা ইংরেজী শব্দও শোনা যাবে না। তারপর রয়েছে আরিজোনা যার জমির তিনভাগের একভাগের মালিকানাই রেড ইণ্ডিয়ানদের হাতে, অনেক ক্ষেত্রেই যারা এখনও পূর্বপুরুষের মতোই বসবাস করে চলছে।

আমাদের সহরগুলোর মধ্যে নিউইয়র্কই সবচেয়ে বিচিত্রময়। সেখানে ইংরাজী ছাড়া অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যা দুইশত। নিউ-ইয়র্কের আশী লক্ষ মানুষের মধ্যে অর্ধেকের বেশী বিদেশী বংশোদ্ভূত অথবা গর্ভজাত। ইতালিয়ান এবং রাশিয়ান (সংখ্যায় প্রায় চার লক্ষের মত করে) বিদেশীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সম্প্রদায়। ইহুদীরা এসেছে অনেক দেশ থেকে এবং অনেকে বংশ পরম্পরায় এদেশে বসবাস করছে। এদের সংখ্যা মোট জন-সংখ্যার চার ভাগের একভাগ হবে। পৃথিবীর মধ্যে ইহুদীদের সবচেয়ে বড় সহর হল নিউইয়র্ক। অবশ্য এখানে নিগ্রো, পোর্টোরিকান, হাইতিয়ান এবং মেক্সিকানদের সংখ্যাও যথেষ্ট। হারলেম-এর মধ্যভাগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম

ফিনিশ সম্প্রদায়ের বাস। ইউরোপের সকল জাতি এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার অন্যান্য অঞ্চলের অনেক জাতিই আমেরিকার নির্মান কার্যে সহায়ক হয়েছে। আফ্রিকানরাও আছে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট একবার ঠিকই বলেছিলেন, 'এখানে আমরা সবাই আগন্তুক।'

বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়ানদের দেশান্তরে পাড়ি দেবার পালা সুরু হতেই, অর্ধডজন জাতি, কলম্বাস যে মহাদেশ ইউরোপীয় দুনিয়ার কাছে খুলে দেন, তার উপকূলে আড্ডা জমায়। স্প্যানিয়ার্ডরা দক্ষিণ-পশ্চিমে ঢুকে পড়ে এবং ক্যালিফোর্ণিয়া উপকূল বরাবর বসতি স্থাপন করে। মিসিসিপির আদি আবিস্কারক ফরাসী জাতি প্রতিষ্ঠা করল নিউ অর্লিয়েন্স যেখানে আজও পর্যন্ত তাদের কৃষ্টি অক্ষত আছে। লাউইসিয়ানা বেয়াস-এ ফরাসী এখনও প্রধান ভাষা।

দেলাওয়ারে সর্বপ্রথম পৌঁছায় সুইসরা। নামকরণ হয় নিউ সুইডেন। নিউইয়র্ক, সবাই জানেন, ইংরাজদের হবার আগে ডাচদের ছিল। পেনসিলভানিয়ার অনেকটাই, কোন জার্মান ষ্টেটের পতাকার নীচে না এলেও, যথেষ্ট সংখ্যক জার্মান অধ্যুসিত ছিল যাদের বলা হত পেনসিলভানিয়া ডাচ। সে ১৭২০-র কথা।

অবশ্য বসতিস্থাপনের জন্যে ইউরোপ থেকে যারা এসেছিল তাদের মধ্যে প্রভাবশালী ছিল ব্রিটিশ দীপপুঞ্জের অধিবাসীরাই। ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলস এবং উত্তর আয়ারল্যাণ্ড থেকে এসেছে আমাদের জনসংখ্যার অধিকাংশ; তাই মার্কিন জীবনের ভিত্তিটা ব্রিটিশ-প্রধান। ভাষা, আইন, পরিবারের নাম, সরকারের সম্পর্কে মনোভাব, সাহিত্য—এসব নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ কৃষ্টি থেকেই এসেছে। কিন্তু অন্য সকল প্রভাবে এই কৃষ্টি নিজেকে হারিয়ে ফেলল না কেন?

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, ইউরোপ থেকে এসে যারা প্রথম বসতি স্থাপন করে এবং যা থেকে প্রধানত জাতটা গড়ে ওঠে, তারা ছিল ইংরেজ। ১৭০ বছর মার্কিন ঔপনিবেশিকেরা সম্রাটের প্রজা ছিলেন। তাঁদের পিতৃভূমি, ভাষা, সমিতি এমন কি যে ভাবে তাঁরা সম্রাটের মোকাবিলা করতেন তাও ছিল ইংরেজোচিত। "প্রতিনিধি পাঠাতে না দিলে কর দেওয়া হবে না"—অধিকারের এই ধ্বনি স্বাধীন ইংরেজ হিসাবেই উচ্চারিত হয়েছিল, ঔপনিবেশিক বা আমেরিকান হিসেবে নয়।

জেমসটাউনের প্রথম স্থায়ী উপনিবেশ পরিকল্পিতভাবেই গড়ে ওঠে এবং তার পিছনে সে দেশের অনেকেরই সমর্থন ছিল। আর ছিল রাজকীয় সনদ।

দ্বিতীয় স্থায়ী উপনিবেশ প্লাইমাউথ ছিল প্রধানতঃ মধ্যবিত্তদের হাতে—উত্তর ইংল্যাণ্ডের ছোটখাট চাষী যারা স্বাধীন মানুষ হিসেবে গর্ব অনুভব করত এবং নিজেদের হাতে জমি রাখত। তারা তখনকার অ্যাংলিকান চার্চ আর সম্রাটের খেয়াল খুশীর বদলে বাইবেল সম্পর্কে নিজেদের ধারণায় ঈশ্বরাধনা করতে কৃত-সংকল্প ছিল। এই রকম ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রথম কেন্দ্র হল প্লাইমাউথ। সালেম, বোষ্টন, প্রভিডেন্স, নিউ হেভেন এবং দেশের ভিতরে কনেকটিকাট ধরে নতুন নতুন বসতি গড়ে উঠল—এক অন্য থেকে আলাদা, স্বতন্ত্র ধরণের। গোটা নিউ ইংল্যাণ্ডে ভিলেজ রিপাবলিক (গ্রাম মহাসভা) গুলো ছোট ছোট সরকার হিসেবে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করল।

ঔপনিবেশ স্থাপন কালে—যতদিন না আমাদের জাতীয় সরকার গঠিত হয়েছে—বহিরাগতের মধ্যে প্রধান ছিল ইংরেজ আর স্কটিশ-আইরিস (অর্থাৎ স্কটিশরা যারা উত্তর আয়ারল্যাণ্ডে গিয়েছিল)। কুড়ি লক্ষ ক্রীতদাসের আগমন আমেরিকান কৃষ্টিকে রূপ দিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিলেও আইন, সরকার আর ভাষার ব্যাপারে তা ইংরেজ আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে নি।

আমেরিকায় আগত ইংরেজ আর স্কটসম্যানদের মধ্যে বিরাট বৈচিত্র থাকলেও তাদের মধ্যে দুটো ব্যাপারে মিল ছিল : দেশের পরিস্থিতিতে অসন্তোষ এবং নতুন রাস্তা বার করার জন্যে পর্যাপ্ত সামর্থ আর শক্তি। উইলিয়াম ব্রাডফোর্ড, জন উইনথ্রপ, উইলিয়াম প্যেন এবং লর্ড বাল্টিমোরের মত সর্বোচ্চ স্তরের মানুষেরা এসেছিলেন এমন সম্প্রদায় গড়ে তুলবার স্বপ্ন নিয়ে যেখানে স্বাধীনভাবে তাঁদের ধর্মমত প্রকাশ করা যাবে। অন্যান্যরা এসেছিলেন তাঁদের জীবনের সঙ্কীর্ণ সীমারেখা থেকে নিস্কৃতি পাবার আশায় ; পরিবার পোষণের উপযোগী পর্যাপ্ত জমির অভাব, রুক্ষ ভূস্বামীর নিদারুণ করভার থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য।

"ঈশ্বর গোটা একটা জাতকে এই অরণ্যানীতে সরিয়ে দিয়েছিলেন যাতে তিনি তাদের শ্রেষ্ঠ শস্যসম্ভার উপহার দিতে পারেন" —লিখেছিলেন উইলিয়াম স্টাউটন। ঠিকই লিখেছিলেন। উপনিবেশ স্থাপনের সর্তই ছিল ঔপনিবেশিক-দের স্থান নির্বাচনের নীতি নির্ধারণ।

সুরু থেকেই এই আগমন ছিল আন্তর্জাতিক। তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে ছিল ওয়ালুন (বেলজিয়াম আর ফ্রান্সের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষ) আর ফ্লেমিশ (ফ্ল্যাণ্ডার্স-এর অধিবাসী) বংশোদ্ভূত নরনারী। জেমসটাউনে ছিল ইতালীয়ান,

ডাচ আর পোলিশ। ঔপনিবেশগুলোতে সবচেয়ে আগে আসে ফ্রান্সের হিউগেনো (ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসী প্রটেসট্যান্ট) সম্প্রদায়। এদের থেকে এসেছেন কয়েকজন শ্রেষ্ঠ আমেরিকান—পল রেভারে, ফ্যানেইল, ডুপন্টস। জার্মান প্রোটেসট্যান্টরা, বিশেষ করে মেনোনাইটস ও মোরাভিয়ানদের মত নির্যাতীত সম্প্রদায়গুলো উইলিয়ম প্যেনস-এর সহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণ করে দলে দলে পেনসিলভানিয়াতে আসে। অতলান্তিকের কূলের প্রতিটি উপনিবেশে ইংরেজী কৃষ্টি ও বৈচিত্র্যময় আন্তর্জাতিক আবহাওয়া বহন করে।

১৬৫৪ সালে প্রথম ইহুদী দল ম্যানহাটানে পৌঁছায়। কিন্তু তারও আগে, সেই ১৬৪৬ সালে, এই দ্বীপটি তার ক্ষুদ্র অবয়বে বারটি সম্প্রদায়কে আশ্রয় দিয়ে ভবিষ্যতকে আগে থেকেই স্থির করে ফেলে।

আমেরিকান কৃষ্টির মূলকথা হল সে পুরোপুরি উৎপন্ন আবার নির্ভুলভাবে অদ্বিতীয়ও—নতুন সৃষ্টি নয়, মিশ্রন যার সুবাসে তার ভিতরে-আসা সব কিছুর গন্ধ এসে মিলেছে। অবশ্য শক্তি পরীক্ষা আর কয়েকটি ক্ষেত্রে নির্লজ্জ অন্যায় সাধনের আগে এই ফললাভ হয় নি। ডাচেরা সুইসদের দেলাওয়ার থেকে বার করে দেয়, তারপর নিজেরাই ইংরেজদের থেকে বিতাড়িত হয়। উত্তর আমেরিকা কার দখলে থাকবে তাই নিয়ে একশ বছরের মত ইংরেজ আর ফরাসী-দের মধ্যে লড়াই হয়, বিরাট অরণ্যানী ভাগ বাঁটোয়ারা করতে কেউই সম্মত হয় নি। নিজেদের এই লড়াইয়ে ওরা রেড ইণ্ডিয়ানদেরও জড়িয়ে ফেলে। ফলে ইউরোপে শক্তি পরীক্ষার আর এক দিক হিসেবে যে বিবাদ বাধে, তাতে বেশ খানিকটা নির্দয়তা প্রবেশ করে।

প্যারী চুক্তির (১৭৬৩) পর উত্তর থেকে আক্রমণের আশঙ্কা অন্তর্হিত হল। ইংরেজদের উপনিবেশগুলো গোটা মহাদেশটার পূর্বাঞ্চলের সবটুকুর উপরই প্রভুত্ব বিস্তার করলে। কারণ যুদ্ধের শেষার্ধে ফ্রান্সের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করার ফলে স্পেনকে বাধ্য হয়েই ফ্লোরিডা ত্যাগ করতে হয়। (১৭৮০ সালে কিছু সময়ের জন্যে প্রত্যর্পিত হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিনে নেয়।) সরকার, ধর্ম এবং পারিবারিক জীবন সম্পর্কে ইংরেজদের ধারণার পক্ষে তাই কিছু সুবিধে ছিল। তবে ইংরেজীয়ানা আরও উন্নত হয়েছিল ডাচদের স্বাচ্ছন্দ্য জীবন যাপন স্পৃহা, ফরাসীদের বীরত্ব, আদিবাসীদের বিজ্ঞতা ও বিনয়, নিগ্রোদের সঙ্গীত আর বিষাদ, স্কটদের মিতব্যয়িতা আর কঠোর শ্রমপরায়ণতা আর হিউগানে সম্প্রদায়ের সহিষ্ণু কর্মক্ষমতা থেকে।

ইংরেজরা আমেরিকানে রূপান্তরিত হল, শিকার করতে আর রোপন করতে শিখল ইণ্ডিয়ানদের মতো। ইণ্ডিয়ানদের মতই লড়াই করতেও শিখল। বিপ্লব সুরু হলে দেখা গেল ইংরেজদের উপর এই ছিল, ওদের একমাত্র সুবিধে।

অতলান্তিক সীমান্তের অকল্পনীয় বিরাট অঞ্চলে বসতিস্থাপনের প্রশ্ন উঠতেই পুনরায় বহু মানুষের ক্ষমতা ও দক্ষতাকে আহ্বান জানাতে হল। ক্ষুদে প্লাই-মাউথ কনেকটিকাট-এ বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করতেই জনস্রোত পশ্চিমমুখী হল. টমাস হুকারও বনানীর ভিতর দিয়ে সেইখানে তাঁর চার্চ নিয়ে এলেন।

কানাডা ব্রিটিশদের হাতে এসে যেতেই পশ্চিম নিদারুণভাবে আকৃষ্ট হল। ভেরমণ্ট এ বসতি স্থাপিত হল, পশ্চিম নিউ ইয়র্কের পুরাতন বাসিন্দাদের সংখ্যা-বৃদ্ধি পেল। বিপ্লব থেমে যেতেই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে স্বাধীনতার যোদ্ধা তরুণদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। নিউ ইংল্যাণ্ড থেকে 'ওহিও কোম্পানী অব অ্যাসোসিয়েটস'-এর সদস্যরা ওহিও নদীর তীরে ম্যারিএট্টাতে এলেন তাঁদের প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করতে। পেনসিলভানিয়া থেকে মেজনাইস আর অক্লান্ত স্কটিশ আইরিশেরাও পশ্চিমমুখো চললেন। ইলিয়নস, উইসকনসিন, মিচিগান, আর ইণ্ডিয়ানাতে উপনিবেশ গড়ে উঠতে লাগল। তারপর জেফারসন বিরাট লাউসিয়ানা অঞ্চল ক্রয় করতেই আর একটা দেশে বসতি স্থাপনের সম্ভাবনা দেখা দিল। সীমানা আবার পশ্চিমমুখো হল।

সীমানাঞ্চল

আমেরিকানদের কাছে সীমানা কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন, ইউরোপীয় অর্থের সঙ্গে তার কোন মিলই নেই। ইউরোপে সীমানা বলতে এমন একটা স্থান বোঝান হয়, যেখানে থেমে যেতে হয়, যেখানে সীমান্ত রক্ষীরা টহল দেয়, যে স্থান অতিক্রম করবার পূর্বে সকলকে অবশ্যই পরিচয়পত্রাদি প্রদর্শন করতে হবে। আমেরিকার সীমান্ত বলতে বোঝান হয়েছে স্বাধীনতা, সুযোগ আর সম্প্রসারণের সম্ভাবনা। আমেরিকায় সীমানা থেমে যাবার জন্যে নয়, এখানে সীমানা উন্মুক্ত দ্বার; পরিচয় প্রকাশের নয়, এখানে ইচ্ছে করলে পরিচয় গোপন করা চলে; এ এমন একটা স্থান যেখানে সভ্যতা এখনও তার কড়াকড়ি কায়েম করতে পারে নি; এখানে পরিসর সীমাহীন এবং মানুষ খুশীমত আইন রচনা করতে পারে।

পশ্চিমের দিকে সীমানা—এই অনুভূতি, এমন কি কেউ যে দিকে যাবার

সংকল্প না করলেও, মার্কিন চরিত্র গঠনে বিরাট ভূমিকা নিয়েছে। আমেরিকান চিন্তাধারায় সীমানা সভ্যতার অপর পারে অবস্থিত, সেখানে মানুষের হাত থেকে প্রভুত্ব চলে গেছে, প্রকৃতির হাতে মানুষের চাতুরির ফলে সৃষ্ট দুর্নীতি সেখানে ধুয়ে মুছে যায় বড় বড় নদী, সীমাহীন আকাশ এবং সজীব আর সুন্দর বাতাসে।

উপনিবেশ স্থাপনের তরঙ্গ পশ্চিমমুখো ধাবিত হল। শিকারী, আদি আগন্তুক, তারপর স্থায়ী চাষী। শেষ পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বাড়ীগুলোর বদলে দেখা দিল সহর আর নগরী।

সুরুতে পশ্চিমমুখী যাত্রা চারটি প্রধান রাস্তা ধরে চলল : দক্ষিণ অতলান্তিক রাজ্যগুলো থেকে মেক্সিকো উপসাগর ধরে, দক্ষিণের পাহাড়গুলোর ভিতর দিয়ে টেনেসি এবং পুরাতন সাউথওয়েষ্ট ; ওহিও উপত্যকার দিকে ; অথবা গ্রেট লেকস থেকে উদ্ভূত পথ ধরে। এই প্রধান পথগুলো ধরে ধাবমান জনস্রোত বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হলে তাদের প্রাণচঞ্চল প্রদেশের মতোই মনে হয়।

প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে পশ্চিমমুখী এই যাত্রা ১৮৪০-এর দিকে সুরু হলে স্থলপথে আর গিরি সংকটের ভিতর দিয়ে আবার কতকগুলো রাস্তা তৈরী হল। আরও অনেক পরে সমতল ভূমির রাজ্যগুলো পূর্ণ হতে লাগল। যে চাষীর দল পশ্চিমমুখী হয়ে অগ্রনায়কদের স্থলাভিষিক্ত হয় তাদের অনেকেই ছিল নবাগত। ১৮২০ আর ১৮৩০-এর পশ্চিম নিউ ইয়র্ক ; পেনসিলভানিয়া আর ওহিওর পরিত্যক্ত স্থানগুলো দখল করে। চার দশকে তারা মিশৌরী, ইলিনয়স এবং দক্ষিণ উইসকনসিনের দিকে যায়। পাঁচ ও ছয় দশকে পূর্ব-আইওয়া ও মিনেসোটায় এবং সাত দশকে তারা প্রেরী রাজ্যগুলোতে গিয়ে হাজির হয়।

মার্কিন চরিত্র গঠনে সীমানা যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল বহু দিন হল তা স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই সম্পর্কে তাঁর থীসিস দাখিল করার সময়ে ফ্রেডারিক জ্যাকসন টার্ণার এ থেকে যে স্বাতন্ত্র্য, আত্মপ্রত্যয় আর ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে তার উপর জোর দিয়েছিলেন।

প্রথম পশ্চিমমুখী যাত্রা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হলেও স্থায়ী সহরের পত্তন সুরু হতেই অবশ্য মাধ্যম হয়ে দাঁড়াল স্বেচ্ছা সঙ্ঘগুলি—নবাগতদের কোম্পানী অথবা সোসাইটি। কখনও বা এই সব সমিতি লিখিত গঠনতন্ত্র গ্রহণ করল। যে সকল শব্দ তাতে ব্যবহৃত হল তাতে মেফ্লাওয়ার কমপ্যাক্টের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কখনও এই সঙ্ঘগুলি এত ছোট আর নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল যে লিখিত গঠনতন্ত্রের কোন প্রয়োজনই থাকল না।

এই সঙ্ঘগুলি ওয়েষ্টার্ণ এমিগ্রেসান সোসাইটি (যা সমতলভূমি পেরিয়ে ক্যালিফোর্নিয়াতে এসেছিল) অথবা অরিগন এমিগ্রেসন সোসাইটি অব আইওয়া টেরিটরি—যাই হোক না কেন প্রথম দিককার নিরাপদ আর সফল বসতি স্থাপনের জন্যে সংগঠনের প্রয়োজন ছিল। স্বর্ণাঞ্চলমুখী গতির সময় ক্যালিফোর্নিয়ায় পৌছনোর জন্যে গঠিত কয়েকটি কোম্পানীর সযত্নে রচিত গঠনতন্ত্র, ইউনিফর্ম, কর্মচারী, ডাক্তার, ভূতাত্ত্বিক, মন্ত্রী, খনিবিদ এবং যন্ত্রবীদও ছিল।

রুক্ষ মেজাজী মানুষের অহঙ্কারে নয়, প্রাচীন আমেরিকান সমাজের সুর শোনা যাবে তার অধিবাসীদের অসংখ্য কাজের মধ্যে যা তারা ভাগাভাগি করে করেছিল—শস্য কাটা, লেপ-তোষক তৈরী, আপেলের খোসা ছাড়ানো, ভল্লুক শিকারী, রাস্তা নির্মাণকারী, ধানভানাই করা দলের কাজের মধ্যে। কঠোর কাজের মধ্যেও পারস্পরিক সাহায্যদানের রীতি থেকে আসত হাসিঠাট্টা এবং সামাজিক পরিবেশ যা না থাকলে সবকিছুই হয়ত একঘেয়ে বলে মনে হত।*

ইউরোপ থেকে আগত দেশান্তর যাত্রীরা প্রায়শঃই দলবদ্ধ হয়ে কোন স্থানে বসতি স্থাপন করেছে, তারপর স্বেচ্ছাসঙ্ঘের সেই একই পদ্ধতিতে চার্চ, সামাজিক দল, খবরের কাগজ ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের পত্তন করেছে। দলীয় সহযোগীতা অথবা স্বেচ্ছা-সাহায্যের স্বভাব যা পৃথিবীর সর্বত্র গ্রামীন সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে পাওয়া যাবে, ইতিমধ্যেই অধিকাংশ দেশান্তর যাত্রীদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। নবাগতরা দেশে চাষী ছিল, মাঠে একে অপরকে সাহায্য করত এবং তাদের সামান্য যা আনন্দ তা ছিল সকলে মিলে কাজ করার মধ্যেই।

১৮৮২-এর আগে অধিকাংশ দেশান্তরীই এসেছে জার্মানি, স্কান্দানেভিয়া আর ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ থেকে। ইংরেজদের অনেকেই এসেছিল মিসিসিপি উপত্যকায়, সেখানে তা জার্মানমুখী অঞ্চলে ইংরেজী সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে সহায়ক হয়েছে। ১৮৯৬ সালের পর দক্ষিণ আর উত্তর ইউরোপের দেশান্তর যাত্রীরা সংখ্যায় উত্তর থেকে আগতদের পিছনে ফেলে এসেছে। তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এই জনস্রোত বন্যার আকার ধারণ করে। দেশান্তর যাত্রীদের অনেকেই ঘৃণ্য সামরিকীকরণ এড়াতে চলে এসেছে মার্কিন স্বাতন্ত্র্যবাদে যার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এখানে "তোমার বাবা কে ছিলেন ?" অথবা "কি করতেন ?' তা কেউ জানতে চায় না। এখানে প্রশ্ন করা হয়, : "তুমি কি কর ?" ১৮৪১ সালে জনৈক তরুণ

* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোড়া পত্তনে এই স্বেচ্ছা-সঙ্ঘগুলির ভূমিকা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে হলে আমার 'এ জেনআরাম ক্রীডম' দেখুন।

নয়ওয়েজিয়ান লিখেছিলেন,"স্বাধীনতা এখানে এমন একটা উপাদান যা, কতকটা যেন মায়ের দুধের মত টেনে বার করা হয় এবং মনে হয়, প্রতিটি মার্কিন নাগরিকের কাছেই এই স্বাধীনতা বাতাস গ্রহণ করার, মতই অপরিহার্য।"

দেশান্তর যাত্রীরা এখানে মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন, কারণ তাদের কাজ সমাদর লাভ করেছে এবং তাদের রীতি মেনে নেওয়া হয়েছে। 'খুশী মত চলবার স্বাধীনতা থাকলেও এবং কোন কিছু করতে বাধ্য না করা হলেও এ সম্পর্কে তারা সচেতন ছিল যে, কোন দিনই তারা পুরোপুরি মিলে যেতে পারবে না। স্বেচ্ছায় নিজেদের সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন নবাগতেরা নতুন পরিবেশের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়েই রইল। এই অস্থিরতা মার্কিন কৃষ্টির উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করলে।

নবাগতেরা তাই দোটানায় পড়ল। গ্রামের সজীব জীবন তার নাগালের বাইরে রয়ে গেল, বাস্তবের মুখোমুখী হতেই বুঝতে পারল সে জীবন তারা পেরিয়ে গেছে। তারা অনুভব করলে তাদের পুরাতন মূল্যবোধের উপর আক্রমণ চলছে, আর সেজন্যই সেগুলোর পক্ষ সমর্থনের জন্যে তারা তৎপর হয়ে উঠল। তারা মার্কিন জীবনপদ্ধতি অনুসরণ করলে এবং উৎকৃষ্ট উপনিবেশের দিকে গেলে তাদের হয়ত অবাঞ্ছিত আগন্তুক মনে করা হ ত।

তাই তাদের আশা কেন্দ্রীভূত হল তাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে। এখানেও কিন্তু সেই সঙ্কটের মধ্যেই রয়ে গেল তারা। আসলে তারা ছিল আমেরিকান। নবাগত তার দেশের কৃষ্টি বোঝাতে গেলে অথবা সেখানকার শৃঙ্খলাবোধকে চাপাতে গেলে তারা আপত্তি জানাত। ইস্কুলে ইংরেজী কৃষ্টি এবং যা কিছুর মূলে ইংরেজী তা সমাদৃত হত—এটাও তারা লক্ষ্য করেছিল। খেলার মাঠে তাদের নিজস্ব কৃষ্টি ডাগো, কনাক, মিক—এই সব কথার মধ্যে প্রকাশ পেত।

সকল তরুণের মত সব রকমে তারাও অধিকার চাইত। তাদের পিতার দল অন্য কিছু না থাকায় পুরান মতকেই আঁকড়ে ছিলেন, কিন্তু তার উপর আর তেমন শ্রদ্ধা ছিল না। পরবর্তী বংশধরেরা পরিত্যক্ত কার্যটি সম্পাদন করল। তারপরের বংশধরেরা দেখলেন এই পরিত্যাগ মার্কিন জীবন যাত্রা পদ্ধতির অংশ বিশেষ হয়ে উঠেছে—এজন্য তারা উন্নত ধরণের শিক্ষা প্রয়োগ করলেন যাতে পিতার অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক পদমর্যাদা অতিক্রান্ত হয়।

মার্কিন ছেলেমেয়েরা প্রায়শঃই স্বীকৃতি পাবার আশায় জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠল। পর্যবেক্ষকেরা একে বর্তমান জাতীয়তার একটি উল্লেখযোগ্য উৎস হিসাবে

দেখেছেন। কখনও বা ঘৃণিত পূর্বাবস্থা অতিক্রম করতে ইচ্ছুক তরুণদের দল তাদের যারা পৃথক চোখে দেখে তাদের থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে দল গঠন করল। এই দল সহজেই আবর্তে পরিণত হল। গায়ের জোর ছাড়া তরুণদের আর কোন সুবিধেই ছিল না, তবুও আমেরিকার সাফল্যের দাবীর তাড়নায় তারা রাজনীতির প্রান্তে এসে পৌঁছল যেখানে সহজেই শক্তসমর্থ মানুষেরা এসে ভিড় করেছিল। অথবা, আরও ন্যায্যভাবে, তারা স্পোর্টস-এর সিড়ি ধরে এমন ভাবে তরতর করে উপরে উঠতে লাগল যে, উচ্চারণযোগ্য নয় ফুটবল টীমের এমন পোলিশ নাম ধরে তামাসা করা রেওয়াজে পরিণত হল। ভাল মনের অনেকে শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে শিক্ষকতার কাজ নিলেন এবং শ্রদ্ধাভাজন হলেন।

মা-বাবার বৈদেশিকত্ব বিসর্জন দিয়ে এই তরুণের দল বিবাহ করতে ব্যগ্র ছিল কারণ এইভাবে তারা পারিবারিক বন্ধনমুক্ত হয়ে নিজেদের, মার্কিন পরিবারের, পত্তন করতে পারত। প্রেম মুক্তির প্রতীক হয়ে দেখা দিল, আমেরিকীকরণের যা চরম পদক্ষেপ। এইভাবে রোমান্টিক প্রেমের উপর মার্কিন স্বভাবানুযায়ী আরও জোর দেওয়া হল; সম্প্রসারিত পরিবার নয় প্রেমিক দম্পতিকে পরিবারের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হল।

বংশ থেকে এই বিচ্যুতি দুঃখজনক হলেও অনিবার্য ছিল বিদেশী বংশোদ্ভূত ও তাদের ছেলেমেয়েদের জন্যে। অনেকে একে গ্রহণ করতে পারেন নি। দারিদ্র্য, অমিতাচার, জুয়াখেলা, অপরাধ এবং পাগলামি ছিল এ-চিত্রের অপরাংশ। তবুও এক একটি ব্যর্থতার সঙ্গে ডজন ডজন সাফল্যও দেখা দিয়েছে। মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে, আগন্তুকের দল রীতিমত মার্কিনী ধাঁচে গড়ে উঠলেন। এই সত্যকে উপলব্ধি করতে হলে ব্রাজিলের অথবা নিউ সাউথ ওয়েলস-এর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের জার্মান বংশোদ্ভূতদের তুলনা করতে হয়। এখনও ব্রাজিলের ওরা জার্মানিতে কথা বলে, চিন্তা করে, ভোট দেয়। নিউসাউথ ওয়েলস-এর জার্মানরা মিশরীয় জার্মানদের চেয়ে অধিক জার্মান থেকে গেছে যদিও ইংরেজ সমাজ তাদের ঘিরে রেখেছে। এমনটা হল কি করে?

ভাবুন সেই জন ডেফারারিয়র কথা যিনি ন'বছর বয়স থেকে বোষ্টনের রাস্তায় ফল বিক্রী করতেন। তাঁর বাবা এসেছিলেন ইতালী থেকে। আটটা সন্তানকে তাঁকে খাওয়াতে হয়েছে। জনই ছিলেন বড়। বালক জানতেন বোষ্টনের পয়সা-ওয়ালা বাড়ীগুলোর অধিকাংশই ছিল ষ্টেট ষ্ট্রীট এলাকায়, তাই স্থির করলেন

যেখানে বেশী টাকা সেখানেই ভাল বিক্রী হবে তার। ঝুড়ি খালি করে তবে বাড়ী ফিরতেন এবং উপার্জনের সবটুকুই বাবার হাতে তুলে দিতেন।

অষ্টম মানের পর ইস্কুল ত্যাগ করলেও জন পড়াশোনা ছেড়ে দেন নি। তিনি জানতেন ষ্টেট ষ্ট্রীটের খরিদ্দারেরা অর্থ বিনিয়োগ করেই বড়লোক হয়েছেন। কি করে সেটা সম্ভব হল জানবার জন্যে তিনি পাবলিক লাইব্রেরী থেকে বই এনে পড়েছেন—অবশ্য ফল ফেরি করা বন্ধ করেন নি। ষোল বছর বয়সে জন একটা ঘোড়া আর একটা ওয়াগন কিনতে সক্ষম হলেন। তিন বছর পরে ফ্যানেউল হল-এর কাছে ফলের পাইকারী ব্যবসা সুরু করলেন। আইন মাফিক চুক্তি সম্পাদনের মত বয়েস তখনও হয়নি তাঁর, তাই দরজার উপরে বাবার নাম লিখলেন। শীঘ্রই জোর ব্যবসা সুরু হল। ১৮৯০ সালে পাবলিক লাইব্রেরীর কাছে বয়েলষ্টন ষ্ট্রীটে বড় দোকান খুললেন। রাতটা কিন্তু তাঁর কাটত ফল, বিনিয়োগ, ভূ সম্পত্তি, আইন, সফল ব্যবসায়ীদের জীবনী প্রভৃতি মনোমত বিষয়ের বই নিয়েই। তিনি স্থির করলেন যে, ফল রপ্তানি করে আর হোটেল, রেঁস্তোরা, জাহাজ আর বড়লোকের বাড়ীতে ফল বিক্রী করে আরও অর্থ উপার্জন করবেন।

বিনিয়োগ করার মত অর্থ যখন হাতে এল, তখন বছরের পর বছর পড়াশোনার ফলে কতকগুলি মৌলিক সিদ্ধান্ত করবার ক্ষমতা হয়েছে তাঁর। এই সিদ্ধান্তের একটা হল: অর্থ বিনিয়োগ করবার একমাত্র ব্যবসা হল যাতে সবচেয়ে নীচের ধাপ থেকে কাজ করে উপরে ওঠা গেছে। তাঁর যুক্তি ছিল, মানুষ যদি ঠিক থাকে, তবে ব্যবসাও ঠিক থাকতে বাধ্য। তাঁর আর একটা সিদ্ধান্ত হল সব চেয়ে নিরাপদ বিনিয়োগ হল ভূমি আর ভূ-সম্পত্তি। সুরু করেছিলেন ছোট ছোট বাড়ী কিনে; সেগুলো মেরামত করে ভাড়া দিয়েছিলেন।

যখন আশী বছর বয়েস, তখন জন ডেফারারি চল্লিশ লক্ষ ডলারের মালিক। চিরকাল বাঁচবেন না উপলব্ধি করতেই, ভাবতে লাগলেন এত অর্থ দিয়ে কি করবেন তিনি। আবার লাইব্রেরীতে গেলেন, পড়তে লাগলেন অন্যান্যরা কি করে গেছেন—কিন্তু যা পড়লেন কোন কিছুই তাঁকে খুসী করতে পারল না। বোষ্টনের তরুণদের জন্যে কিছু করতে চেয়েছিলেন তিনি, তাঁরই মত যাদের উচ্চাশা আর শক্তি আছে। যে ব্যাঙ্কগুলোতে তাঁর সম্পত্তি ভাগ করে গচ্ছিত ছিল, সতর্কতার সঙ্গে তাদের প্রশ্ন করতে লাগলেন তিনি। কেউই জানত না যে এই সহজ সরল ছোট্ট বয়স্ক মানুষটি ছিলেন ক্রোড়পতি।

অবশেষে একজন বিশ্বস্থ অফিসারের সাক্ষাত পেলেন। তাঁর উপর ভরসা করা যায়, নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তাঁর কাছে। বললেন, "আমার যা আছে বোষ্টনই তা আমাকে দিয়েছে। এই বোষ্টনের গরীব ছেলেদের জন্যে কিছু করতে চাই আমি। মানুষকে তার সময়ের সদ্বব্যবহার করতে উৎসাহিত করতে চাই।"

যে লাইব্রেরী জন ডেফেরারিকে সাহায্য করেছিল, তাকে তিনি দশলক্ষ ডলার দান করলেন। এই অর্থ অন্যত্র বিনিয়োগের দ্বারা দ্বিগুণ কুড়িলক্ষ ডলারে পৌঁছলে, তার অর্ধেক দিয়ে লাইব্রেরীর 'জন ডেফেরারি উইং'-এর গৃহ নির্মান করা যেতে পারে। এই টাকা আবার কুড়িলক্ষ ডলারে পরিণত হলে ট্রাষ্টিরা খুশীমত তাকে কাজে লাগাতে পারবেন।

দানপত্রে দস্তখত করে বহিরাগতের এই ছেলেটি (যিনি নিজেই গড়ে তুলেছিলেন,) তাঁর অনেক বাড়ীর মধ্যে একটা সাধারণ বাড়ী বেছে নিয়ে সেখানে চলে যান। সে-বাড়ীর ঠিকানা তিনি দেন নি।

জন ডেফেরারির জীবনের সীমাবদ্ধতার মতই শিক্ষনীয় তার আর্থিক সাফল্য যাকে তিনি তাঁর আমেরিকানবাদের প্রমাণ বলে মনে করতেন। পূর্বপুরুষদের সতর্ক সঙ্কোচের ভাব ত্যাগ করতে পারেন নি জন। অপ্রয়োজনে এতটুকু অর্থও ব্যয় করেন নি—এমনকি হাঁটতে পারলে কখনও রাস্তার গাড়ীতে চাপেন নি; নিজেই নিজের সব কিছু মেরামত করেছেন; হিসেবপত্র লিখেছেন; টেলিফোন রাখেন নি; চিঠি লেখেন নি; নিজে গিয়ে সব কাজ করেছেন। রান্নাবান্নার কাজও নিজেই করেছেন, আরাম উপভোগের মধ্যে যান নি। বিয়েও করেন নি।

আমেরিকান সাফল্যের সূত্র হল প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ আর বাণিজ্যের সুযোগ। তবুও, সাফল্য লাভের সংগ্রাম অনেক কষ্টে আয় করা অর্থ খুশীমত ব্যয় করবার ইচ্ছে অথবা ক্ষমতাকে নষ্ট করে দিয়েছে। কর্মচ্যুতি এবং মন্দার আশঙ্কা থেকে মুক্ত পরবর্তী বংশধররাই, সাফল্যের এই সূত্রের সঙ্গে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে পেরেছিলেন।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর অনেক আমেরিকানেরই মনে হয়েছিল ইউরোপ থেকে দেশান্তর যাত্রার এই অভিযানকে বন্ধ অথবা মন্থর করে দেবার দরকার হয়েছে। মোট জনসংখ্যার আটভাগের এক ভাগই বিদেশী বংশোদ্ভূত। তার চার ভাগের তিন ভাগ সহরে বাস করেছে, অনেকেই ভীড় করেছে বস্তিগুলোতে যেখানে শিশুর দল অনায়াসেই অকর্মন্য অথবা অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠতে পারত।

যুদ্ধোত্তর কালের জাতীয়তাবাদের তরঙ্গে আবিষ্ট এবং ধর্মযুদ্ধের দ্বারা বিশ্বকে

গণতন্ত্রের পক্ষে নিরাপদ করার মোহ থেকে মুক্ত আমেরিকানরা সামাজিক সমস্যা আর মন্দার মুখে বহিরাগমনের বিরুদ্ধে কঠোর বিধি নিষেধ আরোপ করল। ১৯২১ সালে এবং পরে আবার ১৯২৪-এ কংগ্রেস বহিরাগমন নিয়ন্ত্রণ করল। ১৯২৯ সালে জাতিগত উৎপত্তির ধারা কার্য্যকরী হল। যে'কোটা' ব্যবস্থা চালু হল তাতে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও উত্তর আফ্রিকারই সুবিধে হল। মোট বার্ষিক ১৫০,০০০ -এর কিছু বেশী হলেও আগতদের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল, কারণ কোটার বাইরের অনেকেই, যেমন বহিরাগতদের ছেলেমেয়েরা, আগেই এখানে ছিলেন।

বহিরাগমন এবং মার্কিন কৃষ্টি

মার্কিন কৃষ্টির উপর এই বহিরাগমনে গোড়ার দিকে যে ফল দেখা দেল সে হল পুরাতন পৃথিবীর ধারণাগুলির প্রতি উগ্র স্বদেশিকতাসুলভ সমর্থন। কিন্তু পরবর্তী বংশধরেরা পূর্বপুরুষদের দেশের সঙ্গে যুদ্ধ না চাইলেও সকল সম্পর্কের কথা অস্বীকার করার স্বাতন্ত্র্যবাদের উল্লেখযোগ্য উৎস হয়ে দাঁড়াল। তবুও এখন মনে হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী ফল যা দেখা দিয়েছে সে হল বিশ্ব পরিস্থিতিতে নৈতিক পক্ষাবলম্বন। যে সব অঞ্চলে জনগণ উন্নত ধরণের জীবন যাত্রার মান ও সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করছে, সেখানকার নরনারীরাই আমেরিকার বর্ত্তমান শক্তি অর্জনে সহায়তা করেছে—এই উপলব্ধির পশ্চাতে রয়েছে এই সত্য।

বহিরাগতদের মধ্য থেকেই এল রেল লাইন, নগর আর রাস্তা নির্মাণের এবং সরল কৃষি-অর্থনীতিকে উচ্চস্তরের শিল্পকরণের পক্ষে প্রয়োজনীয় লোকশক্তি। কৃষি কাজের জন্যে বহিরাগতের দল বেপরোয়াভাবে বর্ধিত জমি নিল এবং পুণরায় তাদের আবাদী করে তুলল।

শিল্পকলার ক্ষেত্রেও বহিরাগতদের অবদান অসীম। আমাদের প্রাচীন লেখকদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে ইংরেজীয় সংযোগ ছিল। যেমন মেলভিল, হুইটম্যান, থরো, ক্রেনো। আমেরিকান সঙ্গীতে, ধর্মসঙ্গীত, জাজ, পর্সিও রেস-এ, নিগ্রোদের মৌলিক অবদান রয়ে গেছে। আমাদের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-শিল্পী এবং লেখক নিগ্রো। জার্মান এবং ইতালীয়ানরাও এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গীতপ্রেমী মন নিয়ে, এখনও সিম্পনি অর্কেষ্ট্রা আর অপেরা কোম্পানীগুলোতে এদের পাওয়া যাবে।

পোষাক ব্যবসায় থেকে বৈজ্ঞানিক এবং শিল্প প্রয়াসের মাধ্যম অবধি পরি-

ব্যাপ্ত ইহুদীদের প্রভাব। ব্যবসায়ী হিসেবে ওরা সহরের পর সহরে আর নগরের পর নগরে যায়, কাপড়, কড়িবর্গা, লণ্ড্রী ও অন্যান্য খুচরো দোকান নিয়ে বসে। ষ্ট্রস, গিমবেল, গাগেনহাইম, ফ্রম্যান, এবং রোসেনওয়াল্ডদের পিতৃ-পুরুষেরা সকলেই সাধারণ ফিরিওয়ালা ছিলেন। শূন্য থেকেই তাঁদের ভাণ্ডার পূর্ণ হয়। হাজার হাজার ইহুদী মার্কিন জীবনকে সমৃদ্ধ করেছেন, এঁদের মধ্যে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি, নোবেল পুরস্কার বিজেতা, অভিনেতা, সর্বোচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত-শিল্পী, লোকপ্রিয় সঙ্গীতের রচয়িতা, নাট্যকার, সিনেমা জগতের নেতা, পদস্থ সরকারী কর্মচারী ও শিল্প দুনিয়ার নেতা আছেন।

বহিরাগতদের উৎসের একটি তাৎপর্য্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল তার বর্ণ বৈচিত্র। নিউ ইংল্যাণ্ড এবং দক্ষিণের পার্বত্য প্রদেশে এখনও এমন অনেক ছোটখাট সহর পাওয়া যাবে যার বাসিন্দাদের প্রায় সকলেই প্রাচীন ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত। এঁরা নিজেরাই নিজেদের দ্রষ্টব্য করেছেন কারণ কদাচ এদের দেখা যায়। নিউ-মেক্সিকো, চীনা-টাউন এবং ক্ষুদে টোকিও ও ক্ষুদে ইতালীর হিসপানো আমে-রিকান সম্প্রদায়ের মতো এরাও ব্যতিক্রম। মার্কিন চিত্রের একটি বিশেষ উদাহরণ হ'ল এমন একটি চিত্র যার পশ্চাতভাগে রয়েছে পাঁচমেশালী রং।

ছোট, সহরের মেন ষ্ট্রীটের দিকে তাকান। যেমন বেনিংটন অথবা ভেরমণ্ট। যে বাজারে ফল, কেক অথবা ভাজা বিক্রী হয় তা গ্রীকদের তত্ত্বাবধানে। নর্থ ষ্ট্রীটের কোণের দিকের দুটো সুন্দর রেঁস্তোরা আর দর্জীর দোকানটাও গ্রীক-দেরই। জুতো মেরামতের দোকান চালান এক ইতালীয় পরিবার। সিগারের দোকানটা সিসিলিয়ানদের। ইহুদীর দোকান বলতে কড়িবর্গা, ঔষধ আর কতকগুলো কাপড়ের দোকান। এদেরও আবার ইয়াংকী নাম রয়েছে। একটা সেরা বাজার চালান জনৈক সিরিয়ান। মুদীর দোকান, পেট্রোল পাম্প প্রভৃতিতে ফরাসী ক্যানাডিয়ানদের ব্যস্ত দেখা যাবে। ওলন্দাজ (ডাচ) বংশোদ্ভূত আমেরিকানের হাতে রয়েছে একটি ছাপাখানা। উকিলদের মধ্যে অ্যাগস্টিনি, লেভিন, মরিসে এবং বারবার ও হলডেন—এই ধরণের নাম পাওয়া যাবে। এঁদের অনেকেরই পরিবার পুরুষানুক্রমে ভেরমণ্ট-এ বসবাস করেছে, অন্যরা নবাগত। স্বদেশে শতাব্দী ধরে যারা কলহ আর লড়াই করেছে তারাও আমেরিকায় যে করে হোক একসঙ্গে নিরুপদ্রবে বসবাস করেছে। এ সামান্য কৃতিত্বের কথা নয়।

এই অবস্থায় পৌছতে লোক-উৎসব, জাতিভিত্তিক দলীয় সংগঠন, বিভিন্ন

ভাষার ইস্কুল অথবা পৃথক চার্চ গঠনে উৎসাহিত করতে হবে কিংবা সাধারণ কৃষ্টির উপর জোর দিতে হবে আমরা তা ঠিক বুঝতে পারিনি।

সম্ভবত মার্কিনী নানাবাদী আর প্রয়োগিক* দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তাল রেখেই আমরা দুইই করেছি। আইওয়ার পেলা এবং হল্যাণ্ড ও মিচিগানের ডাচ সম্প্রদায়ের টিউলিপ (ফুল) উৎসব শেষ হতেই সকলে সাধারণ আমেরিকায় চলে যায়। ফ্লোরিডার টারপন স্পিংস-এর গ্রীক সম্প্রদায়ের জলকে আশীষ দেবার উৎসব আছে, কিন্তু সমুদ্র থেকে ক্রশ উদ্ধার পেতেই সিনেমা, টেলিভিশন আর বেটারীকে ঘিরে পরিচিত জীবন আবার সুরু হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষেরা সিটি কাউন্সিলের সদস্য হতেই অথবা বিভিন্ন নাগরিক সমিতিতে তাঁদের আসন নিতেই ইতালো-আমেরিকান ও পোলিশ আমেরিকান সোসাইটিগুলোর অন্তর্ধান ঘটে। ভাষাগত এবং ধর্মগত ব্যবধান দূর হবার পরও জীবনের প্রাচীনতম প্রতীক ধর্মের ক্ষেত্রে পার্থক্য থেকেই যায়। অবশ্য এও সেকেলে আমেরিকানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

নবাগতকে সবসময়েই বাধাবিপত্তি আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়তে হলেও, হতে পার যে, এই চ্যালেঞ্জই তাকে সাফল্যের পথে যেতে উত্তেজিত করেছে। বহিরাগতদের অথবা তাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছে তাঁদের বিরাট তালিকা দেখলেই মনে হবে একথা হয়ত সত্য।

জুলিয়াস লেম্যানের ইতিহাস থেকেই সত্য উপলব্ধি করা যায়। ব্যাভেরিকা থেকে তরুণ বয়সে তিনি নিউইয়র্কে আসেন, পড়াশোনা করবার সঙ্গে সঙ্গে কাজও করতেন, তারপর তার বিয়ে হয় এবং আরও তিনটে পুরুষকে বড় হতে দেখেন। ধনী হন নি, কিন্তু অবস্থা ভালই ছিল। বিরানব্বই বছর বয়েসে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে দুটো বড় দান করে যান: এক হাজার ডলার তাঁর মা-বাবার কবরের যত্ন নেবার জন্যে আর বাকীটা, প্রায় ষাট হাজার ডলার যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে দিয়ে যান, যার কাছে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী নাগরিক হিসেবে আশীর্বাদ পাবার জন্যে ঋণী।

*Pluralistic and pragmatic

পরিবার জীবন

মার্কিন পরিবার সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য কথা হল এই যে সেটা একটি ক্ষুদ্র কেন্দ্র। বাবা, মা আর ছেলেমেয়ে। পৃথিবীর অন্যান্য বহু অংশে পরিবার অনেক বড় ব্যাপার, একই ছাদের নীচে ঠাকুর্দা, ঠাকুরমা, তাঁদের ছেলেরা এবং ছেলেদের সংসার। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে, অধিকাংশ পশ্চিম দুনিয়ার মতো, বিবাহবন্ধনই ভিত্তি এবং প্রতিটি বিবাহ নতুন পরিবারের জন্ম দেয়। বিয়ে হয়ে গেলে সকলের জীবনই সুরু হয় তার মা-বাবার সংসারে এবং নিজের পরিবার গঠন করলেও সে তার সদস্য থেকে যায়। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর পরিবার এসে যায়, পরে তার সন্তানদের পরিবার অথবা সন্তানরা যাদের বিবাহ করে তাদের পরিবারের সঙ্গেও তাকে যুক্ত হতে হয়। তাই অনেক পরিবারের সঙ্গেই আমেরিকানদের সম্পর্ক। অবশ্য বিয়ের পর নিজের পরিবারই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অর্থাৎ তার কঠিন দায়িত্ব এসে পড়ে এই পরিবারের উপরেই। তবুও মা-বাবার পরিবারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থেকেই যায়।

মা-বাবা অবশ্য নতুন পরিবারের ব্যাপারে অন্তরায় সৃষ্টি করতে চান না। মা-বাবার মধ্যে কারও মৃত্যু হলে যিনি বেঁচে থাকেন তিনি একাকীই দিন কাটান, নয়তো বোনের বাড়ীতে কিংবা বৃদ্ধদের কোন হোম-এ যান। মার্কিন জীবনযাত্রা তারুণ্য আর গতিশীলতার জন্যে পরিকল্পিত, তাই ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কোন দম্পতির পক্ষে তাদের মা অথবা বাবাকে নিয়ে বসবাস করাটা কিছু অস্বাভাবিকই। মা-বাবা অথবা ভাই-বোনের সঙ্গে অত্যন্ত হৃদ্যতার সম্পর্ক থেকে যেতে পারে, এক পরিবার অন্য পরিবারে বেড়াতে যেতে পারে, বহুদূর থাকলে প্রয়োজনবোধে সপ্তাহখানেক থেকেও যেতে পারে।

অধিকাংশ পরিবারই বৃহত্তর পরিবারের সদস্য হিসেবে গর্ব অনুভব করে। এই বৃহত্তর পরিবারে শুধু ভাই অথবা শালা-ভগ্নিপতির দলই নয়, কাকা-পিসে-মেসো, এমন কি তাঁদের আত্মীয়স্বজন, যাঁদের সঙ্গে আর কোন রক্তের সম্বন্ধই থাকে না, সকলকেই ধরা হয়। বিশেষ করে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয় ভাই-বোন আর ঠাকুর্দা অথবা দাদু আর তাঁর নাতি-নাতনির মধ্যে। নাতি-নাতনির সংখ্যা গর্ব করার রেওয়াজ চলে আসছে, এর মধ্যে খানিকটা বংশ প্রধানের

আভিজাত্য রয়ে গেছে। বিশেষ করে (নভেম্বরের শেষ বৃহস্পতিবারে ভগবানের কাছে আমেরিকানদের) ধন্যবাদ প্রকাশের দিন পারিবারিক সম্পর্ক প্রগাঢ় হয়ে দেখা দেয়, তখন ছেলে আর নাতি-নাতনির দল লম্বা পাড়ি দেয়, পরিবারের বাড়ীর (ফ্যামিলি হোম) উদ্দেশ্যে, পুরাতন সম্পর্ক ঝালিয়ে নেবার জন্যে।

মার্কিনব্যবস্থা নিরপেক্ষ নীতি মেনে চলে। পরিবারের নাম স্বামীর নাম থেকেই আসে, তাই স্বামীরা কিছুটা অগ্রাধিকার পায়। কিন্তু সৌজন্যের দিক থেকে মেয়েরাও বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী অতএব তাদের পরিবারেরও সেটা প্রাপ্য। ঠাকুর্দা-ঠাকুমার মত দাদু-দিদিমারাও মনে করেন নাতি-নাতনিরা তাঁদেরই। তাই প্রয়াস চলে সৌজন্যের ভারসাম্য রক্ষার। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের দিন তুমি যদি একটা পরিবারে যাও, বড়দিনের সময় অন্য পরিবারে যেতে হবে। একটা ছেলের নাম যদি ঠাকুর্দার নামানুসারে হয়, অপরটার নাম হবে দাদুর নাম লক্ষ্য করে। (আজকাল অবশ্য মা বাবার দল তাদের পছন্দসই শব্দকে ভিত্তি করেই ছেলেমেয়ের নামকরণ করেন।)

যুক্তরাষ্ট্র যখন প্রধানতঃ কৃষিরাষ্ট্র ছিল, তখন পরিবার ছিল এক একটি উৎপাদন কেন্দ্র। অন্ততঃপক্ষে একজন ছেলে দেশে বাড়ীতে যেত ক্ষেত-খামার দেখাশোনার জন্যে। এখনকার পরিবারগুলো নেহাৎই ভোগ করার কেন্দ্র। তাই সম্প্রসারিত পরিবারকে একই বাড়ীতে রাখবার যুক্তি আর চলেনা। অবিবাহিত বয়স্ক অথবা বিধবা কিংবা বিপত্নীকদের কথা স্বতন্ত্র এবং এই ব্যাপারে আমরা আর তেমন ভাল-কিছু করতে পারিনি।

পর্যবেক্ষকদের অনেকের ধারণা মার্কিন পরিবার একটি দুর্বল সংস্থা, কারণ এর স্বভাবই হল ছোট ছোট জৈবিক কেন্দ্রে বিভক্ত হওয়া। স্কুল, কোর্ট অথবা যুব সংস্থাগুলো পরিবারের অনেক কাজেই হাত দিয়েছে। কিন্তু এ ঠিক নয়।

কর্মভিত্তিক সমাজে কাজের চেয়েও পরিবার নিজেকে অনেকাংশে অধিক অবিচলিত আর দীর্ঘ দিনের বলে প্রমাণিত করেছে। কাজ অথবা ব্যবসার চেয়ে অনেক পরিবার অনেক বেশী দিন টেঁকে।

পরিবার থেকেই প্রদত্ত হয় প্রাথমিক শিক্ষা ; অসহায় শিশু লালন পালন, ধর্মশিক্ষা দেওয়া, আচরণ এবং সংস্কৃতি-সম্মত ব্যবহার ধরিয়ে দেওয়া, আনন্দের প্রথম স্বাদ এবং অপরের সঙ্গে সম্পর্কের কথা জানিয়ে দেবার দায়িত্বও পরিবারের। পরিবারের মধ্যে থেকেই শিশু সমাজে তার স্থান অর্জন করে, অবশ্য পরে বড় হয়ে সে, সে-স্থান অতিক্রম করতে, আবার হারাতেও পারে। ক্ষিপ্রতায়

বলেই শিশু মাতা পিতার কাছ থেকে একটা সম্মানের স্থান পেয়ে যায়, যে সম্মান নিয়েই সে স্কুলে যায়। সেখানে আরও শিক্ষা পায়। সমাজে পরিবারের স্থান নির্ধারিত হয় যে গোলমেলে আর ভাবাবেগ বর্জিত সূত্রানুযায়ী, তার মধ্যে আছে পিতার চাকরী ও আয়, পারিবারিক পটভূমিকা, আবাস স্থল নাগরিক কর্তব্যপালন, ধর্ম, সমাজে বাসস্থানের দৈর্ঘ, বংশ।

তারপর রয়েছে সংসারের উদ্দেশ্য—বাড়ী। (শতকরা ৫৬টি পরিবারের নিজস্ব বাড়ী আছে), পিতা-মাতারা তাতে গর্ব অনুভব করেন, যেমন তাঁদের গাড়ী, গৃহের যন্ত্রপাতি, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অস্থাবর সম্পত্তি যা পরিবারকে অতীতের সঙ্গে গ্রথিত করে রাখে। এর পর রয়েছে অদৃশ্য কাহিনী—মা-বাবা তাঁদের তারুণ্যের যে গল্প করেন অথবা পারিবারিক "চরিত্র" যেমন সেই পিসীমা যিনি ৯৫ বছর অবধি বেঁচেছিলেন এবং আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতেন, তাঁর বন্ধুদের এত তাড়াতাড়ি মৃত্যু হল কি করে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে সত্যকার জ্ঞান। এই জ্ঞান হল পরিবার একটি অটুট জৈবিক কেন্দ্র, এর সংযোগ কোন দিনই বিচ্ছিন্ন হবার নয়, তাই একজন কিছু করলে অপরের গায়েও তা লাগে গিয়ে।

মার্কিন পরিবারের এই সংহতির একটি জোরাল কারণ হল পরিবারের সকলকে সমান করে দেখা। বিদেশী পর্যবেক্ষকেরা প্রায়ই একে দুর্বলতা হিসেবে দেখেছেন। সন্দেহ নেই যে এমন অনেক পরিবার আছে, যেখানে পিতা সন্দেহাতীত বাধ্যতা দাবী করেন, যেখানে অর্থ কিভাবে ব্যয়িত হবে সে সম্পর্কে স্ত্রীদের বলবার সামান্যই অধিকার আছে, যেখানে সামান্য অপরাধে অথবা শুধুমাত্র মা ক্লান্ত এবং তিরিক্ষি মেজাজের বলেই ছেলেমেয়েদের উপর চড় কষিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু গড়ে, অন্যান্য কৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে আমেরিকান পরিবারে সকলকে সমান করে দেখার চেষ্টা চলেছে।

সাম্যের ভাব সুরু হয় বিবাহ থেকে। এখানে বিয়ে বলতে উভয় পক্ষই জীবনের অংশীদার বেছে নেওয়া বোঝে। সাধারণতঃ প্রথম সন্তান না হওয়া অবধি স্ত্রী কোথাও কাজ করে, কখনও ছেলেমেয়েরা নিজেদের দেখাশোনা করার মত বড় হলে আবার কাজে ঢুকে পড়ে। যাই হোক না কেন, তাকে বাড়ীতে দিনের পুরো কাজ করতে হয়, কারণ শুধুমাত্র ধনীদের পক্ষেই ভৃত্য রাখা সম্ভব। যান্ত্রিক সাহায্য এবং জিনিষপত্র ঠাণ্ডা করে রাখার ব্যবস্থা

সত্ত্বেও পাঁচ ছয় জনের সংসার চালানো এবং সেই সঙ্গে নাগরিক দায়িত্ব পালন —পুরো একটি দিনের কাজের মতোই।

আমেরিকার পুরুষ অবশ্য বলবে, অন্য ধরণের অর্থনৈতিক সাম্যও রয়েছে : সে আয় করে, আর স্ত্রী ব্যয় করে। মেয়েদের সাময়িক পত্রিকা, দিনের বেলার রেডিও ও টেলিভিশন কার্যাক্রম বিজ্ঞাপনকে ঘিরে এবং মার্কিন মহিলাদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তাদের পছন্দ- অপছন্দের উপর ভিত্তি করে রচিত।

নতুন গাড়ী অথবা মার্কিন শিল্পে জেল্লাদার কিছু কিনতে হলে স্ত্রী আবার কিছু দিনের জন্য কাজ করে। স্ত্রী এই রকম কাজ করতে পারে অথবা অতীতে করেছে—এই মনোভাবই বিয়ের ব্যাপারে সাম্যের ভাব বাড়িয়ে তোলে।

অবশ্য একথা সত্যি যে স্বামী এখনও সংসারের স্বীকৃত প্রধান। কিন্তু পুরুষের এই নেতৃত্ব শুধুমাত্র প্রতীকই, প্রকৃত নেতৃত্ব মেয়েদের হাতেই। সম্পত্তি, বাড়ী অথবা গাড়ী, প্রায়শঃই উভয়ের নামে লেখা থাকে। ব্যাঙ্কের হিসাবও থাকে দুজনেরই নামে। মেয়েরা সাধারণতঃ মাস কাবারের দেনাগুলি মিটিয়ে দেয় এবং দেয় আয়করের হিসেব রাখে।

আমেরিকার বিবাহ পদ্ধতি অনিবার্যভাবেই এই সাম্যের দিকে নিয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রীর সংসারে, একে অন্যের কাছে তার হৃদয়াবেগের পূর্ণতা চায়। ঈপ্সিত এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তারা প্রেমিক, মাতা-পিতা, খেলার, খাওয়ার, কাজের ও জীবনের সঙ্গী হিসেবেই উপভোগ করে। আমেরিকার বিয়ের একটা সমস্যা হল যে, অনেক কিছু চাই এর জন্যে। বিয়ের উদ্দেশ্য মানুষের তিনটি মূল চাহিদা— জৈবিক, সামাজিক ও মানসিক এই চাহিদা মেটাতে হবে বাইরের সাহায্য ছাড়াই।

ছেলেদের শিক্ষা

যে সাম্যের ভাব নিয়ে স্বামী-স্ত্রী নিজেদেরকে জীবনের সমান অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করে, জন্মগ্রহণের পর ছেলেমেয়েদের মধ্যেও তা সঞ্চারিত হয়। মা-বাবা তাদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের স্বাভাবিকভাবেই লালন-পালন করেন, কিন্তু মার্কিন ভাবধারা হল যথাসম্ভব অল্পবয়সে তাদের স্বাধীন আর আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলা। প্রসাধন-শিক্ষা সবার আগে (অবশ্য আগেকার মত নয়) দেওয়া হয় এবং শিশুদের মধ্যে যারা নিজেরাই নিজেরটা করতে পারে তারাই প্রশংসা-ভাজন হয়। মায়েরা আর দশটা ছেলেমেয়ের সঙ্গে তাঁদের সন্তানের তুলনা

করেন এবং হাঁটতে, চলতে, কথা কইতে এবং বড় হতে—সম্ভব হলে প্রতিবেশীর সন্তানদের চেয়ে তাড়াতাড়িতে উৎসাহিত করেন। গেসেল শিক্ষাপদ্ধতি অবশ্য শিক্ষিত মায়েদের ছেলেমেয়েদের দ্রুত এগিয়ে না দিতে প্রভাবিত করেছে।

শিশু লালন-পালনের অন্যান্য নিয়মগুলোতে তাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা এবং সাম্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বোতলে করে খাওয়ানোর সাধারণ স্বভাব শিশুকে পৃথক ব্যক্তিস্বত্বা দিতে সাহায্য করে। সেই রকম রয়েছে তার নিজস্ব কক্ষ, হাইচেয়ার আর খেলনা। বাড়ীতে রীতি অনুযায়ী প্রত্যেকেরই নিজস্ব সব জিনিষপত্র থাকবে। উষ্ণ কক্ষের ফলে শিশুর গাত্রাবরণ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে এবং ফলে গণ্ডী থেকে মুক্তি পেয়েছে, এ থেকে জানতে এবং স্বাধীনতা দাবী করতে শিখেছে সে। শিশুর মা-বাবাও হয়ত তরুণ এবং তার আগমণের কারণ হয়ত কোন জৈবিক দুর্ঘটনা নয়, সযত্ন পরিকল্পনাই হয়ত তাকে আসতে সাহায্য করেছে। পরিবারে শিশুর সংখ্যা, তাদের ভাল করে শিক্ষা, বস্ত্র, চিকিৎসা এবং আনন্দ উপভোগের সুযোগ দেবার জন্যে, প্রায়শঃই সীমিত।

মা-বাবা সব সন্তানকেই সমান চোখে দেখবেন, কারও প্রতি একচোখা হবেনা, এইটেই আশা করা হয়—অবশ্য ছেলেরা তা মনে নাও করতে পারে। সব সময়েই ছেলেমেয়েরা মা-বাবার সম্পত্তির সমান অংশীদার হয়।

ছেলেবেলা থেকেই তাদের নিজেদের জন্যে চিন্তা করতে এবং পরিবারের সিদ্ধান্তগুলো সমানভাবে মেনে চলতে উৎসাহিত করা হয়। তাদের বেছে নেবার সুযোগ দেওয়া হয় এবং তাদের যদি এমন কিছু করতে বলা হয় যা তারা পছন্দ করে না, সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে হুকুম তালিম করার বদলে তারা কৈফিয়ৎ দাবী করতে পারে। সোজা কথায় আদর্শ মার্কিন পরিবার একটি গণতান্ত্রিক গোষ্ঠী যার প্রতিটি সদস্যের অধিকার এবং দায়িত্ব আছে। বাবা সেখানে আইন প্রণেতা, মা প্রশাসক এবং ছেলেমেয়েরা সদস্য, ভোট দিতে পারে। বস্তুত মার্কিন কৃষ্টির একটি বৈশিষ্টই হল এই যে, পারিবারিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় ব্যাপার এমন ভাবে মিলেমিশে আছে যে তাদের আর পৃথক করবার অথবা পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করবার উপায় নেই। স্কুলে ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক নীতি সম্বন্ধে যা শিখতে হয় ছেলেমেয়ের দল দেখতে দেখতে বাড়ীতেই তার প্রয়োগ করে। স্কুলেও সেই রকম তাদের সমস্যা ও আগ্রহ সম্পর্কে মা বাবার শ্রদ্ধা থাকবে এটাই তারা আশা করে।

স্কুল এবং মা-বাবা তরুণদের মন যে একটি প্রধান ভাবধারায় প্রবাহিত করতে চান এবং ছেলেরাও যা শীঘ্রই পরস্পরকে শেখাতে সাহায্য করে, সে হল সুন্দর স্বভাব ও ব্যবহার। এত ছোটবেলায় এই ভাবধারাটি আমাদের ভিতরে প্রবেশ করে যে আমরা ধরেই নিই যে মধ্যাকর্ষন শক্তির সহিত এটি তুলনীয়।

ভাল ব্যবহার বলতে বোঝায় দুর্বলের প্রতি বিবেচনাবোধ, নিজের দলকে হেয় না করা, আইন মেনে চলা, অন্যায় সুযোগ না নেওয়া ('পড়ে গেলে মারতে নেই'), সর্বশক্তি নিয়োগ করে খেলা, খেলা হিসেবেই খেলা অর্থাৎ সহজে পরাজয় স্বীকার করতে হবে—জিততেও হবে সহজেই। ফুটবল খেলার শেষে পরাজিত দল প্রতিপক্ষের নামে জয়ধ্বনি ('চীয়াস') দেয়। এইভাব রাজনৈতিক প্রচার কার্যের মধ্যেও এসে যায়, সেখানে পরাজিত প্রার্থী নির্বাচিত ব্যক্তিকে অভিনন্দন জানান এবং তাঁর সমর্থকদের তাঁকে সমর্থন করতে আহ্বান জানান।

ছোট ছেলে যদি তার সঙ্গীর খেলনা টেনে নেবার জন্যে কাঁদতে থাকে, তার মা সম্ভবতঃ বলবেন, "না, ও রকম কোর না—ও-ই প্রথম পেয়েছে।" আগে পাওনা এবং মালিকানাকে স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু ছেলেটা যদি অনেকক্ষণ তার খেলনাটা ধরে আঁকড়ে থাকে, হয়ত তাকে বলা হবে: "তুমি তো অনেকক্ষণ নিয়েছ, এবার জনিকে ওটা নিয়ে খেলতে দাও।" কোন কিছুর মালিক অথবা দখলকারীকে অবশ্যই 'ভাগ করে খেতে' সম্মত থাকতে হবে। তাই আমাদের ছেলেমেয়েদের জীবনের সুরুতেই দখল আর ভাগাভাগি এবং প্রতিযোগীতা আর সহযোগীতার সূক্ষ্ম ব্যবধানটুকুকে বুঝতে হয়। এই কৃষ্টির আগাগোড়াতেই এমন ছাপ রয়েছে যা থেকে মনে হবে যে আমরা ধীরে ধীরে রুক্ষ প্রতিযোগীতার ভাব হ্রাস করে স্বেচ্ছায় অধিক হারে সহযোগীতাকে মেনে নিচ্ছি, উভয় আচরণের সুবিধের মধ্যে ভারসাম্য সাধনের প্রয়াস পাচ্ছি। অন্য কয়েকটি বিষয়ের (যেমন শ্রম সম্পর্ক) কথা পরে বলা হবে।

ভাল ব্যবহার বলতে আর যে একটা ঈপ্সিত আদর্শ রয়েছে, সে হল সকলে মিলে কাজ করা। নিজেদের সংগঠনের হয়ে মিলিতভাবে একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং উভয় পক্ষের স্বীকৃত নিয়মানুযায়ী কাজ করা কৃষ্টির একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি। খেলাধুলোর মধ্যে যে শিক্ষা সুরু হয় তা দলের মধ্যে পূর্ণতা পায় এবং বাণিজ্য, বিজ্ঞান, নগর এবং আমাদের জনশক্তির (যেখানে একক ব্যক্তির বদলে দলীয় দক্ষতা স্রষ্টার স্থান নিয়েছে) সাফল্যের মূলে রয়েছে এই শিক্ষা।

শিশুশিক্ষা নীতি ধর্মী। বাড়ী, ইস্কুল, চার্চ ও যুবসংগঠনগুলো মিলিতভাবে

এই নীতিকে কার্যকরী করে। ছেলেদের মধ্যে যারা স্কাউট হয়, তাদের মুখস্ত করতে হয় যে, "স্কাউট হবে বিশ্বাসী, অনুগত, সহায়ক, বন্ধুত্বপূর্ণ, সৌজন্যশীল, দয়ালু, বাধ্য, প্রফুল্ল, তৎপর, সাহসী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং শ্রদ্ধাশীল।" সকলে যে এতটুকু না থেমেও পঁয়ত্রিশ বছর বিরতির পরও কথাগুলো লিখতে পারে, তা থেকেই বোঝা যায় এর স্থায়ী প্রভাব কিছুটা থেকে যায়। বাইবেলের নীতি কথা এবং পুঁথি ও লিখিত সুসমাচার প্রাচীন আব হাওয়ায় পালিত শিশুর জীবনের সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে।

ন্যায়-অন্যায় বোধ শিশু মনেই গ্রথিত হয়ে যায়। এই বিধিনিষেধ যদি সে অমান্য করে, বুঝতে হবে, ধরা পড়লে শাস্তি পেতে হবে জেনে শুনেই সে অমন কাজ করেছে। কোপন স্বভাব কেউ তাকে হয়ত একাদশ উপদেশের (ইলেভেন্থ কম্যাণ্ডমেণ্ট) কথাটা শুনিয়ে দেবে: 'ধরা প'ড় না।' এই সব না-মানাদের কথা বাদ দিলে বলা চলে আনুগত্যের ভাবটা শিশুর মধ্যে এত প্রবল ভাবে গ্রথিত হয় যে তার পক্ষে আর নিষেধ অমান্য করা সম্ভব হয় না।

মার্কিন মাতা-পিতা শিশু শিক্ষণ ব্যাপারটির উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেন। ঠিক মত কাজটি সম্পাদনের আশায় তাঁরা পত্র-পত্রিকা আর বুলেটিনের মধ্যে ডুবে যান, বক্তৃতা শোনেন এবং অন্য মাতা পিতার সঙ্গে মতামত বিনিময় করেন। এই ব্যাপারে তাঁরা বিজ্ঞানসম্মত পথে এগোতে চান, কিন্তু বৈজ্ঞানিক মতে ঋতুতে ঋতুতে যথাযথভাবে শিশু পালনের নীতি পালটে ফেলার ব্যাপারটা সহজ হয় না। মোহমুক্ত জনৈকা মা বলেছিলেন: 'শিশু মনস্তত্ত্বের বইগুলো পড়া আমি বন্ধ করে দিয়েছি। যা কিছু নিজেকে নিজের সম্পর্কে অনিশ্চিত করে তোলে, সব সময়ে প্রশ্ন করে, তা ভাল নয়।" তবুও তরুণী মাকে প্রায়শঃই সব-কিছু নিজেকেই করতে হয়, অভিজ্ঞতা বলতে নিজের বড় হবার কথাটাই তাঁর মনে থাকে এবং প্রায়শঃই নিজের পিতা-মাতা থেকে অনেক দূরে থাকেন; তাই বাধ্য হয়েই তাঁকে বিশেষজ্ঞদের দ্বারস্থ হতে হয়।

মূল পরিবারে মায়ের ভূমিকাটি খুব বড়। পাঁচ-ছ' বছর না হওয়া অবধি বাচ্চারা নিজেরা প্রায় সব সময়ের জন্যেই তাঁর প্রভাবাধীন থাকে; নিজের প্রয়োজন ও আনন্দের জন্যে শিশু মায়ের উপরেই নির্ভর করে, তাঁর শাসনেই থাকে। ঠাকুরদা-ঠকুরমা অথবা দাদু-দিদিরা কাছে থাকলেও মা-বাবারা খুব বেশী হস্তক্ষেপ পছন্দ করেন না; মার্কিন সমাজ এমন গতিশীল আর পরিবর্তন-মুখী যে আজকের ঐতিহ্য কাল অচল—এমন কি ক্ষতিকর বলেও মনে হয়।

মার্কিন মাতা পিতা ছেলেমেয়েদের এমনভাবে স্বাধীন করে গড়ে তোলেন যে অনিবার্যভাবেই তারা পৃথক হয়ে যায়। কথাটার মধ্যে বিয়োগান্ত সুর আছে। এমন কি হতে পারে না যে ছেলেমেয়েদের ভাবী স্বাধীনতা সম্পর্কে অবহিত বলেই, একদিন যে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াবে তার উপর তাঁরা কিছুটা শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন ?

যাই হোক না কেন, মার্কিনজীবনের অনেক চাপ মা-বাবার সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের সম্পর্ক দুর্বল করে দেয়। স্কুলগুলি শিক্ষার আর আনন্দ-বিধানের অনেকাংশের দায়িত্ব নেয়। শিশুর দাঁত, চোখ, সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষায় দায়িত্বও স্কুলের, স্কুল থেকেই টিকা দেবার ব্যবস্থা হয়, এবং মা-বাবা না পারলে চশমা অথবা দাঁত ঠিক করার ব্যবস্থাও স্কুল থেকেই করা হয়। যাদের উপর বিশেষ যত্ন নেবার দরকার তাদের ক্লিনিকে পাঠান হয়, সেখানে বিকলাঙ্গ থেকে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা হয়। বয় স্কাউট, গার্ল স্কাউট এবং চার্চ গ্রুপ আনন্দ আর সামাজিক সুবিধেগুলো বাড়িয়ে দেয়। স্কুল ছুটির সময় যে ছেলে বাড়ীর কিছুটা দেখাশোনা করতে পারত গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পগুলো তাদেরও বাড়ীর বাইরে টেনে আনে। স্বল্প সময়ের জন্যে চাকরী করার সুযোগ বাড়ীর উপর অর্থ-নৈতিক নির্ভরতাকে আরও কমিয়ে দেয়, ফলে বাড়িয়ে তোলে নিজের উপর আস্থা।

অভাব থেকে প্রাচুর্যের দিকে ধাবিত আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন, বলতে কি, আমাদের দেশের পিতা-পুত্রের সম্পর্কের উপরেও ধাক্কা দিয়েছে। যখন কাজ পাওয়া কষ্টকর ছিল এবং শ্রমিক, মালিকের পদানত হয়ে থাকত, বাড়িতে বাবাও ছেলের উপর অফিসের উপরওয়ালার মতোই কর্তৃত্ব ফলাতেন। ছেলেকে পদানত হতে শেখাতেন, তাকে জীবন যুদ্ধের উপযোগী করে তুলবার জন্যে। কিন্তু প্রাচুর্যের অর্থনীতিতে কাজের অপ্রাচুর্য নেই। তাই মাথা নীচু করে থাকার আর দরকার নেই। আগেকার সে শিক্ষার প্রয়োজনও ফুরিয়েছে।

বিদেশী পর্যবেক্ষকেরা ঠিকই মনে করতে পারেন আমরা অনেক দূর এগিয়েছি; আমাদের কৃষ্টি শিশু-কেন্দ্রিক, মনোভাবও শিশুদের মতোই; আমাদের ছেলে-মেয়ে যখন চুপ করে থাকা উচিত তখন কথা বলতে শিখিয়ে, যখন আদেশ পালন করবার কথা তখন তর্ক করতে শিখিয়ে, বড়দের পূজনীয় বিবেচনা করে যখন শ্রদ্ধা করবার কথা, তখন উদ্ধতভাবে কথা বলতে দিয়ে তাদের "মাথা খেয়ে" দিই। বিশেষ করে যে অগণতান্ত্রিক সমাজে যা'ও চাতুরিনীতি তেমন

সহরাঞ্চলে পিতার কর্তৃত্ব না থাকলে বয়স্ক ছেলের অবলম্বন হিসেবে নেবার মত কোন শক্ত আইন থাকে না এবং, প্রায়শঃই, তাকে অপরাধমুখী করে তোলে।

এমন কি, যদি অপরাধ বলে স্বীকার করেও নিই, উত্তরে শুধু বলতে পারি যে কৃষ্টি কতকটা বোনা কাপড়ের মতো ; আমরা যে ছেলেমেয়েদের স্বাধীন হতে শেখাই তার কারণ আমরা স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি এবং প্রতিযোগীতামূলক সমাজে এর দরকার আছে। কিন্তু এর অন্য কোন কারণ যদি থাকে আর সে কারণ যদি আমাদের জীবন-পদ্ধতির মূলে থাকে, সে হ'ল তরুণের প্রতি আমাদের ভালবাসা। সব-কিছু এ কথা বলবে এবং এই কথার উপর জোর দেবে। উপন্যাসতো তরুণদের ভালাবাসা নিয়েই। মেয়েরা কখনই তাদের সত্যিকার বয়স বলবে না। ঠাকুরমারা চেষ্টা করবেন দেহটিকে পরিপাটি রাখতে, যুবতীর মত পোষাক পরতে এবং সামাজিক অথবা নাগরিক কাজকর্মে নিজেদের ব্যস্ত রাখতে। চল্লিশ বছরের পর কলকারখানা নিয়োগ করতে চাইবেনা, তাই পুরুষেরাও সব সময় যাতে ফিটফাট আর তরুণ দেখায়, তার জন্যে চেষ্টা করে।

তারুণ্যের এত কদর কেন ? সূক্ষ্ম হলেও কারণ অনেক। সন্দেহ নেই যে আমেরিকান উপনিবেশ কর্মঠ যুবকদেরই চেয়েছিল। নবাগত 'পিতার দল' কুড়ির আর তিরিশের কোঠায় ছিলেন। ক্যাপ্টেন জন স্মিথ যখন আমেরিকায় পৌছন, তখন তাঁর বয়েস সাতাশ। প্রতিষ্ঠাতা "পিতাদের" মধ্যে যারা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে নাম স্বাক্ষর করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে জেফারসনের বয়েস ছিল তেত্রিশ, হ্যানকক-এর উনত্রিশ, টমাস লিনচ জুনিয়ার-এর মাত্র সাতাশ, দেশটা গড়ে উঠেছিল যুবকদের পেশী দিয়ে। এর কঠোর শিল্পপ্রগতি শক্ত আর দ্রুত গতি মানুষদেরই চায়।

আমরা ভবিষ্যতের দিকে, সুদিন আর সুসময়ের দিকে চলেছি, যা শুধু তরুণেরাই পারে। তাই প্রগতি, পূর্ণতা, অগ্রগতি, সজীব প্রতিযোগীতা, কর্মঠ তরুণ অ্যাথলেট, স্নান করার পোষাক-পরা সুঠাম মেয়ে এবং টনিক, ব্রেসিয়ের, ক্যাথারটিক্স এবং এমন সব পোষাক-আষাক যা পরলে কোনদিনই বুড়ো হতে হবে না বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়—এই সবেরই উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং তারুণ্য আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছে। উন্মাদনা, বাস্ত, পুনরুক্তি এবং সর্বোপরি কাল্পনিক শক্তির জন্যে জাতীয় বাস্ত কাজের মধ্যে বিশেষ করে তরুণদের তাবা খুঁজে পাওয়া যাবে। এমন কি, ধর্মের ক্ষেত্রেও বয়ঃপ্রধান ঈশ্বর নয়, সংসারে আবদ্ধ শক্তসমর্থ তরুণ অথবা শিশু আমাদের শ্রদ্ধা

আকর্ষণ করে। শিশু যীশুর আশাব্যঞ্জক চিত্রের দিকেই আমাদের আকর্ষণ, ক্রুশবিদ্ধ বিয়োগান্তক ছবিতে নয়

মেয়েদের ভূমিকা

স্বামীর সন্ধান না পাওয়া অবধি মেয়েরা আজকাল নিজেরাই নিজেদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করতে পারে, অথবা স্বামীকে পরিত্যাগ করে প্রয়োজন হলে নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারে। এই সম্ভাবনার হুমকীতে নিহিত রয়েছে শ্রদ্ধার ভাব। মেয়েদের মধ্যে যারা কাজ করে, তাদের অর্ধেকই আজকাল বিবাহিত। সেই পারিবারিক খামারের আমলের ন্যায় স্ত্রী আজকাল অর্থ-নৈতিক সম্পদ। স্বামীরা তাই সংসারের কাজে অধিক সাহায্য করে এবং স্ত্রী-পুরুষের ব্যবধান ক্রমশঃ ঘুচে যাচ্ছে। কর্তৃত্ব বিভক্ত হয়ে পড়েছে; যার ব্যক্তিত্ব অধিক, তা সে ছেলেই হোক, কি মেয়েই হোক, নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিতে পারে অথবা দুভাগে তা বিভক্ত হতে পারে।

ছেলের তুলনায় অনেক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মেয়েদের সুবিধে বেশী। তাদের ২৪ লক্ষ ভোট বেশী আছে। মেয়েরা বাঁচেও বেশী দিন। ১৯৫২ সালে যে মেয়ের জন্ম তার সম্ভাব্য আয়ু ৭৩ বছর, কিন্তু ছেলের ৬৭। ছেলেদের আলসার, হৃদরোগ প্রভৃতি অনেক রোগ দেখা দিতে পারে। আগে মেয়েদের ক্ষেত্রে আইন একচোখা ছিল কিন্তু আজকাল সম্পত্তির ব্যাপারে তাদের সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। ছেলেদের নেই এমন কিছু সুবিধেও মেয়েরা পেয়েছে। সরকারী পদস্থ পদেও অধিষ্ঠিত হতে পারে মেয়েরা। ইদানীংকালে তারা রাষ্ট্রদূত অথবা ক্যাবিনেটের মর্যাদাসম্পন্ন পদেও অধিষ্ঠিত হয়েছে। বি-নিয়োজিত অর্থের ক্ষেত্রেও তাদের সামান্য সংখ্যাধিক্য (৫১.৬%) আছে।

এখনও ওরা ছেলেদের কাছ থেকে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা পায়। দ্বার অতিক্রমনের প্রথম অধিকার মেয়েদের, আহারের-টেবিলে ওরাই আগে বসবে, আগে খাবার পাবে। সংসারের সামাজিক কর্তব্য মেয়েরাই করে, কাকে আপ্যায়িত করতে হবে, (অবশ্য স্বামীর অনুমোদন ক্রমে) কোথায় বসবাস করতে হবে। উপঢৌকন দেবার দরকার আছে কিনা, এ সব মেয়েরাই স্থির করে থাকেন।

ছেলেরা যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়, মেয়েরাও ঠিক সেখানেই যেতে পারে। একই ধরণের চাকরীও নেয় তারা। একদা যে বারগুলোতে শুধুমাত্র পুরুষের অধিকার ছিল, মেয়েরা আজকাল সেখানেও যেতে পারে; কঠোর পরিশ্রমের

খেলাধুলায় অংশ নিতে পারে, নিজেদের স্বামী নিজেরা বেছে নিতে পারে, কটা বাচ্চা হবে তাও স্থির করতে পারে। এখন তারা, এমন কি, ট্রাউজার্স অথবা সর্ট বা হলটারের মত সংক্ষিপ্ত পোষাক পরিধান করতে পারে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং কমিটির মাধ্যমে তারা নাগরিক ক্রিয়াকর্মের অনেকাংশেরই পরিচালনা করে। শতকরা পঁয়ষট্টিজন মেয়ে অন্ততঃপক্ষে একটি সেবা সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এ ছাড়া ক্লাব, বক্তৃতা, কনসার্ট এবং ব্যক্তিগত অধ্যয়নের জন্যে সাংস্কৃতিক জীবনে তাদের প্রভাব সমধিক।

সাগরপারের পর্য্যবেক্ষকেরা ভাবেন গোটা সমাজটার ওপরেই মেয়েদের প্রভুত্ব রয়েছে। মেয়েরা হয়ত জবাবে বলবে শিল্প, সরকার অথবা শিক্ষাজগতের সর্বোচ্চ পদগুলি এখনও তারা দখল করতে পারে নি; ছেলেরা ভাল বেতনের সব চাকরিগুলোই পায় আর মেয়েরা একই ধরণের কাজ করলেও কম বেতন পায়; বাইরে কাজ করলেও মেয়েদের বাড়ীর কাজকর্ম দেখাশোনার কথা; ছেলেদের কি করে সন্তান হতে পারে, সে পথ এখনও কেউ আবিষ্কার করতে পারেন নি।

স্ত্রীকে একাধারে পাঁচিকা, মা, নার্স, ঝি, সামাজিক ব্যাপারে সেক্রেটারী, বাজার সরকার, ড্রাইভার (বাচ্চাদের সব সময়েই স্কুল থেকে গানের স্কুলে আবার সেখান থেকে স্কাউট মিটিং-এ ঘুরিয়ে আনতে হয়, মালী, সমাজ সেবী, ক্লাব সদস্যা, ভাল প্রতিবেশী, স্বামীর সঙ্গী, পরামর্শদাত্রী এবং শয্যাসঙ্গী হতে হয়।

মেয়েদের জীবনপদ্ধতি দ্রুত পালটে যাচ্ছে। অনেক মেয়েই নতুন নতুন স্বাধীনতার অন্বেষণ আর নতুন দায়িত্বের কথা ভাবতে গিয়ে দেখে তারা স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। অনেকে অস্থির হয়ে ওঠে এবং চপলতার মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলতে চায়। কিন্তু অনেকে অতীতের যা দিয়ে মেয়েরা বনানীতে বসতি স্থাপন করেছিল এবং এমন কি, ছেলেদের পাশে থেকে মাটিতে কোদাল চালিয়েছিল এবং লড়াই করেছিল, পথ প্রদর্শকদের সেই শক্তি দিয়ে তারা নিজেদের নতুন ভূমিকার উপযোগী করে তুলেছে।

পুরুষেরা এখনও প্রধানতঃ চাকরে আর মেয়েরা গৃহস্থ বধূ। কিন্তু এই দুই ভূমিকা ক্রমশঃই একাকার হয়ে যাচ্ছে এবং এইভাবে, সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কিন জীবনে যদি জৈব উন্নয়নের কোন নীতি থাকে সে হল সাম্যের দিকে যাত্রা। এ সাম্য স্ত্রী-পুরুষ, বংশ-শ্রেণী, শ্রমিক-মালিক, ছাত্র-শিক্ষক, খরিদ্দার-বেয়ারা সর্ব ক্ষেত্রেই। অনেক সময় দেখা যায় বিদেশীরা কোন বেয়ারার গায়েপড়া ভাবকে ধৃষ্টতা এবং ট্যাক্সি চালকের বকবকানিকে অনধিকার চর্চ্চা বলে মনে করেন।

কিন্তু আমাদের কাছে এসব সেই একটা কথারই সঙ্কেত, গ্রাম্য ভাষায় যাকে বলা হয় : 'আমিও তোমার মতো ভাল, হয়ত বা কিছু আরও ভাল।'

প্রাচীন পন্থীরা যুক্তি দেখাবেন বিবাহ ব্যাপারে এই সমভাবের জন্যই ডাই-ভোর্সের সংখ্যা এত অধিক—যত বিয়ে হয় তার শতকরা কুড়ি ভাগই বাতিল হয় ডাইভোর্সের জন্যে। অন্যেরা দায়িত্ববোধহীনতাকে দায়ী করেন—এতে অবশ্য কিছুই বলা হয় না। কেউ বা ধর্মানুরাগ না থাকাকেই কারণ হিসেবে ধরেন যদিচ সব সময়েই বহু ব্যক্তি চার্চে উপস্থিত থাকেন।

মধ্য 'আয়-জীবি এবং বিভিন্ন পেশায় কার্য্যরতদের তুলনায় স্বল্প আয়ের চাকুরীজীবিদের মধ্যেই অধিক মাত্রায় ডাইভোর্স দেখা যায়। আবার ছোট ছোট সম্প্রদায়ের তুলনায়, বড় বড় সহরে, দক্ষিণ ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের তুলনায় পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমের দিকে এবং শিক্ষিতদের তুলনায় অশিক্ষিতদের মধ্যে ডাইভোর্সের সংখ্যাধিক্য ধরা পড়ে।

যাই হোক না এটা সত্য যে বিয়ে অসন্তোষজনক হলে ছেলে, অথবা মেয়ে কেউই তাকে বরদাস্ত করতে রাজী নয়। ডাইভোর্সকে সমাজ যে চোখেই দেখুক না কেন, তারা আর দুঃখের জীবন যাপন করতে চায় না। ডাইভোর্সের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সমাজের খোঁটা দেওয়াটা অনেকটা বন্ধ হয়েছে, বিবাহ বিচ্ছেদ সহজ হয়ে উঠেছে। তবুও মনস্তত্ত্বের এত সহায়তা, বিবাহ সার্থক করার এত নিশ্চিত পরিকল্পনা সত্বেও বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে না কেন?

বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ উভয়কেই দুরূহ করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে আইনে। কনট্রাক্ট সম্পর্কিত সাধারণ নিয়ম পাল্‌টে আইনে বলা হয়েছে যে, উভয় পক্ষ যদি এমন অসৎ-আচরণের জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হন (যেমন অন্যের সঙ্গে যৌন সম্ভোগ যাতে শুধু একজন অপরাধী হলেই ডাইভোর্স হতে পারে) ডিভোর্স দেওয়া হবে না। বত্রিশটি রাজ্যের নিয়ম এই যে, শুধুমাত্র সাক্ষ্য প্রমাণ অথবা উভয় পক্ষের স্বীকারোক্তির জন্যে ডাইভোর্স দেওয়া যেতে পারে না। নেভাদা এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম—এবং সেজন্যেই রেনোতে এত লোক যায়।

এখন বিয়ের তৃতীয় বছরেই ডাইভোর্স হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী এবং এদের তিনভাগের দু'ভাগই হল সন্তানহীনের দল। এভাবে বিয়ে ভাঙলেও পরিবার ভাঙে না। যারা ডাইভোর্স করে তাদের মধ্যে শতকরা সত্তর জন পুনরায় বিবাহ করে এবং সে ক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনাই থাকে অধিক। যে হরেক রকমের সহায় সম্পদ সংগৃহীত হয়, তাতে এই রকম ফলাফলে বিস্মিত

হবার কিছুই নেই। যে ডাইভোর্সের সঙ্গে ছেলেমেয়েরা জড়িত হয়ে পড়ে, সে-গুলোই অধিকতর গুরুতর।

অপরাধ প্রবণতা—শিশুর বা বয়স্কের

'ভাঙা বাড়ীর' ছেলেমেয়েদের সামাজিক মান রক্ষা করা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। তারা হয়ত বিদ্রোহই করে সমাজের বিরুদ্ধে। যাদের নিরাপত্তা ব্যাহত হয় না এদের তুলনায়, তাদের থেকে বিপদের সম্ভাবনা কম। আরও দুরূহ হল তাদের জীবন যাদের জাতি বৈষম্যের জন্যে বস্তিতে মানুষ হতে হয়েছে। স্কুল এবং সমাজের অন্য ছেলেমেয়েরা যে অন্য ধরণের ব্যবহার পায়, স্পষ্টভাবেই এরা তা বুঝতে পারে। যে সংগঠনগুলো তাদের অন্য চোখে দেখেছে, তাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হওয়া, সেখান থেকে সরে আসা এবং আক্রমণ করাই হয় এদের মনোগত বাসনা। ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে দেশভক্তির সঙ্গে প্রশংসিত হতে দেখেছে, এখন বিদ্রোহের পথে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায়, মনে শান্তি পেতে চায়। অপরাধ প্রবণতার সবচেয়ে বড় এলাকা হল যেখানে, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা আর বৈষম্যের দরুণ তাড়িত কোন জাতি, সমাজের খোলা একমাত্র রাস্তা দিয়ে সামাজিক অবিচারের প্রতিকার চায়।

তরুণদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতার প্রাবল্য মার্কিন সমাজের একটা বড় ব্যর্থতা। এখন যে সব বলা হল এর কারণগুলো তার থেকে অনেক বেশী জটিল। যুদ্ধ এবং যুদ্ধের পরবর্ত্তী ফলাফল, বিশ্রী ঘরবাড়ী, চাকরে মা, মূল কিছু না রেখে ক্রমাগত এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানো, দারিদ্র্য-পীড়িত অথবা কলহপূর্ণ বাড়ীর ক্ষতিপূরণের জন্যে "মজাদার" কিছু পাবার আগ্রহ, দল বা উপদলের কাছে তারিফ পাবার আগ্রহ এবং জীবনধারণের মানের দ্রুত পরিবর্ত্তন যাতে তরুণদের মনে বিভ্রান্তি এনে দেয়—এই হল কতকগুলো কারণ। অপরাধ-প্রবণতাকে ব্যক্তিগত বিপথগামীতা এবং শাস্তি দিয়েই একে সায়েস্তা করা যায় ভাবলে ভুল হবে। অপরাধপ্রবণতার কারণগুলো সমাজের মধ্যেই রয়ে গেছে। বৈষম্য, পৃথকীকরণ, দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতাকে যতটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে, অপরাধপ্রবণতা ততটা হ্রাস পাবে। নাগরিকদের মধ্যে যাঁরা বস্তি পরিস্কার অথবা গৃহ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন এবং চিত্তবিনোদনের এলাকা সৃষ্টির বিরুদ্ধে ভোট দেন অথবা ব্যক্তিগত জীবনে যারা বৈষম্য সৃষ্টিকে প্রশ্রয় দেন, তাঁরাই সত্যিকার অপরাধী। এঁরা অপরাধপ্রবণতার প্রাবল্যকে তাদের

বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবহারের পক্ষে যুক্তি হিসেবে দাঁড় করান। এই বৈষম্য এবং অসাম্য দূর করাই যে প্রতিকারের পথ তা স্বীকার করতে চান না।

সমস্যাটি অত্যন্ত গুরুতর হলেও আমেরিকানরা আস্থার সঙ্গে নবাগতের দল-গুলোকে মিলিয়ে মিশিয়ে নেবার দীর্ঘ ইতিহাস থেকে বলতে পারে যে, বর্তমানের সমস্যাগুলোও সমাধান করা সম্ভব হবে। জীবনধারণের মানের সাধারণ উন্নয়নের মত সামাজিক বিজ্ঞান কর্তৃক অপরাধপ্রবণতাকে সম্যক উপলব্ধি করা এবং পেশাদার শিক্ষিত কর্মীদের দ্বারা বৈজ্ঞানিক নীতিগুলোকে প্রয়োগ করাও উন্নতির পরিচায়ক। তরুণ অপরাধীদের অপরাধী হিসেবে না দেখে সহানুভূতির চোখে দেখবার জন্যে শিশু আদালত আন্দোলন এবং প্রয়োজনীয় মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শদান এই দিকে আর একটি পদক্ষেপ।

অপরাধপ্রবণতাকে রুখবার জন্যে সর্বাত্মক কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। পেনসিলভানিয়াতে এই সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনৈক বিচারক তাঁর রোটারি ক্লাবকে দিয়ে এমন একটি পরীক্ষামূলক সংস্থা গঠন করতে সক্ষম হন যা লাভের দিকে দৃষ্টি দেবে না। এজন্যে অর্থ সংগ্রহ করতে এবং একজন প্রবেশন অফি-সারকে সাময়িকভাবে নিয়োগ করাতেও তিনি সক্ষম হন। এরপর তিনি স্বেচ্ছায় সাহায্য করতে যাঁরা প্রস্তুত তাঁদের একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। প্রবেশন অফিসার এদের সাহায্যের জন্যে ডাকতে পারবেন। এই কার্যক্রমের একটি উদ্দেশ্য হল জনসাধারণকে বুঝতে সাহায্য করা যে অপরাধপ্রবণতার সমস্যা গোটা সমাজের সমস্যা এবং এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র বিজ্ঞোচিত পথ হল প্রতিকার, শাস্তি দান নয়। মার্কিন জীবনধারার স্বকীয়তাই প্রমাণিত হয়েছে বিচারক সরকারের পরিবর্তে একটি বে-সরকারী সেবামূলক সংগঠনের সাহায্য প্রার্থনা করায়। সরকারী শাখা প্রশাখা বৃত্তিগত সাহায্য দিতে পারে, একটা সমাজ অথবা একটা সংগঠনকে তারা সজাগ করে তুলতে পারে না। সমাজ অথবা সংগঠন এমন সমস্যায় হাত দিলে প্রথমে নিজেদের, তারপর অপর সকলকে এই সমস্যার সঙ্গে সাধারণের কল্যাণ জড়িয়ে ফেলে।

প্রবেশন অফিসার যাদের ব্যাপারগুলো খতিয়ে দেখেন, তার মধ্যে ফ্রাঙ্কও ছিল। বালক ফ্রাঙ্ক বাড়ী আর স্কুল থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, কয়েকটা ছোট-খাট চুরির প্রমাণও ছিল তার বিরুদ্ধে। অফিসার দেখতে পেলেন যে ফ্রাঙ্কের অঙ্ক শাস্ত্রে বুৎপত্তি আছে। স্কুল ছুটির পর করতে পারে এমন একটা কাজের ব্যবস্থা করলেন তিনি ফ্রাঙ্কের জন্যে। এমন চাকরি যেখানে ফ্রাঙ্ক তার অঙ্ক

শাস্ত্রের বুৎপত্তিকে কাজে লাগাতে পারে। দেখা গেল ফ্রাঙ্ক পুরানো গাড়ীতে কাজ করতে লাগল। জনৈক দাতা স্বেচ্ছায় তার ১৯৪০ সালের মডেলের গাড়ীটি দান করতেই উন্নতির পথে আর একটি পদক্ষেপ পড়ল। সামাজিক অনুশাসন অমান্য করবার নেতিবাচক মনোভাবের পরিবর্তে ফ্রাঙ্কের মনে এখন সত্যিকার আগ্রহ সৃষ্টি হল। যে শক্তি আর বিরক্তি তাকে গুরুতর অপরাধের পথে ঠেলে দিত, তা এখন সত্যিকার পথে পরিচালিত হল।

অল্পবয়স্কদের, আর সবার চাইতে, এইটুকু নিরাপদ উপলব্ধি থাকা দরকার যে তাদের প্রয়োজন স্বীকৃত হয়েছে এবং বড়দের দুনিয়ায় তারা কাজের মত কাজ করতে পারে। অনেক সফল কার্যক্রমে ছোটরা নিজেরাই প্রথম হাত দিয়েছে। সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় এই প্রসংশনীয় কাজ গোটা দেশেই সুরু হয়েছে। নিউ জার্সির প্যাসক্যাকে একটি দল বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় একটি হাসপাতালের জন্যে অর্থ সংগ্রহের আয়োজন করেন এবং একটি আদর্শ গৃহ নির্মাণের জন্য ডিরেক্টার নৃত্য প্রদর্শণের ব্যবস্থা থেকে টিকিট বিক্রয় পর্যন্ত সব কিছুই করেন। একটু নেতৃত্ব পেলেই নতুন যুবকদের শক্তি প্রয়োজনীয় খাতে প্রবাহিত করা সম্ভব। এই ভাবেই তরুণের দল কি করে প্রাপ্ত বয়স্কের ভূমিকা নেওয়া যায় তাও জানতে পারে।

বয়ঃবৃদ্ধ নাগরিক

তরুণদের এই সমস্যার অপরদিকে রয়েছে বয়ঃবৃদ্ধ নাগরিকদের সমস্যা। উভয় ক্ষেত্রেই সমস্যার মূলে রয়েছে অবহেলা। দ্রুত, গতিশীল, পরিশ্রমরত শিল্প-সমাজ এখনও তরুণ ও বৃদ্ধদের শক্তি আর সামর্থ্যকে কাজে লাগানোর উপযুক্ত পথ বার করতে পারে নি। তরুণরা যেমন তাদের শক্তিকে কাজে লাগানোর মত দায়িত্বপূর্ণ কাজ পায় না, বৃদ্ধেরাও সেই রকম কাজ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পঁয়ষট্টি, এমন কি ষাট বছর বয়সেও, পুরুষদের অবসর গ্রহণ করবার কথা।

সম্প্রতি বৃদ্ধদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার ফলে চিকিৎসাশাস্ত্রে ও সামাজিক কার্য-সূচীতে দুটি নতুন অধ্যায়—গেরিয়াট্রিকস এবং 'সিনিয়র সিটিজেনস' সংযোজিত হয়েছে। বে-সরকারী সংগঠনসমূহ এদের জন্যে ক্লাব-রুমের ব্যবস্থা করেছে এবং যে ধরণের কার্যসূচী এদের মনঃপূত সেই রকম পরিকল্পনা করতে সংগঠন-গুলোকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে খেয়ালখুশী, খেলা, নৃত্য, কারুশিল্প, অধ্যয়ন অথবা শুধু বসবার আর গল্প করবার সুযোগ।

বাবার উপর এই কার্যসূচীর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে জনৈকা মহিলা বলেছিলেন "তাঁর মধ্যে অনেক নতুন আগ্রহ দেখা দিয়েছে, একেবারে যেন নতুন মানুষ।" জনৈক বৃদ্ধ বলেছিলেন, "মনে হয় মজার ব্যাপার। পৃথিবীর মধ্যে এই যেন স্বর্গ।"

অবসর প্রাপ্তদের জন্যে সামাজিক নিরাপত্তা আর ব্যবস্থার ফলে, বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়েছে যাঁরা এককালে বুড়ো হতে হবে বলে ভয় পেতেন, তাঁদের মনে। অর্থের পরিমাণ সামান্য হলেও বুড়ো-বুড়ীর সাধারণভাবে তাতে চলে যাবার কথা যদি তাঁদের নিজেদের বাড়ী থাকে অথবা বিধবা কিংবা বিপত্নীক ছেলে অথবা মেয়ের সঙ্গে থাকতে পারেন। অন্যেরা, শুশ্রূষার দরকার হলে, বে-সরকারী নার্সিং হোমে যেতে পারেন। সাম্প্রতিক হলেও এই ধরণের নার্সিং হোম আজকাল সাধারণ ব্যাপারের পর্যায়েই পড়ে। এখানে সপ্তাহে চল্লিশ ডলার অথবা আরও অধিক দিয়ে অসুস্থের দল পেশাদারদের থেকে যত্নআত্তি পেতে পারেন। সবচেয়ে করুণ সম্ভবতঃ তাদের অবস্থা যারা বড় বড় সহরে ভাড়াটে বাড়ীতে থাকে, একাকী জীবন অতিবাহিত করে, রেঁস্তোরায় সামান্য আহার করে, পার্কের পায়রাগুলোকে রুটির টুকরো খাওয়ায় আর নিজেদের দুর্ভাগ্যের অভিযোগ জানায়। আস্তে আস্তে অবশ্য যারা সঙ্গী চায়, তাদের জন্যেও ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

অবসর প্রাপ্ত ব্যবসায়ী ও পেশাদার মানুষেরা ইচ্ছে করলে তাঁদের ক্ষমতা সমাজসেবায় নিয়োজিত করে পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করতে পারেন। প্রতি সহরেই স্বাস্থ্য, মন অথবা নাগরিকদের স্বভাব উন্নত করার জন্যে স্বেচ্ছাসেবকদের অনেক গোষ্ঠী আছে। এই সংগঠনগুলোর সেচ্ছাসেবক দরকার। বয়ঃবৃদ্ধ নাগরিকের দল স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করলে সমাজ জীবন অনেক উন্নত হয়।

সমাজ বিজ্ঞানীরা এই বিষয়টার উপর জোর দেন যে আগের তুলনায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের আর সে সম্মান নেই। কতকাংশে কথাটা সত্যি। তবুও ছেলেদের পরামর্শদাতা এবং নাতি-নাতনিদের খেলার সঙ্গী হিসেবে বাড়ীতে ঠাকুরদাদাদের এখনও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়ে গেছে। ঠাকুর্দা-ঠাকুমা অথবা দাদা-দিদিমাদের আগমণ অথবা তাঁদের কাছে যাওয়া মার্কিন ছেলেমেয়েদের মনোগত ইচ্ছা। ঠাকুমা-দিদিমাদের সূঁচ আর উনুন দক্ষতা, তাঁদের অতীত অভিজ্ঞতা, এখনও সমাদৃত হয়। বৃদ্ধদের কচি-কাচাদের জন্যে সময়ও আছে; উদ্যাগতি সম্পন্ন জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে বোঝেন—এই উপলব্ধি থেকেই বৃদ্ধেরা তরুণদের

কাছে এসে যায়। বয়স ছোটদের কাছে একটা রহস্য-ইতিহাস এবং অদৃষ্ট অতীত যেন বয়সের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিত্বে রূপায়িত হয়। পরিবারের নিরাপত্তা, স্থায়িত্ব এবং অগ্রগতির এই নিশ্চয়তার উপর শিশু খুব বেশী নির্ভরশীল। ঠাকুর্দা-ঠাকুমা সত্তর-আশী বছর অবধি বেঁচে থাকেন—সমগ্র পরিবারের পক্ষে এ মর্যাদা, শক্তি আর সম্মানের পরিচায়ক। এই অবস্থা এখনও চলেছে।

অন্যান্য সংগঠনের হাতে তার অনেক কাজ তুলে দিলেও পরিবার এখনও সদস্যদের হৃদয়াবেগের ও গভীর আনুগত্যের কেন্দ্র স্থল,—এবং সেইহেতু গভীরতম ভাবের উৎস এবং গণতন্ত্রের প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র বলতে এই পরিবারই। অজ্ঞতা ও নৈরাশ্যের জন্য পরিবারের মধ্যে অনেক হানিকর ভাবধারা প্রথিত করেন যে পিতা-মাতারা, তাদের জ্ঞানও সীমিত। ত্রুটিপূর্ণ যদি হয়ও, এর থেকেই খুলে যায় সেই দেওয়া-নেওয়া যা প্রতিটি মানুষে শেখা দরকার। আর পরিবারের ভূমিকা যথাযথভাবে পালিত হলে, নাগরিকদের পারিবারিক ক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত প্রেম সকল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বার উপযোগী হয়ে ওঠে।

মার্কিন চরিত্র

ইংরেজ, তুর্কী অথবা চীনা চরিত্রের মতো মার্কিন চরিত্রের একমাত্র ছাঁচ বলে কিছু নেই। নানান ধরণের জাতি আর সাংস্কৃতিক মূল, দুনিয়ার সকল দিকের সকল জনস্রোত এবং এখানকার আঞ্চলিক বৈচিত্রের জন্যে মার্কিন ব্যক্তিত্ব আরও জটিল। কয়েক শত ধনবৈচিত্র এবং ধর্মবিশ্বাসীদের উপর তার রকমারী প্রভাবের ফলও এই জটিলতার কারণ। বংশ বৈচিত্র আর একটা কারণ—প্রথম নবাগতের দল, তারপর নবাগতদের সন্তান-সন্ততি, তারপর তাদের বংশধরেরা।

সকল আমেরিকানকে একসঙ্গে হাজির করবার ইচ্ছেটা তীব্র হওয়াই স্বাভাবিক। তবুও যারা আরও একটু ভিতরের দিকে তাকান, তাঁরা মার্কিন জীবনের বৈপরীত্য দেখে বিস্মিত হয়ে যান। একথা সত্যি যে আমেরিকানরা, সামগ্রিক ভাবে বিচার করতে গেলে, কঠোর পরিশ্রম করে। আবার খেলেও। ঘুরে বেড়ানো, ক্যাম্প করা, শিকার করা, খেলা দেখা, ধূমপান, সিনেমা দেখা ও টেলিভিসন দেখা, খবরের কাগজ আর সাময়িক পত্রিকা পড়ে তারা পৃথিবীর যে কোন জাতির তুলনায় অধিক সময় কাটায়। আবার চার্চ, সমাজ সেবা, হাসপাতাল ও দানধ্যানেও তারা অনেক অর্থ ব্যয় করে। সব সময়ই তাড়াহুড়ো করে চলে, আবার অবসর বিনোদনেও অনেক সময় ব্যয় করে। একই ধারে এরা যেমন ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন তেমনি স্বাভাবিকভাবে কনফরমিষ্ট। বড় জিনিষের উপাসনা করলেও ছোট মানুষকে আদর্শ হিসেবে নিতে দ্বিধা করে না তা সে বড় ব্যবসায়ীর তুলনায় ছোট ব্যবসায়ীই হোক, কি বিখ্যাত নাগরিক না হয়ে সাধারণই হোক।

সাফল্যই আদর্শ

সবাই, এমন কি আমেরিকানরাও, স্বীকার করেন যে ওরা সাফল্যের উপর অত্যাধিক মূল্য আরোপ করেন। সাফল্য বলতেই বস্তুতান্ত্রিক পুরস্কার পাওয়া বোঝায় না, বোঝায় যে কোন ধরণের স্বীকৃতি—ভাল হয় সে-স্বীকৃতি পরিমাণ-যোগ্য হলে। ছেলেটা যদি ব্যবসায়ী না হয়ে ধর্মপ্রচারক হয়, সে-ও ভাল।

সে ক্ষেত্রে তার চার্চ আর ধর্মসভা যে আয়তনে বড় হবে, সাফল্যকেও তত বড় পর্য্যায়ে ফেলা হয়।

সাফল্যের উপর এত জোর দেওয়ার মূলে ছিল অনেক ব্যাপার। যেমন কাজ সম্পর্কিত পিউরিটান ধারণা শুধু কাজের জন্য নয়, কাজের ফলাফল ঈশ্বরের প্রেমের প্রতীক, তাই কর্মই ধর্ম। তারপর ছিল ভাবী উপনিবেশের বিরাট সুযোগ সম্ভাবনা। আর পদ ও শ্রেণী নির্দ্ধারিত স্থায়ী সমাজ ব্যবস্থা না থাকায়, যে কেউ কাজের ভিতর দিয়ে উপরে ওঠা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারত।

পুরাতন দুনিয়ায় বঞ্চিত নবাগতদের ছিল নতুন দুনিয়ায় বড় হবার সংকল্প আর তাদের ছেলেমেয়েদের ছিল আরও সাফল্যলাভ এবং শ্রেণীহীন নতুন সমাজে আরও উপরে·উঠবার আগ্রহে, বহিরাগতের ছাপ ছুঁড়ে ফেলার ব্যগ্রতা। ইউরোপের ন্যায় মা-বাবার বিশেষ সম্প্রীতি লাভের জন্য ভাইয়েদের মধ্যে প্রতিযোগীতা হয়নি, নিজেদের খুসীমত বাইরের জগতে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য তারা সচেষ্ট হয়েছে।

যে সমাজে প্রতিযোগীতার মূল্য এত অধিক, তা আক্রমণাত্মক না হয়েই পারে না, এমন কি আক্রমণের সম্ভাব্য পদ্ধতি সম্পর্কে সযত্নে আইনের বিধি-নিষেধ থাকা সত্ত্বেও। এতে যে রুক্ষতা আছে তা শক্ত অর্থনীতির স্বপক্ষে হলেও অনেকের কাছে কঠোর মনে হতে পারে। গোড়াপত্তনের দিনগুলোতে টিকে থাকবার জন্যে এই আক্রমণাত্মক মনোভাব অপরিহার্য্য ছিল, এখন অবশ্য সমাজের কাছে অভিশাপের মত মনে হতে পারে। কারখানার শ্রমিক যদি নিজেকে একই চাকরীতে বছরের পর বছর আবদ্ধ দেখে, তাহলে তার আক্রমাত্মক মনোভাব বর্ণ বৈষম্য অথবা মালিক-বিরোধী সংগ্রাম, এমন কি, আত্ম-ধ্বংসাত্মক সুরাপান, দুর্ঘটনা প্রবণতা কিংবা স্নায়বিক দুর্বলতার মধ্যেও প্রকাশ পেতে পারে।

সাফল্য যেখানে এত সম্মানের, সেখানের সাফল্যের পুরস্কারও অনেক অধিক। অর্থের জন্য অর্থ আমেরিকায় কদাচ চাওয়া হয়, বরং অর্থ একটি প্রতীক এবং যন্ত্র। মানুষের পদমর্য্যাদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার উপর আর সকলের দাবীও বেড়ে যায়। আশা করা হয় যে, এমন মানুষ শত শত বে-সরকারী সংস্থাসমূহে (ষষ্ঠ অধ্যায় দেখুন) মুক্ত হস্তে দান করবেন। ব্যক্তি-পরিচিতি (Who's Who) গ্রন্থে যে কোন প্রখ্যাতনামা ব্যবসায়ীর জীবনী দেখুন, সম্ভবতঃ দেখতে পাবেন অবিশ্বাস্য সংখ্যক কমিটি আর জনকল্যানকর সংগঠনের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট।

এই সাফল্যের আর সম্মানের দিকে ছুটে চলা ভয়কে আর অন্তরের শূন্য-

তাকে জয় করবার একটা পথ। গতিশীল সমাজে উদ্যোগী কোন ব্যক্তি অপরের সমকক্ষ হতে এবং কতদূর উঠতে পারা যায়, না চেষ্টা করে পারেন না।

যাদের মধ্যে সাফল্যের আশ্বাস রয়েছে তাদের পক্ষে এই ব্যবস্থা সুন্দর। মাঝারি ধরণের মানুষের পক্ষে ভাল নয়। আবার ব্যর্থতার আর প্রতিযোগীতার ভয়, সম্মান হানির আশঙ্কা—এসব থেকে যে উত্তেজনা দেখা যায় অনেকেই তাকে সামলাতে পারে না। এর থেকে ভালবাসার এক অত্যুগ্র আকাঙ্খা সৃষ্ট হয়। তাই সাফল্য আর ভালবাসা পাশাপাশি চলে। গোরের-এর ধারণা বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই অধিকাংশ আমেরিকানের মনেই এই দুটো ভাব গোলমাল পাকিয়ে দেয়; সফল হতে হলে ভালবাসা পেতে হয় এবং ভালবাসা পেতে হলে সফল হতে হয়। এ ধারণা মনে গেথে দেবার জন্যে ছেলে মেয়েরা স্কুলে ভাল করলে স্নেহ আর তারিফ করে এবং অকৃতকার্য্য হলে সে সব স্থগিত রাখেন।

শ্রেণী, উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত অধিকার অথবা শিক্ষার এমন কোন সীমা নেই যা শিশুকে বেধে দিতে পারে, তাই নীতির দিক থেকে, তার কৃতিত্ব অর্জনের দিকেও কোন সীমানা নেই। তাই এমন কথা তার বলবার কোন কারণই থাকতে পারে না: "এটা তো করেছি, এখন থেকে শুধু লেগে থাকাই হবে আমার কাজ।" নীতির দিক থেকে যে কোন শিশুই প্রেসিডেন্টের পদ পেতে পারে, তাই তার জন্যে চেষ্টা করাটা একটা নৈতিক দায়িত্ব। শ্রেণী নয়, মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের বিচারের মাপকাটি হল তার কৃতিত্ব। ধনী অথবা বিশেষ অধিকার নিয়ে জন্ম গ্রহণ করায়,বলতে গেলে,কোন বাহাদুরীই নেই। সত্যিকার কৃতিত্ব হল যেখানে আছ, সেখান থেকে কত উপরে উঠতে পার, তার উপর।

আমেরিকানরা কাজ ভালবাসে। কাজ তাদের কাছে মাংস আর পানীয়ের মতো। সম্প্রতি তারা কি করে খেলতে হয় শিখেছে, কিন্তু তার মধ্যেও তারা কাজটাকেই বড় করে দেখে। স্কেটিং-এর সময়ে ওরা যে ভাবে নেমে পড়ে তাতে হয়ত একটা আস্ত ঘোড়াই মারা যায়। ছুটির দিনে ওরা দিনে পাঁচ-ছ' শো মাইল ঘুরে বেড়ায়, ঘন্টায় ষাট মাইল বেগে দেখার জায়গাগুলো দেখে নেয়, অনেক পরে পরে শুধু ছবি তোলার জন্যই থামে, তারপর বাড়ীতে গিয়ে ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে কি দেখতে গিয়েছিল তা বুঝতে পারে।

কিছুদিন আগেও এদেশে করণীয় অনেক কিছুই ছিল। তার প্রয়োজনও ছিল। গোড়ার দিকে নানান ধরণের আর নানান অবস্থার মানুষ একত্রিত হয়েছিল। প্রচারককে গাছ কাটতে আর জমিতে লাঙ্গল দিতে হয়েছে। শিক্ষক,

ডাক্তার আর ম্যাজিস্ট্রেটকে একই সঙ্গে দেশরক্ষার প্রয়োজনে কাঁধে বন্দুক তুলতে হয়েছে। চাষী নিজেই তার যন্ত্রপাতি তৈরী করেছে,—ঘরের, খামারের আর ঘোড়ার প্রয়োজনীয় সব কিছু। নিজেকেই হতে হয়েছে একাধারে কামার, ছুতোর, টিনের মিস্ত্রি, মদ্য প্রস্তুতকারী আর পশুচিকিৎসক ; তার স্ত্রী হয়েছে সুতা কাটুনি, তাঁতি আর চিকিৎসক।

জড়বাদ

আমেরিকায় নবাগতরা নিজেদের সব কিছু দিয়ে ঝুঁকি নিয়েছিল ; তাদের অধিকাংশই ছিল গরীব। কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে, কখন বা খাবারটুকুও জোটেনি, যা কিছু আয় হয়েছে ব্যবসা করবার জন্যে অথবা খাবার কিনবে বলে জমিয়েছে। ভোট দেবার স্বাধীনতা নয়, বরং মালিক হবার স্বাধীনতাই সাগর-পার থেকে যারা এসেছে তাদের উদ্বুদ্ধ করেছে। স্বাভাবিকভাবেই তাই নিজের চেষ্টায় অর্জিত জমি অথবা ব্যবসায় তাদের কাছে অতিশয় মূল্যবান।

নবাগতদের স্বভাবসিদ্ধ মালিকানা স্পৃহার সঙ্গে অর্থ সম্পর্কে আমেরিকান-দের মনোভাবের কিন্তু কোন মিলই নেই। জার্মান মনস্তাত্ত্বিক হিউগো মান্সটারবার্গ তারিফ করে ঠিকই বলেছিলেন, "আমেরিকানরা যে অর্থ উপার্জন করে নিজের সামর্থ্যের নজীর হিসাবেই সে তার মূল্য দেয়......তাই আমেরিকান-দের জড়বাদী বলে আখ্যা দেওয়া আর তার আদর্শবাদকে অস্বীকার করার মধ্যে মৌলিক ভুল রয়ে গেছে...একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রকর যে অর্থে অর্থের জন্যে কাজ করে, মার্কিন ব্যবসায়ীও ঠিক সেই অর্থেই কাজ করে—"*

সাফল্যের নির্ভুল প্রমাণ হিসাবে অর্থসঞ্চয় অত্যাবশ্যকীয়। অবশ্য সাফল্যের সর্বজন গ্রাহ্য প্রমাণও আছে, যেমন প্রাধান্য লাভ, জনগণের স্বীকৃতিলাভ, ভাল কাজ, খ্যাতি অর্জন। কিন্তু অর্থ জমিয়ে রাখাটা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়। বস্তুতঃ পক্ষে এজন্যে যদি অর্থের মালিক ভালভাবে থাকা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেন, দাতব্য-ভাণ্ডারে অকাতরে দান না করেন অথবা পরিবারের সৌভাগ্য বঞ্চিত অপর সদস্যের কাজে না আসেন, তাহলে কটাক্ষ সইতে হতে পারে।

প্রচুর কাঁচামাল আমেরিকা আশীর্বাদ হিসেবেই পেয়েছে। মন্দার বাজারে জানা গেছে যে, অধিকাংশের উপকারে সম্পদ ব্যবহৃত না হলে ধনবান রাষ্ট্রের অবস্থারও অবনতি ঘটতে পারে। তাই আর সে-ভুল কেউ করতে চায় না।

* America in Perspective, ১৬৮ পৃষ্ঠা।

উৎপন্ন সামগ্রীর একটা বিরাট অংশ বিদেশে যায়। এর মধ্যে কৃষি আর শিল্প যন্ত্রাদিও থাকে—বিশ্বের অন্যান্য অংশেও উৎপাদন আর উপভোগের মান উন্নত হতে পারে এই আশায়।

একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, উৎপাদনের উচ্চমানের অর্থ জাগতিক ভোগ বিলাসের মান উন্নত হওয়া নয় আর আমেরিকানরা নতুন, চকমকে, কোমল, সুন্দরভাবে সাজানো, কাজের যতটা সম্ভব স্বয়ংক্রিয় জিনিষ পছন্দ করে। রুটি স্লাইস মত কেটে বেরিয়ে আসে যাতে গৃহকর্ত্রীকে আর রুটি কাটতে না হয়, আগে টোষ্টারে রুটি লাগিয়ে গৃহকর্ত্রীকে দু'দিকেই টোষ্ট করতে হত। তারপর যে টোষ্টার এল তাতে দুদিক একসঙ্গে টোষ্ট হয়, তারপরে টোষ্টারে টোষ্ট হলে রুটি বার করে দেয়, কিছু দিয়ে তাকে তুলবার আর দরকার হয় না। সন্দেহ নেই যে, শীঘ্রই এমন টোষ্টার বার হবে যা রুটিতে মাখন মাখিয়ে দেবে, চৌকো খণ্ডে কেটে দেবে এবং প্লেটে রাখবে। সম্ভবতঃ এমন টোষ্টার ইতিমধ্যেই বেরিয়ে গেছে।

হাত তুলতে হবে না অথবা এক পা-ও চলতে হবে না, এমন দুনিয়া সৃষ্টির পরও আমেরিকানদের হাফ ছেড়ে বাঁচবার জন্যে ছটফট করা কেন স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে? সহরগুলো বলখেলার মাঠ, গলফ ক্লাব, টেনিস কোর্ট, ক্লাব, লজ, চার্চ আরও নানান সংস্থায় পূর্ণ, যার জন্যে আমেরিকানরা দৈহিক, মানসিক সব রকমের শক্তিই নিয়োগ করে। শ্রম বাঁচানোর যন্ত্র আর স্বাচ্ছন্দ্যপ্রিয়তা আমেরিকানদের সময় আর শক্তি অন্য কাজে নিয়োগের অবকাশ দেয়।

সেবার আদর্শ

বস্তুতন্ত্রবাদ আর স্বাচ্ছন্দ্য—এই কথা দুটোর মধ্যে যেন স্বার্থপরতার একটা ভাব থেকে যায়। অন্যের দৌলতে নিজের উদর পুর্তির ভাব। তবুও, অন্যান্য বিষয়ে সমালোচনায় ঘায়েল হলেও, আমেরিকানদের অতিবড় সমালোচকেরাও তাদের কখনও জাগতিক সাফল্য হতে বঞ্চিতদের সাহায্য করবার স্পৃহার অভাব অথবা কিছুটা মহানুভবতা নেই বলে বলেন নি। "অপরের কাছে যেমন আশাকর তাদের প্রতি ঠিক তেমন ব্যবহার কর"—খ্রীষ্টের এই আদেশ প্রায়শঃই উচ্চারিত হয়। দেশে অথবা বিদেশে, যেখানেই বিপর্যয় হোক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছায় সাহায্যদানের বন্যা সুরু হয়ে যায়। প্রথম উপনিবেশের অথবা সীমান্তের সেই পারস্পরিক সাহায্য দানের প্রয়োজন যদি আর নাও থাকে, সাড়াটা ঠিকই রয়ে গেছে।

পত্র-পত্রিকাগুলো মাইক কাটাসানেভাসের মত জীবনীতে ভর্তি। এই মানুষটি উনিশ বছর বয়সে গ্রীস থেকে আমেরিকায় এসেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লড়াই করলেন, বিয়ে হল, কিন্তু তারপর বাচ্চা আর স্ত্রীর মৃত্যু হল। মা অসুস্থ হলে গ্রীসে ফিরে গেলেন, তাঁকে সাহায্য করলেন। সেখানে আবার বিয়ে করলেন এবং এবার ন'টি ছেলেমেয়ে হ'ল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি এবং তাঁর পরিবার দারিদ্র্যের কবলে পড়লেন। মাইক নাৎসী প্যারাস্যুটবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করলেন, তারপর তিনটি বৎসর বন্দী শিবিরে কাটাতে হল। যুদ্ধের পর বাড়ী ফিরে এসে দেখলেন পরিবারের সবাই যেন এক একটা জীবন্ত কঙ্কাল।

মার্কিন নাগরিক, তাই ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রস্তাবিত সুযোগ নিয়ে বড় বড় তিনটি সন্তানকে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসা ঠিক করলেন। কিন্তু অর্থ বাঁচিয়ে পরিবারের সকলের যাওয়ার ব্যয় বহন করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। মাইকের বয়স পঁয়ষট্টি বছর। এই পরিবারটির কথা খবরের কাগজে প্রকাশিত হতেই, এই পরিবারটিকে দেশে ফিরিয়ে আনবার জন্যে যে ২৬০০ ডলারের প্রয়োজন, তা তাড়াতাড়িই সংগ্রহ হয়েছিল। মাইক যে ন্যাভাল সাপ্লাই ডিপোতে কাজ করতেন, তার ওয়েলফেয়ার ডিরেক্টার অফিসের ফাইল-পত্তরে যত রকমে সাহায্য করা সম্ভব তা করে একটা সাধারণ বাড়ী কিনবার ব্যবস্থা করে দেন। চিত্রকরেরা বিনা পারিশ্রমিকে বাড়ী রং করে দিলেন, ফার্নিচার ষ্টোরগুলো থেকে এল আসবাবপত্র আর গ্রীক চার্চের মেয়েরা ঢাকনার কাপড় আর রান্নাঘরের জিনিষপত্র দিলেন। তারপর মাইকের পরিবারও এসে জুটল। "একমাত্র আমেরিকাতেই এমনটা ঘটতে পারে," মাইকই বলেছিলেন একথা।

আদর্শ হিসেবে সেবা মার্কিন জীবনের বহু শাখার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। সামাজিক সংগঠনগুলো মানুষের অভাব-অভিযোগ বুঝবে এবং জীবনকে আরও সুখী, সম্পদশালী আর সুস্থ করে তুলবে—দিন দিন এই আশায় বেশী ভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে (পরবর্তী অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হবে)। ইতিমধ্যে বাণিজ্যিক কার্যক্রম হিসেবেও সেবা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সেবামূলক কাজে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ১৮৭০ সাল থেকে এতদিনে শতকরা পঁচিশ থেকে তিপান্ন ভাগে পৌঁছেছে। নতুন বাচ্চাটাকে দৈনিক পরিস্কার করে যাওয়া, কি গাড়ীটার ঝাড়-পোছ করা (যান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হবার জন্যে দশ পনের মিনিটের মধ্যে যা শেষ হয়ে যায়) অথবা কুকুরের লোম ছাঁটাই—যাই চান না কেন নিশ্চিত পেয়ে যাবেন।

টেলিফোন বইয়ের শেষের দিকের হলদে পাতাগুলোতে এই ধরণের সেবামূলক কাজের শতশত সংস্থার নাম থাকে।

সুপারমার্কেটগুলো স্বল্পমূল্যের বিনিময়ে 'নিজেরটা নিজে করে নাও' নীতির দিকে চলছে, অপরদিকে ছোট ছোট সংস্থা আত্মপ্রকাশ করেছে, বিশেষ করে সহরতলী আর গাঁয়ের মানুষদের, সাহায্য করার জন্যে। আমাদের পল্লী অঞ্চলের দিকে নিয়মিত যাঁরা যান তাঁদের মধ্যে আছে মশলা বিক্রেতা, কাঁচামশলা বিক্রেতা, রুটি-বিস্কুটওয়ালা, ঠাণ্ডা খাবারওয়ালারা, তিনজন আইসক্রীমওয়ালা—মাঝে মাঝে যারা আসে, সেই ব্রাশ বিক্রেতা, সাফাইওয়ালা, ইনস্যুরেন্স-এর দালাল, পত্র-পত্রিকার হকার, গাড়ী বিক্রেতা—গ্রামাঞ্চলের অবশ্য-প্রয়োজনীয় সংগঠন পল্লী পত্রবাহকদের কথা না হয় বাদই দিলাম।

সেবার উপর এই গুরুত্ব আরোপ থেকে জাতীয় চরিত্রের দুই পরস্পর বিরোধী শক্তির—ব্যবসায় সাফল্যের কঠোর অভিযান এবং ধর্মীয় মনোভাব হতে সৃষ্ট কোমল সেবা স্পৃহার সংমিশ্রণের কথাই বলে। এই সেবা পাবার পর মনে হয় যেখানে প্রতিদান দেওয়া উচিত তা যেন দিতে পারছি না, কারণ আমাদের সেবা করতে গিয়ে ওঁরা যে পরিশ্রম করে, তাতে ওঁদের সাফল্যের জন্যে সাহায্য করাটাই উচিত কাজ বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক।

আধুনিকা মা তাঁর ছেলেমেয়েদের অপরের সেবা, দুর্বলের ও মহিলার প্রতি সহৃদয়তা ও সৌজন্য, উচিতবোধ ও অন্যান্য বাঞ্ছিত নীতির কথা শেখান। মনঃ-তাত্ত্বিকেরা মনে করেন, যেহেতু আমেরিকার সকল ক্ষেত্রে মায়েরা তাঁদের ছেলে-মেয়েদের মানুষ করেন, ভাল আচার ব্যবহারকে আমেরিকানরা মেয়েলি ব্যবহার বলেই মনে করে। তবে অধিকাংশ আমেরিকানই স্বীকার করবেন যে, সব শেষের বিচারক ও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হিসেবে বাবা তাঁর মনের ভিতরে নৈতিক আইনের রক্ষাকর্তা হিসেবে থেকে যান এবং যা কিছু ভাল তার উপর একটা পুরুষালি ছাপ থেকে যায়—এমন কি মনস্তত্ত্বের দিক থেকে যার হদিশ বার করা যায়, তার উপরেও।

সবাই সমান

মার্কিন জীবনের যে একটি দিক সম্পর্কে বহিরাগতদের সকলেই প্রায় একমত, সে হল তার সাদৃশ্য। ওঁদের ঐতিহ্য গড়ে তুলতে হয়েছে, নানান ধরণের কৃষ্টির লক্ষ লক্ষ মানুষকে মিলেমিশে একাকার করে ফেলতে হয়েছে, তাই আমেরি-

ক্কানদের ঝোঁক গেছে মৌলিক ঐক্যবোধের উপর জোর দেবার দিকে। তবুও বহিরাগতেরা যে সাদৃশ্য দেখেন তা বাইরের, আর তাও সবটাই নয়। ইংল্যাণ্ডের ব্যবসায়ীদের তুলনায় মার্কিন ব্যবসায়ীরা খুশীমত পোষাক পরতে পারেন। সুপারমার্কেটে মেয়েরা ফার কোট থেকে বারমুডা সর্টস—বলতে গেলে সব কিছু পরেই এসে থাকে। রাত্রে উজ্জ্বল নিওন সাইনের জন্যে সহরগুলোকে যদিও একই ধরণের দেখায় তবুও তাদের পৃথক ব্যক্তিসত্বা আছে। যে কেউ জানতে চাইলেই তা জানতে পারবেন। সিনেমা হলগুলোতে টিকিটের হার সর্বত্র একই ধরণের হলেও, প্রতিটি সহরের নিজস্ব অ্যামেচার সঙ্গীত শিল্পী, ক্যামেরা ক্লাব আর পেইন্টিং ক্লাশ আছে। সতর কোটি মানুষের দেশের আবহাওয়া ও পছন্দ-অপছন্দের মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে বৈকি। নতুন ধর্ম, মানুষের সম্পর্কের নতুন ব্যাখ্যা এবং মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কিত নতুন সংগঠন চালু হয়, খাবার জিনিষের ব্যাপারেও নতুন পদ্ধতি দেখা দেয়—সব কিছুরই আবার সমর্থনের অভাব হয় না। নতুন এবং বৈচিত্রের প্রতি ভালবাসা, মনে হয় একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট।

অথচ কোন সমাজই এক মিলিত আদর্শের নীতি ছাড়া সমৃদ্ধ হতে পারে না। সমাজকে তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবার জন্যে সে নীতি, সমাজের সকলকে সেই অবশ্য করণীয় পথে চালিত করে। বাহির থেকে পরিচালিত ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ডেভিড রিসম্যানের থিওরী, এই ব্যাপারটি মার্কিন মুল্লুকে কি করে ঘটল তা বুঝতে সাহায্য করবে। রিসম্যানের বিশ্বাস, বিশেষ করে সহরাঞ্চলে বাহির থেকে পরিচালিত ব্যক্তিত্ব স্থান দখল করেছে অন্তর পরিচালিত ব্যক্তিত্বের, যা সীমান্ত অঞ্চলের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর শিল্পোন্নতির সময়কার আমেরিকার একটি বৈশিষ্টই ছিল। অন্তর-পরিচালিত ব্যক্তিত্ব কর্মপ্রয়াসকে উৎপাদনের দিকে এগিয়ে দেয় আর বাহির-পরিচালিত ব্যক্তিত্ব তার শক্তি এবং সামর্থকে উপভোগের দিকে নিয়ে যায়। বর্তমানের প্রাচুর্য্যের অর্থ-নীতিতে সংরক্ষণ আর মূল সমস্যা নেই, এখনকার সমস্যা হল কি করে সবাইকে কাজ দেওয়া যায় আর অর্থ-নীতিকে চালু রাখবার জন্যে কি করে অধিক উপভোগের ক্ষেত্র তৈরী করা যায়।

এসব থেকে এ কথাই বোঝা যায় যে গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের পুরাতন ধাচ পালটে গেছে এবং পালটে যাচ্ছে। প্রতিযোগীদের টপকে যিনি উপরে ওঠেন তার তারিফ আর করি না আমরা। বরং যিনি প্রতিযোগী, কর্মচারী এবং সহযোগীদের খুশী রাখতে পারেন, তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই আমাদের আক্ক-

রিকতা, বন্ধুত্ব, সহজে গ্রহণ করার ক্ষমতা আর সহযোগীতার আদর্শের সঙ্গে খাপ খায়। বোমাবর্ষন আর কলহ বাঁধানোর প্রতিমূর্তি টেডি রুজভেল্টের পরিবর্তে আমরা বরং বন্ধুসুলভ মনোভাব, সকলের প্রতি সমান ব্যবহার আর বিজয়ী হাসির জন্যে আইককেই ভালবাসি। জনতাকে যদি কেউ পরিচালনা করতে পারেন, তো তিনি। আমাদের ধারণা তো তাই। ফন্দি ফিকিরের উপর এত মূল্য আরোপ করি বলেই তাঁর প্রতি আমাদের এত আস্থা।

প্রাচুর্য্যের অর্থনীতিতে প্রতিযোগীতার প্রয়োজন কমে যাচ্ছে, তাই মার্কিন চরিত্রের ঐতিহ্য তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের উপর সে গুরুত্ব আর আরোপ করা হয় না। বরং সাম্যের উপর চিরদিন আমরা যে জোর দিয়ে এসেছি তা প্রাধান্য পাচ্ছে। বেশীদিনের কথা নয় সহরের ধনী ব্যক্তি অথবা জাতির চক্ষে যিনি নেতা, তিনি পোষাক, আবরণ আর কথাবার্ত্তায় কিছু দূরত্ব বজায় রাখতেন। আশাও করা হত সেইরকম। কিন্তু বর্ত্তমানে চার্লস ইভানস হাগস হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। পোষাক-আষাক, আচরণ আর শিক্ষার ব্যাপারে আজকাল উচ্চ-নীচের ব্যবধান হ্রাস পেয়েছে।

ছেলেমেয়ে, নাপিত, কর্মচারী, সহকর্মী অথবা বিমানের পাশের সীটের অপরিচিত সহযাত্রী সকলের সঙ্গেই সম্পর্কের দিক দিয়ে যে কোন আমেরিকান ভাল মানুষ হতে চান। সবাই ভাল চোখে দেখুন এই তিনি চান। এত ক্লাব আর সংগঠনের পিছনেও রয়েছে সেই মনোভাব। নির্ভরযোগ্য কোন গোষ্ঠির দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত থাকতে চান, যার সদস্যরা সব কিছুর উপরে পরস্পরকে ভালবাসার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ।

সাধারণ আমেরিকান কাজকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন এবং নিজের হাতে কাজ করতে চান, তাই নিজের আর পরিবেশনকারিণী পরিচারিকা অথবা হুকুম-করনেওয়ালা উপরওয়ালার মধ্যে শ্রেণীগত কোন ব্যবধানই তিনি খুঁজে পান না। বিদেশের পর্য্যটকেরা কর্মচারী আর মালিকরা একে অপরকে নাম ধরে ডাকছে দেখে স্বভাবতঃই বিস্মিত হয়ে যান। অনেকে এসব পছন্দও করেন না। তাঁদের মতে এতে শ্রদ্ধাহীনতা প্রকাশ পায়। কিন্তু আমেরিকানরা তো শ্রদ্ধা চান না, তাঁদের ভাল লাগুক এই তাঁরা চান। ভাল লাগা হঠাৎ শ্রেণী অথবা বর্ণের প্রাচীর টপকে যেতে পারে না, তাই প্রাচীরকেই নেমে আসতে হয়।

গতিশীলতা

সাম্য বলতে সমান স্তরে সকলের সমান স্থান বোঝায় না। বাঞ্ছনীয় হলেও মানুষের সামর্থের বৈচিত্র এবং বিশেষ বিশেষ ধরণের কাজের পৃথকীকরণ ও কর্মবিভাগের ফলে তা সম্ভব নয়। বরং আমেরিকার আদর্শ এবং উল্লেখযোগ্য-ভাবে বাস্তবেও বহুলাংশে যা প্রতিফলিত হয়েছে সে হল ঠিকে মজুর থেকে কর্পোরেশনের প্রেসিডেণ্ট অথবা বহিরাগতের পুত্র থেকে কলেজের অধ্যাপক—উচ্চপদ আর মর্যাদার আসন দখলের ব্যাপারে সকলের সমান সুযোগ। এই ধরণের গল্প খুঁজে বার করবার জন্যে হোরেসিও অ্যালগেরের উপন্যাসের দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই, সফলকাম যে কোন ব্যক্তির জীবনচরিতেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে।

এমন সময়ও ছিল যখন সাধারণ কাঠের বাড়ীতে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন নি তাঁরা আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না। মিঃ ষ্টিভেনসনের তুলনায় মিঃ আইজেনহাওয়ার এর একটা বড় সুবিধে ছিল এই যে তিনি গরীবের ছেলে হিসেবে জন্মেছিলেন আর ষ্টিভেনসন জন্ম থেকেই বড়লোক। সমাজবিজ্ঞানীরা এখন বলছেন যে, মজুর অথবা কেরাণী থেকে কর্পোরেশনের প্রেসিডেণ্ট হওয়া আগে যত সহজ ছিল, এখন আর তা নেই। তবুও সেদিনের দপ্তরী হারলো কার্টিচ আজ জেনারেল মোটরস্ এর প্রধান এবং অতীতের বার্তা-বাহক ডেভিড সারনফ এখন আর সি-এ'র উপরওয়ালা। আজ শ্রমিকের ছেলের কলেজে যাবার সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল আর সেখান থেকে সে-ছেলে উন্নতির সোপান ধরে আরও, আরও উপরে উঠতে পারে। অথচ শিল্প পরি-চালক আর তার কর্মচারীর মধ্যে ব্যবধান জীবনধারণের মানের উন্নতির জন্যে ক্রমশঃ কমে আসছে। সাধারণ শ্রমিকেরও যেখানে গাড়ী আর টেলিভিশন সেট আছে তার স্ত্রীর ইলেকট্রিক রেফ্রিজারেটর আর ওয়াশিং মেশিন, ভ্যাকাম ক্লিনার আছে, তাদের ছেলেমেয়েরা যেখানে স্কুলে, প্রায়শঃই কলেজে, যেতে পারছে অথচ শিল্প পরিচালককে সকল দুশ্চিন্তা বইতে হচ্ছে কিন্তু সপ্তাহে পয়ত্রিশ বা চল্লিশ ঘণ্টা কাজ করলেই শ্রমিকের কর্তব্য সম্পাদিত হচ্ছে, তখন শুধুমাত্র যাঁদের অত্যধিক উচ্চাশা আছে তাঁদের কথা বাদ দিলে, উচ্চ পদগুলির আকর্ষণ সকলের কাছেই কমে যাচ্ছে।

অনেক ভুলের মধ্যে মার্কস-এর সবচেয়ে মারাত্মক ভুল হল তিনি সামাজিক গতিশীলতা আমলে আনেন নি। বিদেশী দর্শকেরা প্রায়শঃই এই ভেবে আকুল

হন যে এখানে শ্রেণীসংঘর্ষের ভিত্তিতে কোন রাজনৈতিক দল গড়ে উঠল না কেন। জবাবটা খুবই সহজ; ইউরোপীয় অর্থে আমাদের এখানে কোন শ্রেণী নেই, কারণ বংশপরম্পরায় আমরা এগিয়েই চলেছি। "এখানে উচ্চ শ্রেণীর" কারও বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অর্থই হল, আশাবাদী শ্রমিক যে আদর্শের দিকে ধাবিত হয়েছে তাকে চুরমার করে দেওয়া। উচ্চ বেতন, কাজের সময়ের স্বল্পতা এবং পূর্ব নির্ধারিত বাৎসরিক বেতন—এ সবের জন্যে অনেক শিল্প-পরিচালক পেশাদার শ্রমিকদের ঈর্ষার চোখেই দেখেন। সামাজিক মর্যাদার আসনও আর স্থিতিশীল থাকছে না কারণ এখন একজন প্লাম্বারও একমাস ফ্লোরিডায় কাটিয়ে আসতে পারে। কিন্তু একজন আইনজীবি অন্যত্র যাবার জন্যে একটা মামলা ছাড়তে চান না বা ছাড়তে পারেন না।

অন্য দিকে শিল্পপতিকেও এখন আর স্থূল বাস্তববাদী বলে ভাববার অবকাশ নেই। ক্রমান্বয়ে তাঁরা সাংস্কৃতিক কাজে অর্থ ব্যয় করতে চাইছেন। এলিসটার কুক চিকাগোর এক মাংস প্যাকারের কথা বলেছেন যিনি একদিন মিউজিয়মে গিয়ে চিত্রকলা সম্পর্কে আগ্রহশীল হয়ে পড়েন এবং পরবর্তীকালে বিশ্বের সেরা আধুনিক ফরাসী চিত্রকলার সংগ্রাহক হিসেবে সুপরিচিত হন। অথবা হানটিংটন হার্টফোর্ড-এর কথা বলা যায় যিনি তাঁর অর্থ শিল্পকলার অগ্রগতির জন্যে নানাভাবে নিয়োগ করেছেন। তিনি একাধারে চিত্র নির্মাতা, সৃজনীশক্তি সম্পন্ন কলাবিদেরা কোন রকম বাধা না পেয়ে কাজ করতে পারেন এমন একটি কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা, চিত্রকলার সংগ্রাহক, নিউইয়র্ক আর্ট গ্যালারির নির্মাতা এবং হলিউডের একটি সুন্দর নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতা।

অন্য যে কোন দেশের মানুষের মতো নির্ঝঞ্ঝাট গৃহ, প্রেম, সাফল্য এবং সঙ্গী-সাথীর জন্যে আমেরিকানরাও বুভুক্ষু। কিন্তু অনেকেই বাইরে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতেই তার গৃহ আর সঙ্গীকে খুঁজে পায়। বিমানে, নৃত্যোৎসবে, নয়তো অফিসের কোন পার্টিতে মনের মানুষ (অথবা প্রিয়া)-কে খুঁজে পাওয়া যায়। কলেজে নানা ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে ওঁরা নিজের পেশা নির্বাচন করে, তারপর এক কোম্পানী থেকে আর এক কোম্পানী করতে করতে অবশেষে ঠিক মত কাজটি পেয়ে যায়। যেখান থেকে সুরু সেই কোম্পানীতে নিজেকে আটক না রেখে প্রতিযোগী অন্য কোন কোম্পানীতে গেলেই দ্রুত উন্নতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তাই গতিশীলতা পুরস্কৃত হয়, গতিহীনতা শাস্তিরই নিদর্শন।

উন্নতির সোপান ধরে ওঠা সুরু হতেই ওরা ভাল পাড়ায় কিংবা আরও ছেলেমেয়ের স্থান হয় এমন বড় বাড়ীতে উঠে যায়। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়াকে ওরা ভয় করে না, বরং ভালই বাসে। এগিয়ে যাওয়ার পেশা ওদের অস্থিমজ্জায় রয়ে গেছে; পশ্চিমমুখো ধাবিত হওয়া এখন আর ভুগোল সম্মত না হলেও ওদের মন প্রাণ ওদিকেই থাকে। আমেরিকানদের বিশ্বাস সুখের জন্যে ছুটতে হয়, অপেক্ষা করে বসে থাকলে ও জিনিষটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। ওদের আস্থার মূল কথাই এই। আরও, আরও কিছুর দিকে ওরা এগিয়ে চলে, সংশ্লিষ্ট অনিশ্চিত অস্থিরতার দিকেও।

যখন সমস্ত কিছু উল্টে পাল্টে যাচ্ছে, তখন কিছু একটা মাপকাঠি থাকা দরকার। তাই (এবং আমাদের প্রয়োগিক অন্ধ বিশ্বাসের জন্যে) দেখা দিয়েছে সংখ্যা- সূচক মান—স্কুলের নম্বর প্রথা, চাকরী অথবা শিল্পকলার মূল্যায়নে ডলারের সংখ্যা ব্যবহার, যা কিছু বৃহত্তম, উচ্চতম, উষ্ণতম, শীতলতম, দ্রুততম—তার প্রতি আগ্রহ।

আমেরিকানরা পরিবর্তনকে মেনে নিয়েছে। পরিবর্তনটা ওদের উপরেই শুধু প্রযোজ্য নয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরেও ওরা এই পরিবর্তনকে প্রয়োগ করে। ক্লাইড ক্লাকহন ঠিকই বলেছেন, মানুষ পারিপার্শ্বিক অবস্থা অথবা নিজেদের পরিবর্তন সাধন করে সঙ্কটের মোকাবিলা করে। পূর্ব দুনিয়া সাধারণভাবে শেষের আর পশ্চিম দুনিয়া প্রথম পথটাকে বেছে নিয়েছে। আমেরিকানরা এই ধরণের পরিবর্তনে বিশেষ ভাবে খুশী হয়—পাহাড় সরিয়ে সোজা রাস্তা তৈরী, মরুভূমিকে খামারে রূপান্তরিত করবার জন্যে নদীর গতিপথ পালটে দেওয়া, হাতের কাজের জায়গায় স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র চালু করা এবং অবসর বিনোদনকেই শিল্পে পরিণত করা, যাতে অবসরযাপনের নতুন নতুন পথ আবিষ্কৃত হয় আর স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র চালু হবার জন্যে যাঁরা বেকার হলেন, তাঁদেরও কাজ জোটে।

সীমান্তের প্রভাব

ইউরোপীয় সংস্কৃতির গৌরব বহন করে যাঁরা এসেছিলেন, আমেরিকার জমি আর জলবায়ু তাঁদের যা দিয়েছে, তাই হল মার্কিন সংস্কৃতির বৈশিষ্ট। সপ্তদশ শতাব্দীতেও জমির মালিকানার সঙ্গে যে সামন্ততন্ত্র অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল, তার বাধা নিষেধ থেকে মুক্ত নবাগতদের নিজেরা জমির মালিক হবার বুভুক্ষা তাড়না করেছে। জমি সমস্যা সমাধানের সেই সব ফ্যাসাদ, সন্ধি বা যুদ্ধ

করে ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে জমি দখল, পথহীন বনভূমি ঘুরে সেগুলোকে বার করা, মামুলী ধরণের কয়েকটা মাত্র যন্ত্রের সাহায্যে বাড়ী তৈরী আর ফসল ফলানো, যুদ্ধ, জলবায়ু অথবা ক্ষিধেতে মৃত্যু—বাকী ইউরোপীয়দের আমেরিকান করে তোলে। সংগ্রামই মার্কিন চরিত্র গঠন করতে সাহায্য করেছে।

সীমান্ত অভিজ্ঞতা এই ব্যাপারে বেশ শক্ত ভূমিকা নিয়েছিল এবং রুক্ষ শিক্ষকের মতো কাজ করায় মার্কিন চরিত্রের নতুনত্ব এনেছিল। দৈনন্দিন জীবনের কঠোরত্ব আচার-ব্যবহারে রুক্ষতা এনে দিয়েছিল। উপযোগী জমির (অথবা পরে সোনা) জন্যে প্রতিযোগীতা, বেঁচে থাকবার জন্যে অপরকে খতম করা এবং আইন ও শৃঙ্খলার অনুপস্থিতি মানুষকে শক্ত, কখনও বা নির্দয় এবং দ্রুত পাশব আচরণে অভ্যস্ত করে তুলেছিল। দস্যুতা, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতি, দেশব্যাপী কালোবাজারী এবং সহিংস রাজনৈতিক আক্রমণের মধ্যে এই হিংস্রভাব কাজ করে গেছে।

জীবনধারণ ব্যবস্থা শক্ত ছিল বলে সম্ভাবনাও ছিল প্রচুর, কখনও কখনও অবশ্য সামান্যই প্রতিদান পাওয়া যেত। এর থেকেই এসেছে "দ্রুত ধনী হও" ভাবধারা যার মূল কথা ছিল সামান্য সৌভাগ্য নিয়েও কঠোর পরিশ্রম করলে সব কিছুকে স্বর্ণে পরিণত করা যায়। ব্যবসায়ীরা ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে সামান্যের বিনিময়ে মূল্যবান ফার পেয়েছে। মাটির থেকে পাওয়া গেছে সোনা, রূপো, তেল। এ যেন, 'দানের উপর যীশুখৃষ্টের স্বর্ণবৃষ্টির' চেয়েও বেশী সম্পদশালী। এর পর এল দস্যু ব্যারনের দল যারা রেলরাস্তা তৈরী করে এবং মজুতমাল নিয়ে জুয়াখেলা খেলতে খেলতে প্রচুর ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হয়েছে—১৯২৯ সালে ওয়াল ষ্ট্রীটের পতন না হওয়া অবধি এই মজুত মালের সঙ্গে সকলের স্বার্থই জড়িত ছিল।

অবশ্য সীমান্ত ভাল দিকটাকেও গড়ে তুলেছে। উদ্যোগ আয়োজন উৎসাহিত হয়েছে, হাতের কাজ শ্রদ্ধার আসন পেয়েছে। স্বাধীন, আত্ম-প্রত্যয়ী চাষী যে প্রতীকে রূপান্তরিত করেছে তা আজও আমাদের জাতীয় জীবনকে প্রভাবিত করেছে। এ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে সম্পদশালী অনুসন্ধিৎসু, বাস্তবধর্ম ব্যক্তিত্ব যা যে কোন কাজে হাত লাগাতে পারে, সহজে চালানো যায় এমন সমাজ পরিচালনা করতে ইচ্ছুক, উদ্ভাবনপ্রিয়, নতুন পরিস্থিতিকে মানিয়ে নিতে পারে, শ্রেণী বিভেদ থেকে অপেক্ষাকৃত মুক্ত, উচ্চাশা এবং যে দেশ তাকে পুরস্কৃত করেছে, তার প্রতি আস্থাশীল।

এই দিকগুলো, যে ভাবেই হোক না কেন, বর্ত্তমানের আমেরিকানদের মধ্যে দৃশ্যমান। মহাদেশ চষে ফেলা হয়েছে অথবা ঘরবাড়ী হয়েছে মানে এই নয় যে সীমান্ত উবে গেছে। প্রকৃতপক্ষে ঘর-বাড়ী তৈরীর মতো জমি সরকারের হাতে আছে এবং তা এখন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার একর ফী বছর বন্টিত হচ্ছে। তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য, নিজের সম্পর্কে আমেরিকানদের যে প্রত্যয়, তার সঙ্গে অগ্রনায়কত্ব গভীরভাবে মিশে আছে।

বনভূমি থেকে যে দেশ এমন জাতি জন্ম দেয় যারা নিয়ত শুধু চলছে, নিয়ত নতুন করে দল আর সংগঠন গড়ে তুলছে, বন্ধুত্ব সম্পর্কে তার প্রত্যয় পাল্টাবেই। এ দেশের মানুষকে অতি দ্রুত নিজেদের চিনে ফেলতে হবে; খ্যাতি অথবা পারিবারিক ঐতিহ্য নয়, কাজের মাপকাঠিতে বিচার করতে হবে। নতুন সমাজে যিনি নবাগত নতুন বন্ধু পেতে হলে তাঁকে নিজের আচরণ বন্ধুসুলভ করে তুলতে হবে। আর এগিয়ে চলবার জন্যেই আরও বন্ধুর দরকার।

এই দ্রুত-বন্ধুত্ব বিদেশীর চোখে প্রায়শঃই আন্তরিকতাহীন হয়ে দেখা দেয়, তবুও আমেরিকান প্রকৃতির এ একটি স্বতঃস্ফূর্ত সংস্কার। সকল সম্পর্কের পিছনেই, আমাদের ধারণা, কিছুটা প্রেম অথবা বন্ধুত্ব থাকা চাই। কয়েকজন নিকট বন্ধু আর বাকী মানুষ জাতির মধ্যে আমরা তেমন পার্থক্য করি না, যেমন কতকগুলো দেশে হয়ে থাকে। আমাদের বন্ধুর সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, তত অধিক লোককে আমরা রাস্তায় নাম ধরে ডাকি, বোর্ড-এর সভায়, চার্চ-এ অথবা সিনেমায় নাম ধরে অভিবাদন জানাই আর পারিপার্শ্বিক দুনিয়ায় ততটা মিশে গেছি ভেবে স্বস্তি অনুভব করি।

'আমার বন্ধু' বলতে দু'তিনজন অন্তরঙ্গ সঙ্গীকেই বোঝায় না। প্রতিবেশী, নিজের ক্লাব ও সংগঠনের সদস্য, সহকর্মী, গাড়ীতে যে পেট্রোল বোঝাই করে, ভূতপূর্ব শিক্ষক, পাদ্রী, মুদী-বন্ধু বলতে এঁদের বোঝায়। অন্য সংস্কৃতি বন্ধুত্বকে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য জিনিষ বলে ধরে নিয়েছে, তাই ওটা মাত্র কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমরা বন্ধুত্বকে এত দুষ্প্রাপ্য বলে মনে করি যে, মনে হয় সকলের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেওয়াটাই উচিত। অর্থনীতি শাস্ত্র শিখিয়েছে, যত চাই তত পাই, তেমনই মানসিক অর্থনীতি এ কথাই বিশ্বাস করতে বলে যে, যত বন্ধু চাই, বন্ধুত্বের পরিধিও তত বৃদ্ধি পাবে। আমাদের কৃষিজাত উদ্বৃত্ত এবং প্রথম মহাযুদ্ধে যে ভুলচুক করেছি, তা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, মজুত করে বড় লোক হওয়া যায় না, বরং অবস্থা খারাপ হয়ে যায়।

বন্ধুর অন্বেষণ শুধু ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ব্যাপারটা এখন মহাদেশের সীমাও অতিক্রম করেছে। প্রতিবেশীদের প্রতি সহৃদয়তা, অনগ্রসর এলাকাকে সাহায্য দান, বুভুক্ষুদের উদ্বৃত্ত খাদ্য দান, বিশ্ব প্রতিবেশী (ওয়ার্লড্ নেবারস) প্রভৃতি সংস্থা-এ সব রাজনৈতিক চাহিদানুযায়ী সংগঠিত একথা ভাবলে সব কথা ঠিক মত বোঝা যাবে না। এর মূল ভিত্তি হল ভালবাসার এবং ভালবাসা পাবার প্রেরণা এবং নিজে সকলকে যথার্থ ভালবাসলে প্রতিদানে তারাও ভালবাসবে এবং সব কিছু প্রেমময় হয়ে উঠবে—এই বিশ্বাস (যা রুজভেল্টকে ষ্ট্যালিনের প্রতি ভুল আচরণে প্ররোচিত করেছিল।)

মার্কিণ প্রত্যয়

যে ধারণা অথবা বিশ্বাস মার্কিন চরিত্র গঠন করেছে সেগুলি কি ?

জর্জ স্যান্টাইয়ানা বলেছেন, "এই সব জাতীয় বিশ্বাস ও নীতিবোধ ধারণার দিক থেকে সুস্পষ্ট না হলেও মনোভাবের দিক থেকে সদা বিদ্যমান, এগিয়ে চলা কাজ আর বিশ্বাসের অন্তর্নিহিত নীতিকথা।"* ক্লাইড ক্লার্কহন্ মার্কিন প্রত্যয়ের অভ্যন্তরে যা কিছু যুক্তিগ্রাহ্য তার উপর অগাধ বিশ্বাস ; নীতিসম্মত আধুনিকীকরণ ; যুক্তিপূর্ণ প্রয়াস শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভ করে বলে এই ধারণা, ব্যক্তি এবং তার অধিকারে আস্থা স্থাপন, সাধারণ মানুষের মতবাদ [তার অধিকারের কথা নয়, তার সামগ্রিক রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার কথা), পরিবর্ত্তন ও প্রগতির উপর অত্যধিক মূল্য আরোপ এবং কল্যাণের জন্যে আনন্দের সচেতন অনুসরণ—এইসব দেখতে পেয়েছেন। †

নিজের সংগঠনের উপরেও আমেরিকানদের সুতীব্র বিশ্বাস। স্বাধীনতার ঘোষণা এবং সংবিধান যেভাবে সুস্পষ্ট ভাষায় এবং শেষ কথা হিসেবে স্বায়ত্ব-শাসনের মৌলিক নীতি উল্লিখিত হয়েছে, যে তাকে: মার্কিন উদ্ভাবন—অন্ততঃ পক্ষে এই নীতি আর অধিকারগুলোকে আমেরিকানদের বৈশিষ্ট বলে মনে হয়। এই পবিত্র দলিলগুলোতে পাওয়া যাবে আমাদের মূল নীতি—ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকার দরুন সৃষ্টির মতোই চিরন্তন হিসেবে যাকে উপস্থিত করা হয়েছে এবং যা প্রশ্ন অথবা পরিবর্ত্তনের উর্দ্ধে। তাই মূলনীতি নিয়ে আমাদের ঝগড়া-বিবাদের প্রয়োজন নাই, ওগুলো চিরদিনের।

---

* ক্যারাকটার অ্যাণ্ড ওপিনিয়ন ইন দি ইউনাইটেড ষ্টেটস, ২১৯

† মিরর ফর ম্যানে, ২৩২ পৃষ্ঠা

পর্য্যবেক্ষকেরা আমাদের মধ্যে যে চিন্তাহীনতার সন্ধান পান তার মূলে, অংশতঃ রয়েছে এই বিশ্বাস যে আমাদের গন্তব্যস্থল পূর্ব নির্ধারিত হয়ে আছে এবং তা নিয়ে যুক্তি-তর্কের অবকাশ নেই। সেখানে পৌঁছানোর জন্যে দরকার শুধু কঠোর পরিশ্রমের। সৃষ্টি করা, নির্মাণ করা—নতুন জমি পরিষ্কার করা, নতুন খনি খনন, নতুন পৌরসংস্থার পত্তন, নতুন ব্যবসা সুরু করা—এই সবেরই প্রশংসায় পঞ্চমুখ আমেরিকানরা। এইসব সম্পর্কেই তারা স্বপ্ন দেখে। যাঁরা সৃষ্টি করেন, তাঁদের সকলের মতো আমেরিকানরাও সমালোচক-দের সন্দেহের চোখে দেখেন।

এই কারণে এবং যেহেতু আমেরিকানরা নিষ্ক্রিয় দর্শক নয়, সক্রিয় অংশ-গ্রহণকারী, তাই তারা বাইরের যে কোন সমালোচনার বিরুদ্ধে দেশরক্ষাকে কর্তব্য হিসেবেই দেখে—তা নিজেদের দুর্বলতা নিজেরা যত কঠোর ভাষাতেই সমালোচনা করুক না কেন। শতমুখে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশংসা করলেও এমন দেশ-ভক্তি বিরক্তিকর বলেই মনে হয়েছে দ্য টকেভেলির। প্রশংসা করা বন্ধ করলে ওরা চটে যান, নিজেরাই প্রশংসা করতে নেমে আসেন। তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা সেই ভালবাস ও ভালবাসা পাও নীতিরই অংশবিশেষ; চরম সরলতা সত্ত্বেও যা ঘৃণা করা ও ঘৃণা পাওয়া নীতির [মানুষের ইতিহাসের অনেকটাই যে পথে নির্ধারিত হয়েছে] তুলনায় অনেক বেশী সুবিধে পেতে পারে।

মার্কিন মতবাদের অনেকটা এই অগ্রনায়কের ভূমিকা থেকে উদ্ভূত হলেও কিছুটা আবার পিউরিটানদের কাছ থেকে পাওয়া। তাদের বংশধরের পিউরি-টান মতবাদ পশ্চিম দুনিয়াকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। এই রকম একটি মতবাদ হল ভগবানের নিজের হাতে তাঁর মূর্তির অনুকরণে গড়া মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা। সমঝোতা এবং সম্মতির উপর ভিত্তি করে সরকার গঠন সুরু হয়েছিল সেই তীর্থ-যাত্রীদের সময় থেকে, সপ্তদশশতাব্দীর ধর্মতত্ত্ববিদদের পরম এবং জটিল যুক্তিধারার যাঁরা ছিলেন স্তম্ভস্বরূপ। ব্যক্তি নয়, নীতির প্রতি আনুগত্য এবং ধর্মবিশ্বাসই মানুষের শাসন ব্যবস্থার একমাত্র শক্ত বুনিয়াদ—এই প্রত্যয় পিউ-রিটান মতবাদের মূলকথা।

তাই ক্যালভিনের নীতিবাদ দিয়ে তৈরী রঙ্গমঞ্চে আমেরিকানরা মোক্ষণ নাটকের অভিনয় করেছেন। কঠোর আইনগুলো ভঙ্গ করলে তারা শাস্তি পাবেন ভেবে নিয়েছেন। কখনও বা অপরাধ ধরা না পড়লে নিজেরাই নিজেদের শাস্তি দিয়েছেন। যৌনক্ষুধা প্রতিরোধের জন্যে ওঁরা কঠোর পরিশ্রম

করেছেন, অই কাজের দু রকমের অর্থ করে নিয়েছেন ওরা। এমন কি, কালও ফ্রয়েড-এর শিথিল প্রভাব সত্বেও, অধিকাংশ আমেরিকানদেরই ইন্দ্রিয় সুখ সম্পর্কে কতটা গোলমেলে ধারণা আছে। নিজের কাজটুকু শেষ করতে না পারলে কেউই শান্তি অনুভব করে না।

এই ধর্মীয় মনোভাবের নিখুত নিদর্শন পাওয়া যাবে কর্ণেল আব্রাহাম ডেভেন-পোর্ট-এর সেই গল্পে। ১১৮০ সালের একটা দিনের কথা। ধরেই নেওয়া হয়েছিল যে দুনিয়া বিলুপ্ত হবার দিন ঘনিয়ে এসেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হতেই ডেভেনপোর্ট কনেকটিকাট-এর প্রতিনিধি সভায় (হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস) উঠে দাঁড়ালেন, অধিবেশন মুলতুবী রাখার প্রস্তাবের বিরোধীতা করার জন্যেই।

তিনি বললেন, "শেষ বিচারের দিন ঘনিয়ে আসতেও পারে, আবার নাও পারে। যদি না এসে থাকে, তবে সভা মুলতুবী রাখার কোন হেতুই নাই। আর যদি এসেই থাকে, আমি আমার কর্ত্তব্য করতে করতে যেতে চাই। আমার ইচ্ছা মোমবাতিগুলো নিয়ে আসা হোক।"

পরিহাস প্রিয়তা

অনেক ক্ষেত্রেই যে কোন সংস্কৃতির বিশেষ দিক প্রকাশ পায় তার পরিহাস ক্ষমতায়। নিশ্চিত বলা চলে মার্কিন সভ্যতার মত অন্য কোথাও পরিহাস প্রিয়তা এত উচ্চস্থান পায়নি। উইল রোজার্স বীরোচিত শ্রদ্ধা পাচ্ছেন মার্কিন পট-ভূমি সম্পর্কে তাঁর ক্ষুরধার বাস্তব মন্তব্যের জন্যে—নিজেদের হাস্যাস্পদ দিকটা আমেরিকানদের দেখতে শিখিয়েছেন তিনি। নানা দিক দিয়ে মার্ক টোয়েন আমাদের সর্বাধিক প্রতিনিধিমূলক লেখক; কিন্তু মার্কিন জীবন চিত্রণে দক্ষতার জন্যে যতটা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশী প্রশংসা পান তিনি তাঁর হিউমার জ্ঞানের জন্যে। বিয়োগান্ত কিছুর চেয়ে আমরা যে মিলনান্তকের পক্ষপাতী সে-ও আমাদের আশাবাদী মনোভাব থেকেই এসেছে। এই জন্যেই মজাদার মানুষগুলো পোষ্টারে সর্বাধিক স্থান পায়, টেলিভিশনে সর্বাধিক বেতন পায়।

উত্তেজনা প্রশমনে পরিহাসের স্থান অনেক উপরে। অন্যদিকে পরিহাস প্রিয়তাই আমাদের দ্রুত ধাবমান শিল্পজীবনের ভারসাম্য রক্ষা করছে, যার প্রতীক হল প্রচণ্ড যান্ত্রিক শব্দ, যানবাহনের চক্রব্যূহ আর রাগত স্বভাব। হিউমার এগুলিকে আমাদের কাছে এমনভাবে উপস্থিত করে যে এই সব ব্যাপারও আমাদের কাছে হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠে।

পরিহাস করা ব্যাপারে পবিত্র বলে কিছু নেই। সত্যি বলতে কি, বিষয়টা যতই পবিত্র হবে, পরিহাসের ফলটাও তত মোক্ষম হবে। পাদ্রীদের নিয়ে পরিহাস করার তো সীমা-পরিসীমা নেই। জনৈক পাদ্রী যখন বললেন, ধর্মোপদেশাবলী চিন্তা করছিলাম বলে, দাড়ি কামানোর সময় গাল কেটে গেল।" স্থানীয় এক ব্যক্তি যখন জবাব দিলেন, "উচিত ছিল আপনার গাল নিয়ে চিন্তা করবার সময়, ধর্মোপদেশাবলী কেটে ফেলা।"

আমেরিকান হিউমার প্রেম ও পরিবারের গুরুত্ব, ছেলেমেয়ে ও মেয়েদের মর্য্যাদা এবং জীবনের শান্তি ও উত্তেজনাকেই প্রকাশ করে। তবে সবচেয়ে বেশী করে বোধহয় এই কথাই জানিয়ে দেয় যে, পরিহাসপ্রিয়তা জীবনের এমন একটা দিক যার মূল্য ধনসম্পত্তির অনেক উপরে, এ এমন এক ক্ষমতা যাকে অনেক আকাঙ্খার ও উল্লাসের বস্তু হিসেবে অভিনন্দিত করা হয়। পাদ্রী তাঁর ধর্মীয় বক্তৃতায়, ডাক্তার রোগ সারানোয়, উকিল সওয়ালের সময়ে, শিক্ষক পড়ানোর সময়ে এর ব্যবহার করেন। মানুষের সবচেয়ে খারাপ যে দিকটার কথা আমরা বলি, সে হল তার রহস্য উপলব্ধির অক্ষমতা, কারণ "মার্কিন ধাঁচের" জীবন যাত্রায় হিউমারকে একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই দেখা হয়।

হিউমার সকলকে সমান করে ভাবতে সাহায্য করে—সাম্যে আমরা বিশ্বাসও করি। স্বাধীনতার প্রতীকও বটে, কারণ এর দৌলতেই সাধারণ মানুষ অবাধে নেতাদের সম্বন্ধে যা-খুসী বলে যেতে পারেন, ইচ্ছে করলে প্রয়োজন মত তাঁদের নামিয়ে ফেলতেও পারেন। অনেক সার্টের দম আটকে আসা ভাব এতে কমে আসে। এর সাহায্যে নিজেদের দিকে আমরা ঠিক মত তাকাতে পারি; কারণ নিজেদের জন্যে যখন আমরা হাসি, তখন ছোট-খাট দুর্বলতা আমরা অতিক্রম করে এসেছি। দেশে সব সময়েই নতুন করে মানুষের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে, সেখানে হিউমার ভাবগত ঐক্যের পথে হাতের কাছের হাতিয়ারের মত—সেও সূক্ষ্ম অথবা আঞ্চলিক নয়, সার্বিক, যার ফলে সঙ্গে সঙ্গেই যেখানেই থাকি না কেন, নিজের বাড়ী বলে মনে হয়। হিউমার হল আত্মার ব্যাকরণ, আশাবাদের ছন্দ, ভ্রাতৃত্বের সঙ্গীত।

আমেরিকান বল্‌তে কি বোঝায়?

মিসেস টিসট্রাম হেনরী জেমসকে বলেছিলেন, "তোমাকে বুঝতে পারি না। বুঝতে পারি না তুমি গভীর জলের মাছ, না একেবারে সাদাসিদে।" এইরকম সঙ্কটে প্রায়শঃই ইউরোপীয়েরা পড়ে থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা ধরে

নেন, আমেরিকানরা ছেলেমানুষের মতো। কিন্তু কেউ কি সঠিক বলতে পারে, যে কোন সমাজ পরিণত আর অন্যটা অপরিণত? প্রত্যেকেরই নিজস্ব যুক্তি থাকে।

তা হলে কী এমন আছে যা দিয়ে যেখানেই যাক না কেন, আমেরিকানদের চিনে ফেলা যায়? এই লক্ষনটা আশাকরি, এক শ্রেণীর টুরিষ্ট যে মনোভাবের জন্যে দায়ী—সেই গোলযোগ, গর্ব অথবা সমালোচনা করা কিংবা যথেচ্ছ অর্থ অপব্যয় করা নয়। এঁদের স্বপক্ষে শুধুমাত্র এইটুকুই বলা চলে যে, যে সামাজিক বিধিনিষেধ ওঁদের দেশে ভিন্নভাবে আচরণ করতে বাধা করতো, তার থেকে মুক্ত হয়ে ওঁরা এই স্বাধীনতার সেই সুযোগটুকু নিতে চেষ্টা করছেন। যে ভাব আমেরিকানদের সঙ্গে সঙ্গে চলে, তার মূলে যতটা রয়েছে তাঁদের ধরণ-ধারণ, সাজপোষাক ততটা নয়। এই ধরণ ধারণের সঙ্গে মিলিত হয় শ্রেণী সচেতনহীনতা, আত্মসন্তুষ্ট আশাবাদ এবং অনুসন্ধিৎসা যার ফলে ইউ-রোপীয়দের দিকে সে দৃষ্টি দেয় অত্যন্ত সরলতার সঙ্গে। এর সঙ্গে রয়েছে তথ্য ও পরিসংখ্যানের প্রতি আগ্রহ, সতর্কতা (যা যতটা না বুদ্ধিসঞ্জাত, তার চেয়ে অনেক বেশী পেশী ও চক্ষুউদ্ভূত) এবং, সর্বোপরি, বন্ধু হবার স্পৃহা। (এখনকার জন্যে অন্ততঃ আসুন আমরা চিউইংগাম, অত্যধিক ধূমপান এবং সব-কিছু কানসাস সিটি অথবা কিওকুক-এর সঙ্গে তুলনা করবার ব্যগ্রতার কথা বাদ দিই।) সংক্ষিপ্ত করে বলা যায়, অস্বাভাবিক প্রতিযোগীতামূলক পরিস্থিতির প্রত্যুত্তর ও অসম্ভব সুযোগ সুবিধের মিলন থেকেই গড়ে উঠেছে মার্কিন চরিত্র।

অবশ্য আমেরিকানের খাঁটি নমুনা বলে কিছু থাকতে পারে না। তবে ওঁদের সকলকে একসঙ্গে যোগ করে ১৭০,০০০,০০০ দিয়ে ভাগ করলে যা পাওয়া যাবে তার সঙ্গে এই অধ্যায়ে যাকে চিত্রিত করা হয়েছে তার খুব বেশী পার্থক্য থাকবে না।

সমাজ

চারিত্রিক বৈশিষ্ট এবং পারিবারিক জীবন সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা যদি ঠিক হয় তবে আমেরিকানরা নিজেদের জন্যে কি ধরণের সমাজ গড়ে তোলে ?

প্রথমে ছোটখাট সমাজের দিকে দৃষ্টি দেওয়ায় সহজ। পরিসংখ্যানের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে যা মনে হবে তার চেয়ে অনেক বেশী আমেরিকান ছোট ছোট সমাজে বাস করে। সেনসাস বুরো আড়াই হাজারের অধিক মানুষের বসবাস হলেই সে অঞ্চলকে "সহর" আখ্যা দিয়ে থাকেন। কিন্তু আড়াই হাজার মানুষের সহরের গ্রাম্য ভাবটাই সাধারণতঃ বেশী। অপরদিকে পঁচিশ হাজার, এমন কি পঞ্চাশ হাজার মানুষ বসবাস করে নিজেকে তার একটি অঙ্গ হিসেবেই মনে করেন—অনুভব করেন যে, তিনি ব্যাপারটা ভাল করেই জানেন। আমাদের জনসংখ্যার শতকরা সাঁইত্রিশ ভাগ রয়ে গেছেন গ্রামাঞ্চলে (যার এক-একটি কেন্দ্রে থাকেন একহাজার কিংবা তারও কম মানুষ), শতকরা বাইশ ভাগ থাকেন সহর ও ছোট ছোট নগরে (সিটি) যার লোকসংখ্যা পঁচিশ হাজার অবধি এবং শতকরা একচল্লিশ জন থাকেন বড় বড় সহরে। বেশীর ভাগ আমেরিকানের সহজ প্রবৃত্তি এখনও প্রদেশ আর ছোট সহরের দিকে, এমন কি প্রায়শঃই বিশ্ব প্রেম তাঁদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হলেও। যুদ্ধের পর থেকেই তাঁরা সহরতলীর সমাজের দিকে দ্রুত ছুটে চলেছেন—যত দ্রুত বাড়ী নির্মিত হতে পারে। নিজের কাজ নিজে করতে অভ্যস্ত বলেই তাঁরা বিরাট আকারের সমাজে থাকতে চান না। কারণ সেখানে নিজের ব্যবস্থা নিজে করা সম্ভব হয় না। যখনই সম্ভব হয়, যে উপায়েই হোক বড় সমাজকে তাঁরা ছোট ছোট কেন্দ্রে ভেঙ্গে ফেলেন।

যে কোন সহরে প্রবেশ করলে প্রথমে যা নজরে পড়বে সে হল কতকগুলো প্রতীক চিহ্ন। রোটারি, কিউওয়ানিজ বা লায়ন্স প্রভৃতি সেবা সংগঠনের প্রতীক চিহ্ন। এদের ঘোষিত উদ্দেশ্য হল সমাজের প্রয়োজনীয় সেবা করা—পার্ক অথবা প্রয়োজনীয় প্রমোদকেন্দ্র নির্মান, শিশু অপরাধ সমস্যার সমাধান, বয় স্কাউট আন্দোলনে সাহায্য দান, যাঁরা পারেন না বিনামূল্যে তাঁদের চক্ষু চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, উচ্চ বিদ্যালয়ের ছেলেদের জন্য ইউনিফর্ম ক্রয়।

আস্তে আস্তে আবার কোথাও অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে আমেরিকাকে আধুনিক কলকারখানা, আগাগোড়া জানলা আর ষ্টেনলেশ ষ্টীল এবং একাধারে সুন্দর ও সাধারণ বাড়ী দিয়ে নতুন করে নির্মাণ করা হচ্ছে, তবুও নতুনের তুলনায় পুরাতনের সংখ্যা অনেক, অনেক বেশী। গরীবেরা যেখানে থাকে সেখানে দেখা যাবে রংচটা সেকেলে বস্তি পড়ে রয়েছে। সাধারণতঃ প্রধান রাস্তাগুলোর পাশ দিয়েই থাকে সেরা আবাসিক অঞ্চলগুলো, সেখানে থাকে গাছের ছায়া, প্রশস্ত সবুজ লন। বাড়ীগুলো রাস্তার কাছে খোলা পড়ে থাকে, দেওয়াল দিয়ে লুকিয়ে রাখা হয় না তাদের। নিজেকে দেওয়াল দিয়ে রাখাটা ঠিক "মার্কিনী" নয়। শুধু ধনীরাই ওসব করেন, তাও তাঁদের সংখ্যা খুব বেশী হবে না।

যে কোন সহর স্বভাবতঃই একটি বাণিজ্যকেন্দ্র এবং আমেরিকার মেন ষ্ট্রীটগুলো সে সব গোপন করতে কোন চেষ্টাই করে না। দোকানের সামনে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার সব রকমের চেষ্টা প্রতিফলিত হয়েছে সাইন-বোর্ডগুলোতে, রাত্রে আবার ফ্লোরেসেন্ট টিউবের লাল, নীল আর সবুজ আলোর ঔজ্জ্বল্য আর চাকচিক্য সব কিছুকে জীবন্ত করে তোলে। কয়েকটি ব্লকে কেন্দ্রীভূত এই সকল সাহায্য সংস্থা ও বাণিজ্য সংগঠনগুলোর উপর সহরগুলো যেমন নির্ভর করে, তারাও তেমনই সহরের উপর নির্ভরশীল। এই প্রতিষ্ঠানগুলো হল ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিস, টেলিফোন এক্সচেনজ, ইলেকট্রিক কোম্পানী, দমকল আর পুলিশ ফাঁড়ি আদালত, টাউন অফিস, রেল ও বাস ষ্টেশন, সিনেমা হাউস এবং খুচরো বিক্রীর দোকান। জামা-কাপড়, লোহা-লক্কর আর খাদ্যের প্রভাবই মনে হয় অধিক, অবশ্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও ড্রাই ক্লিনিংগুলোও যথেষ্ট প্রাধান্য পায়। তারপর রয়েছে সেই আমেরিকান সংস্থা—ড্রাগ হাউস যা আমেরিকার মিষ্টি দাঁতের চাহিদানুযায়ী সব রকমের আইসক্রীমই সরবরাহ করে। শুধু তাই নয়, জলখাবার, মিষ্টি, প্রসাধনী-সামগ্রী, বই, পত্র-পত্রিকা, ঘরের যাবতীয় যন্ত্রপাতি, চুরুট, সিগারেট, পুতুল, খেলনা—এমন কি ওষুধ-পত্রও!

দোকানগুলোর উপরতলায় সেই সাহায্যকারীদের আস্তানা যাদের উপর সহরকে নির্ভর করতে হয়—ডাক্তার, উকিল, ফটোগ্রাফার, ডেন্টিষ্ট, নাপিত, স্থপতি, বীমা প্রতিষ্ঠান এবং ঘরবাড়ী কেনা-বেচার এজেন্ট।

মেন ষ্ট্রীটের কাছে, অনেক সময়ে তার উপরই প্রভাব বিস্তার করেছে চার্চ, অবৈতনিক গ্রন্থাগার আর ওয়াই, এম, সি, এ, যা সহর জীবনে ধর্ম, শিক্ষাক্ষেত্রে

সমান সুযোগের অধিকার এবং আমোদ-প্রমোদের যে স্থান, তার প্রতীক-স্বরূপ।

এ সবের মধ্যে—বাণিজ্য প্রবাহের চারিদিকে উপরতলার ঘরগুলোতে আর পুরাতন বাড়ীগুলোতে রয়েছে ক্লাব আর লজগুলো। আদিম মানুষের কোন দলই আমেরিকানদের মতো প্রতীক হিসেবে জীবজন্তুর বিশেষ ব্যবহার করে নি। ওঁদের লজগুলোতে বড় হরিণ (এলক্), ঈগল, মার্কিন মৃগ (মুস) আর পেঁচাকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অধিক হারে, ক্রমশঃ বিভক্ত মার্কিন সমাজ রীতিমত গতিশীল, সেখানে ছোট-খাট, শক্তভাবে বাঁধা সামাজিক উপদলগুলোকে সযত্নে রক্ষা করা হয়। প্রকাশ্য উদ্দেশ্য ভ্রাতৃভাবে মিলে মিশে থাকা, এবং এর মধ্যে রুগ্ন ও পঙ্গুদের সুবিধাদান থাকলেও, যিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে চান তাঁর কাছে মার্কিন সমাজ নির্ভরযোগ্য বন্দরের মতো। তাঁকে এমন সুরক্ষিত স্থানে রাখা হবে যেখানে মেয়ে মহলের প্রবেশাধিকার থাকবে না। এই ভাবেই পুরুষের প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা বিশেষ অধিকারের উপর মেয়েদের হস্তক্ষেপের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হয়েছে। এ সমাজে এমন বন্ধুত্বের সুযোগও রয়েছে যাতে ব্যবসায় অথবা রাজনৈতিক রফা সম্ভব হয়।

সমাজে ব্যক্তির স্থান

ছোটখাট সহর (টাউন) অথবা নগরের (সিটি) বাসিন্দারা সেখানকার সমাজের সঙ্গে শতভাবে জড়িয়ে আছেন প্রতিনিধিমূলক উদাহরণ হিসেবে দশহাজার নাগরিক অধ্যুষিত নিউ ইংল্যাণ্ড সহরের একটি বিবাহিত মধ্যবিত্ত দম্পতির কথাই ধরা যাক্। জন একটা ইলেকট্রিক পার্টস ফ্যাক্টরীর ডিভিসনাল সুপারভাইসার। স্ত্রী মেরী আর তিনি, উভয়েই একটা ব্রীজ ক্লাবের সদস্য। এই ক্লাবের অধিবেশন বসে ক্লাবে, ওঁরা সেখানকারও সদস্য। এইসব সামাজিক উপদল মোটামুটি ভাল অবস্থাপন্নদের একটা বড় অংশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ওঁরা শুধু চার্চেই যান না, সেখানে নব দম্পতিদের যে ক্লাব আছে, তাদের সভাতেও ওঁরা হাজির থাকেন।

জনের উপরওয়ালার (বস) রোটারি ক্লাবের সদস্য হবার অধিকার থাকলেও তিনি লায়ন্স ক্লাবের সদস্য। সেবা সংগঠনগুলোরও (সার্ভিস ক্লাব) বিধি-নিষেধ আছে, তবে সহরে-সহরে তার ব্যতিক্রম হয়। স্কুল বোর্ডের সদস্য হিসেবে জন লায়ন্স-এর সদস্য এবং দেখেছেন এ তাঁর পক্ষে কাজের হয়েছে।

ক্লাবে স্কুলের সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্টের সঙ্গে তিনি কথা কইতে পারেন। অন্যেরা স্কুল সম্পর্কে কি ভাবছেন, তাও জানা যায়, স্কুল বোর্ডের সমস্যা সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করাও চলে।

অন্যান্য কাজ অথবা সদস্যপদের মধ্যে আছে : কলেজের বিদ্যার্থী পরিষদ, স্কুলের বিদ্যার্থী পরিষদ (খুব কার্যকরী নয়), একটা নাচের দল যাতে তিনি ও মেরী যোগদান করেছিলেন কারণ কয়েকটা বিকেল একসঙ্গে কাটানোর একমাত্র পন্থা ছিল অন্য কোথাও নাম লেখানো ; রড এবং গান ক্লাব (যার সভাতে তিনি কালেভদ্রে যান), চার্চের গায়কদল, কারখানার ম্যানেজারদের জাতীয় সংগঠন এবং রিপাবলিকান পার্টি, ইত্যাদি। মেরীর জীবনে যদি কিছু থাকে সে হল আরও ব্যস্ততা। গৃহস্থবধূদের একটি বিরাট অংশের ন্যায় তিনিও নিজের ঘরকন্নার কাজ নিজেই করেন, জামা-কাপড় কাঁচাও। এজন্যে তাঁর রয়েছে বৈদ্যুতিক কাপড় কাঁচার যন্ত্র, ইলেকট্রিক ওয়াশার, কাঁচা কাপড় শুকোবার জন্যে রয়েছে ড্রাইয়ার এবং ইস্ত্রি করার জন্যে ম্যাঙ্গেল ও আয়রণ)। তাঁর দিনগুলি পরিকল্পিত হয় সাধারণভাবেই। রান্নার যোগাড়-যন্ত্র করেন, সাফাইয়ের কাজে হাত দেন, তারপর সেলাই, বাগানের দেখাশোনা—এ সব অন্যান্য কাজের মধ্যে সেরে ফেলতে হয়।

তাঁর টেবিলে একটি চাঁদা তোলা অভিযানের একগাদা কাগজপত্র। এমন অনেক সংগঠনই আছে, এই অভিযানের সঙ্গেই মেরী জড়িয়ে পড়েছেন। একটা বড় রকমের কিছুতেই এবার হাত দিতে হয়েছে—কমিউনিটি চেষ্ট। বছরে একবার এঁরা আবেদন জানান সেই সব কাজে চাঁদা দেবার জন্যে যার উপর সহরবাসী একান্তই নির্ভরশীল ওয়াই এম, সি, এ, এবং (সহরটি বড় হলে ওয়াই, ডবলু, সি, এ,) বয় ও গার্ল স্কাউটস্, মানসিক ব্যাধি চিকিৎসাকেন্দ্র, পারিবারিক সাহায্যকেন্দ্র, হাসপাতাল, আশ্রয়হীন ছেলে মেয়েদের সাহায্যদান এবং আরও ডজনখানেক সংস্থা। বছরের অন্যান্য সময়েও রেডক্রশ, পঙ্গু ছেলেমেয়ে, অন্ধ, হার্ট ফাণ্ড, মার্চ অব ডাইমস এবং আরও অনেক অনেক সংস্থার ডাক আসতে পারে, প্রতিবেশীদের বাড়ীতে বাড়ীতে যাবার জন্যে। এই সব সংস্থার অনেকগুলোই চালিত হয় রাজ্যের সদর দপ্তর থেকে, তাই এখনও কমিউনিটি চেষ্ট-এর সঙ্গে মিলে যেতে পারে নি। তার পর মাঝে মাঝে আসবে বিশেষ আবেদন, যেমন স্কুলের কাফেটেরিয়ার উন্নতি-সাধন অভিযান। যুক্তি দেখিয়ে বলা যেতে পারে, সে তো স্কুল বোর্ডের

কাজ—সত্যি বলতে কি, মেরী তাঁর স্বামীকে সে কথা বলেছিলেনও। কিন্তু বোর্ডের যা বাজেট তাতে আর এদিক ওদিক হবার জো নেই। তাই মেয়েদেরই টাকা তুলতে হয়। খাবার বিক্রী, নিলাম, "শ্বেত হস্তী" বিক্রয়, ব্রীজ পার্টি, নাচ প্রভৃতি টাকা তোলার পথ। সমাজে সব সময়েই কিছু একটার জন্যে চাঁদা তোলা চলছে।

সরকার কেন এসবের দায়িত্ব নেন না? কেন ট্যাক্স তুলে এসব মিটিয়ে দেন না সরকার? কারণ আমেরিকার উপর ইতিহাসের সর্তই হল একমেবা-দ্বিতীয়ম্ এবং সর্বশক্তিমান সরকার থেকে দূরে থাক, কারণ সব কিছুর লাগাম যতটা সম্ভব ওঁরা নিজেদের হাতেই রাখতে চান এবং এখন মানুষ স্বেচ্ছায় যে কাজ করে যাচ্ছে, সরকারকে সে কাজে হাত দিতে হলে ব্যয়ের বহর ব্যয়-ক্ষমতার দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়াবে। এমন কি অধিকাংশ ছোট-খাট সহরেই দমকলের কাজ চালান স্বেচ্ছাসেবকের দল, যাঁরা সাইরেন বাজলেই কাজ ফেলে লাফিয়ে নিজেদের গাড়ীতে চেপে বসেন। "সমাজতান্ত্রিক ঔষধের" স্থলে আমেরিকায় রয়েছে স্বেচ্ছা-স্বাস্থ্য বীমা পরিকল্পনা। এগার কোটি লোক এখন এই ব্যবস্থার রক্ষাধীনে আছেন।

নিত্যকার কাজ ছাড়াও মেরীকে সব সময়েই ডাকা হচ্ছে বিশেষ সাহায্য দানের জন্যে। যেমন কোন খাদ্য বিক্রেতার জন্যে কেক, চার্চ উইমেনস্ অ্যাসোসিয়েশন (মেরি এর সদস্যা) ব্যবহৃত ভাল জামাকাপড় বিদেশে পাঠাবে, হাই স্কুলের লাইব্রেরীর জন্যে বই চাই, পার্শ্ববর্তী সহরে একদল শিশু একটি প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করবে, গাড়ী চালিয়ে তাদের পৌঁছে দিতে হবে, নিলামের জন্যে পোষ্টার তৈরী করতে হবে এবং সেগুলোকে দোকানের সামনে লাগাতে হবে, ছেলেমেয়েরা এখনও স্কুলে নাম লেখায় নি এমন মায়েদের টেলিফোন করতে হবে, যাতে তাঁদের ছেলেমেয়েরা ভাল কোন বেবী ক্লিনিকে যায়। মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি দম্পতির নাগরিক কার্যক্রম কিন্তু এখানেই শেষ নয়। সমাজের সঙ্গে অজস্র বন্ধনে তাঁরা আবদ্ধ হয়ে আছেন এবং তাঁরাও সানন্দে সে-বন্ধন মেনে নিয়েছেন। এই সব কাজ তাঁদের সময়ের উপর হস্তক্ষেপ করে এবং অবসর সময়কে সীমিত বদি করেও, সীমাবদ্ধ গণ্ডী থেকে মানুষের অহংভাবকে এই সব কাজই মুক্তি দেয় এবং নিজস্ব সত্তা ও সমাজের এই মিলনের পথে মানুষের মনকে বড় আর প্রশস্ততর করে তোলে। যে ব্যক্তি মূলতঃ এই দুজনের

উপদলের কাজের ভিতর দিয়ে সমাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, বিচ্ছিন্ন অথবা পৃথক মনে না করে নিজেকে তিনি গোটা সমাজের একটা অবিচ্ছিন্ন অংশ বলেই মনে করেন। এই সমাজের সঙ্গেই তাঁর এক এক ব্যাপারে নানান ধরনের সংযোগ রয়েছে। রোটারির ধ্বনি হল, 'ব্যক্তির ঊর্ধ্বে সেবা।" চার্চের কথা, "নিজেকে যেমন ভালবাস, তোমার প্রতিবেশীকেও তেমন ভালবাস।" এ হল দর্শনের একটা সমান্য কথা, একজন জন আর তাঁর স্ত্রী যে একথা বুঝতে পারেন, তার কারণ সমাজে দিনের পর দিন তাঁদের এ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হয়েছে।

পরস্পরের জন্য স্বেচ্ছা সাহায্য এমন ধরনের উপায় যার দ্বারা একজন সক্রিয় নাগরিক সমাজে তাঁর মর্যাদার কথা জানতে পারেন, প্রয়োজনীয় কৃতিত্ব অর্জনের সন্তোষ পেতে পারেন। এই পথেই নিরাপত্তা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভাব গড়ে ওঠে। এঁদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অথবা নিরাপত্তা নষ্ট হবার কোন ভয়ই থাকে না। সমাজ বিজ্ঞানীরা অবশ্য বহুবারই আমাদের সভ্যতার একটি প্রতীক হিসেবেই এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

এই প্রথার সবচেয়ে গুরুতর ত্রুটি হল বিরাট সংখ্যক লোক এই প্রোগ্রামের ভিতরে অংশ নিতে পারেন না, বিশেষ করে কম আয়ের মানুষেরা। এই ধরনের কাজে উপকৃত হলেও, সংগঠনগুলোর প্রশংসা এঁরা প্রায়শঃই তেমন করেন না। এর একটা কারণ খুশীমত সময় পাওয়া যায় না আর সামাজিক কাজগুলো যাঁরা করেন, তাঁরা চেনেন এবং আস্থা স্থাপন করতে পারেন এমন লোকদের কাছেই যান। স্বল্প আয়ের মানুষেরা এসব কাজের কায়দা কানুন তেমন জানেন না, নিজেদের উপর আস্থার অভাব আছে, তার উপর চাঁদা তোলার ফন্দি ফিকির জানা নেই এবং বোর্ডের সভাগুলোতেও হাজির থাকতে পারেন না। এ সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ হল এই ব্যবধান দূর না হওয়া অবধি শিক্ষার মান উন্নত করে যাওয়া।

স্বেচ্ছা সংগঠন।

পর্যবেক্ষকদের মধ্যে যাঁরা আমেরিকাকে বুঝতে চান তাঁদের সর্বাগ্রে ছোটখাট সমাজ আর তার স্বেচ্ছা সংগঠনগুলোর দিকে তাকাতে হবে।

যাঁরা বে-সরকারী নাগরিক হিসেবে থেকে যেতে এবং স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা

অক্ষুণ্ন রাখতে চান অথচ সমাজের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রাখতে ও তার উপর প্রভাব বিস্তার করতেও চান, তাদের জন্যে স্বেচ্ছা সংগঠনগুলো নির্ভুল হাতিয়ার। জেক্‌স্ বার্জুন ঠিকই বলেছেন, এ'হল নীতিমূলক দর্শনের কার্যকরী রূপ। "ঈশ্বরকে আমরা নিজের বোঝা বইতে দিই না, নিজেরাই স্কন্ধে তুলে নিই।"

এই সংগঠনগুলো বিভিন্ন সমাজ, অর্থ-নৈতিক কাঠামো, ধর্ম ও ভিন্ন জাতের মানুষের পরস্পরকে চিনবার পথও। সার্ভিস ক্লাবের লাঞ্চ, চার্চের সাপার অথবা বিভিন্ন আভিযানের ডিনারে একত্রে আহার, বাজারে আর নীলামের সময়ে টাকা-কড়ি আর কাজের বিনিময়—এই পথেই সবাই পরস্পরের আরও নিকটে এসে যান এবং গণতন্ত্র এগিয়ে যায়। সময় ও অর্থদানের কালে মানুষের মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। অংশগ্রহণকারীরা অনুভব করেন যে, যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বসবাস করেন, সেটা তাঁদের সৃষ্টি। তাঁদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার নয়, তাদের তৈরী হতে তাঁরাই সাহায্য করছেন। (অবশ্য সাংগঠনিক কাজে মানুষকে চালিত করে যে শক্তি, তা-ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেই নিহিত থাকে।) এভাবেই আমেরিকানরা মনে করতে সুরু করেন যে তাঁরা যা হয়েছেন, নিজের ইচ্ছাতেই হয়েছেন। এ হল আমেরিকানদের একটা তৃপ্তিকর ধারনা। এতে যতটা জোর দেওয়া হয়েছে, কাজ আর ফলাফলের উপর, চিন্তা-ভাবনা অথবা মনোভাবের উপর ততটা নয়।

সমগ্র সমাজে পরিব্যাপ্ত এই স্বেচ্ছামূলক সংগঠনের অভ্যাসই জাতিকে ডিকটেটরশিপের বিপদ থেকে মুক্ত রেখেছে। যে কোন ধরণের স্বৈরাচারী উপদলের বিরুদ্ধে এই হল দেশের রক্ষা কবচ। একক ব্যক্তিমাত্রেই শক্তিহীন, কিন্তু সংগঠনের সদস্য হিসেবে সকলেই শক্তিশালী। সংগঠনগুলো সংখ্যায় এত অধিক আর তাদের ঘোষিত আদর্শ এত ভিন্ন ধরণের যে তারাই নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করে, ভারসাম্য রক্ষা করে। কু ক্লুক্স্ ক্লান *-এর মত হাস্যকর অথবা বিপজ্জনক যদি এক-আধটা সংস্থা থাকেও, সমাজে রচনাত্মক আদর্শ নিয়ে গঠিত শত সহস্র সংগঠন আছে।

শ্রমিক ইউনিয়নের মত বৃত্তিমূলক, মেডিকেল সোসাইটির অথবা কৃষি-

* নিগ্রো-বিরোধী গুপ্ত সংগঠন, ১৮৬১-৫'র গৃহ যুদ্ধের পর উত্তর আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে গঠিত হয়।

সংগঠনের মত পেশাগত অথবা রোগ নিবারনী কিংবা শিক্ষা বিস্তারের জন্য সংস্কারবাদী সংগঠন যেমন আছে, ধর্মীয় অথবা জাতিগত উপদলও আছে যা বহিরাগতদের পুরাতন যুদ্ধকালীন সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। আবার এমন সংগঠনও আছে যা একসঙ্গে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে স্থায়ী করতে প্রয়াশ পায় যেমন 'ডটার্স' অব দি আমেরিকান রিভল্যুশন, কলেজের বিদ্যার্থী পরিষদ অথবা প্রবীন যুদ্ধনেতাদের সংগঠন, টটেম লজ অথবা ম্যাসনস্‌ এর প্রতীকদল এবং আনন্দদায়ক রাজনৈতিক এবং মহিলা সংগঠন।

সম্ভাব্য সকল রকমের স্বার্থ, খেয়াল, অসুখ-বিসুখ, খেলাধূলো, পেশা অথবা খাম খেয়াল ভিত্তিক সংগঠন আছে। অ্যান্টি-প্রফেনিটি লীগ হর্স্‌সু পিচার্স সোসাইটি ফর দি প্রিজারভেশন অব বারবার সপ, কোয়ারটেট সিংগিং ইত্যাদি। সযত্নে অনুধাবিত একটা আমেরিকান সহরের শতকরা একচল্লিশ জনই এক বা একাধিক সংগঠনের সদস্য ছিলেন—সমাজের শতকরা বাহাত্তর ভাগ উপর তলার সামাজিক অর্থনৈতিক গোষ্ঠী থেকে নীচের তলার শতকরা বাইশ ভাগ পর্য্যন্ত। আমরা আগেই দেখেছি একজন বিভিন্ন রকমের ভূমিকায় নামতে পারেন যার ফলে গতিশীল ব্যক্তিদের মিলিত ভূমিকা অবস্থাকে রীতিমত জটিল করে তোলে।

প্রয়োজনীয় সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে অবশ্য দেখা যায়, মেয়েরা ছেলেদের আগে আগে চলছে, কারণ কমুউনিটি চেষ্ট অথবা সোস্যাল সার্ভিস সংগঠনে সাজ-সজ্জার কঠিন কাজের অধিকাংশের দায়িত্ব নেওয়া বাদ দিলেও, ওঁদের নিজস্ব পুরাদস্তুর সব সংগঠন রয়েছে। পুরুষ ভোটারদের কোন লীগ নেই, কিন্তু মেয়ে ভোটারদের লীগ আঞ্চলিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একই সঙ্গে অদ্ভুত কাজ করে। বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ এবং জনসাধারণকে সে সব জানিয়ে দেবার দায়িত্ব নেন ওঁরা। মেয়েদের ক্লাবগুলোর ফেডারেশন (মেয়েদের ১৫,০০০ ক্লাবের সদস্য সংখ্যা হল ১১,০০০,০০০জন) গ্রন্থাগার, শিশু আদালত গঠন এবং সম্পদ সংরক্ষণ, প্রাপ্ত বয়স্কের শিক্ষা প্রভৃতি সংস্কারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে হোম ডেমনষ্ট্রেশন গ্রুপ, যাহা কৃষিদপ্তরের সহযোগীতায় গ্রামাঞ্চলে কাজ করে। এই রকম একটা কেন্দ্রে গিয়ে ফ্রান্সের জনৈকা তরুণী, মধ্যবয়সী চাষীবধুরা পরিপুষ্টি, বৈদেশিক প্রসঙ্গ এবং জাতীয় নীতি প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করছেন দেখে, বিস্মিত না হয়ে পারেন নি।

স্বেচ্ছা সাহায্যের পূর্বকথা

এই ধরণের স্বেচ্ছামূলক সেবাকার্য্যের উপস্থিতি যেমন সুস্পষ্ট, তেমনই গুরুত্ব-পূর্ণ। এর উৎস কোথায়?

১৬০৭ সালে পুরুষ আর নারীর দল ইংল্যাণ্ড থেকে হল্যাণ্ডের দিকে তীর্থ-যাত্রীর মত যাত্রা করেছিলেন, তখনই তাঁদের মধ্যে যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়, তাকে তাঁরা বলেছিলেন, "ঈশ্বরের সঙ্গে অঙ্গীকারপত্র।" তাঁরা বিশ্বাস করতেন, সত্যিকার চার্চ কেবলমাত্র সমভাবাপন্ন মানুষের স্বেচ্ছামূলক সংগঠনই হতে পারে। এ যখনকার কথা তখন ইংরেজদের রাজার ধর্মকে নিজের ধর্ম হিসেবে পালন করবার কথা এবং সেইমত ধর্মীয় আচরণে অংশ না নেয়ার অর্থই ছিল কঠোর শাস্তি।

ওঁরা যখন নেদারল্যাণ্ডস ছেড়ে আমেরিকা যাবার সংকল্প করলেন এবং নিউ-ইয়র্কের উপকূলের কাছে গিয়ে দেখলেন, তাঁদের মধ্যে কোন সরকার অথবা সরকারী কর্মচারীর অস্তিত্ব নেই, তখন আবার তাঁরা সংগঠনের দিকে মনো-নিয়োগ করলেন। জাহাজেই মেফ্লাওয়ার কমপ্যাক্ট স্বাক্ষরিত হল। এই জাহাজই তাঁদের আটলান্টিক পার করে এনেছে। সকলে স্থির করলেন, নিজেদের জন্যে যে নিয়ম-কানুন রচনা করবেন, সবাইকে তা মেনে চলতে হবে। একজন গভর্ণর নির্বাচন করা হল। তারপর চাহিদানুযায়ী নিযুক্ত হলেন কর্মচারীর দল। যে দেশের প্রতি তাঁদের আনুগত্য, তার থেকে তিন হাজার মাইল দূরে তাঁরা উল্লেখযোগ্য সাফল্যের সঙ্গে নিজেদের শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। আধুনিক গণতন্ত্র থেকে ষোল হাত দূরে ছিলেন বলতে হবে, কারণ শুধুমাত্র মনোমত ব্যক্তিদেরই তাঁরা ভোটাধিকার দিয়েছিলেন, তবুও বিজ্ঞতা আর দক্ষতার সঙ্গেই নিজেদের কাজকর্ম পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরা।

তাই সুরু থেকেই 'নিউ ইংল্যাণ্ড' সহরটির নবাগতের দল নিজস্ব স্থানীয় ব্যাপারগুলির দেখাশোনা নিজেরাই করেছেন। স্থানীয়ভাবে সরকারও ছিল স্বেচ্ছাসংগঠনের মত। স্বাভাবিকভাবেই মানুষের চাহিদা জটিল আকার ধারণ করতেই, সে সব পূরনের জন্যে অন্যান্য সংগঠন আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম এল চার্চ—নবাগতের দলে প্রায়শঃই দেখা গেছে কোন না কোন চার্চ-গোষ্ঠী ভুক্ত। যেমন বিখ্যাত টমাস হুকারের দল যাঁরা ম্যাসাচুসেট্‌স্ থেকে কনেকটিকাট-এর দিকে গিয়েছিলেন।

স্থানীয় স্বয়ংশাসিত সংস্থার উপর প্রোটেসট্যান্টদের অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান এবং সীমান্ত অঞ্চলের বিপদাশঙ্কা, ওঁদের বেঁচে থাকবার স্পৃহা আর ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির জন্যে নিজেদের বাধ্য করেছিল একসূত্রে গাঁথতে—এ থেকেই জন্ম নিয়েছে স্বেচ্ছাসংগঠনগুলো। মার্কিনী জীবনে সেই থেকে এদের মুখ্য স্থান দখলের মূলেও রয়েছে এই মনোভাব। আমেরিকানদের নিজস্ব অনেক কিছুরই চাবিকাঠি এই স্বেচ্ছা সংগঠনগুলো এবং এর মূলে রয়েছে বড়ত্ব সম্পর্কে তাদের সন্দেহ, তাদের সহজ গতিশীলতা এবং নতুন সম্পর্ক-স্থাপন রীতি।

নিউ ইংল্যাণ্ডের অথবা নিউ ইংল্যাণ্ডের ধাঁচে শিক্ষিত একটা ছোট সহরের আনুষ্ঠানিক সরকারের সঙ্গে যতটা নয়, তার থেকে অনেক বেশী সাদৃশ্য একটা স্বেচ্ছা সংগঠনের সঙ্গে। সেখানকার রাজনৈতিক বৃক্ষ থেকে তুলবার মত একটা ফুলও নেই। পর্যায়ক্রমে সকলে পদ অধিকার করেন এবং নিজ স্কন্ধে সহরের পরিচালন ব্যবস্থার দায়িত্ব নেবার জন্যে ধন্যবাদের তুলনায় সমালোচনাই পান অধিক মাত্রায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সব বিনি পয়সার চাকরী। ব্যবসায়ী অথবা চাষী, যাঁরাই জনসেবার জন্যে কোন পদ দখল করেন, কর্তব্যবুদ্ধি অথবা স্বীয় মর্যাদা বৃদ্ধির আশা নিয়েই তা করেন—রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁরা শিক্ষানবীশই।

এ দেশে সরকার সুরু হয়েছে স্থানীয় ক্ষেত্র থেকে : এই মূল্যবান তথ্যটি যেন কেউ বিস্মৃত না হন, কারণ মার্কিনী আচরণের অনেক ধাঁধারই উত্তর পাওয়া যাবে এই সত্য তথ্যের ভিতরে।

আমেরিকার ইতিহাসের প্রতিটি সঙ্কটে স্বেচ্ছা সংগঠগুলোকেই ভাগ্যনিয়ামকের ভূমিকায় দেখা গেছে। ১৭৬৫ সালে ব্রিটেন ষ্ট্যাম্প আইন চালু করতে চাইলে কলোনীগুলোর সর্বত্র মুক্তি-সন্তানের দল (সনস্ অব লিবার্টি) আত্মপ্রকাশ করে, প্রতিনিধিত্বহীন কর সংগ্রহ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্যে। ওঁরা অফিসারদের কুশপুত্তলিকা দাহ করেছেন, মুক্তি-স্তম্ভ নির্মান করেছেন অথবা মুক্তি আদর্শে উৎসর্গ করেছেন একের পর এক বৃক্ষ, ষ্ট্যাম্পের বহ্ন্যুৎসব ঘটিয়েছেন এবং ষ্ট্যাম্পমাষ্টারদের অফিসে যেতে বাধা দিয়েছেন। তাঁদের চিঠিপত্রে সংযোগ কমিটি (যার সাহায্যে সকল কলোনীতে এই আন্দোলনকে সংহতকরে তোলা হয়) বিপ্লবের পূর্ব মুহূর্তে, অনুরূপ কমিটি গঠনের অনুকূলে মূল্যবান অভিজ্ঞতা নিয়ে হাজির হল। জন অ্যাডামস এই কমিটিগুলো সম্পর্কেই বলেছেন, "সমগ্র বিপ্লবের প্রতিরূপ।" দশ বছর ধরে মুক্তি সন্তানের দল মুক্তির পক্ষে জনমত সংহত করেছেন। তাঁরা যে ভাষায় কথা বলেছেন, স্বাধীনতা ঘোষণার পরে সেই ভাষাই

স্থান পায় এবং যা না হলে স্বাধীনতার আন্দোলন সুরুই হতে পারত না, সেই ভাবাবেগে সংস্কৃতি এনে দেন।*

অপর বৃহৎ সঙ্কট দেখা দেয় ক্রীতদাসদের মুক্তি দেওয়া নিয়ে। তখনও এই পথে তার সমাধান করা হয়। অবলুপ্তি সংগঠন সমূহ কাজ দাবী করলেন এবং অত্যন্ত রোমান্টিক ও উল্লেখযোগ্য সংগঠন "আণ্ডার গ্রাউণ্ড রেলরোড" সেই কাজ করে গেলেন। গৃহযুদ্ধ বাঁধবার বহু পূর্বেই তাঁরা গোপন এবং আইন-বহির্ভূত পথে হাজার হাজার ক্রীতদাসকে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

মেয়েরাও তাদের আইনগত আর ভোটের অধিকার আদায়ের জন্যে লড়াই করেছিল এই ধরণের স্বেচ্ছা সংগঠনের মাধ্যমে। পরিমিত মদ্যপানের আন্দোলনও চলেছিল এই সংগঠনের নেতৃত্বেই। এই পথেই এসেছে প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষাদানের সেই উল্লেখযোগ্য কার্যসূচী, যা পরে লাইসিয়াম আন্দোলন হিসেবে পরিচিত হয়। এই আন্দোলনের ফলেই সমগ্র পাবলিক স্কুল ব্যবস্থা উন্নত হয়। এই পথেই এসেছে শ্রমিক আন্দোলন। জাতীয় সমৃদ্ধিতে চাষীদের ন্যায্য অংশ পাবার সংগ্রামও চলে এই পথে।

এই সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা স্বেচ্ছা সংগঠন ব্যবস্থাকে জোড়দারই করেছে, যতবার প্রযুক্ত হয়েছে, প্রতিটি ক্ষেত্রে শিল্প সভ্যতার ক্রমবর্ধমান জটিলতার সঙ্গে এই ব্যবস্থা ততটা খাপ খাইয়ে নিয়েছে।

ধর্ম এবং নীতি এই ব্যবস্থার ভিত্তিমূল। আজও এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহিলারা সমান অধিকারের জন্যে যখন লড়াই করেন কিংবা মদ্যদেবতাকে জয় করতে প্রয়াস পান অথবা ভাল বাড়ী আর বাগান চান, তখনও তাঁরা নৈতিক প্রেরণার দ্বারা চালিত হন। চাষী মজুরেরা মনে করেন, দেশের সম্পদের অধিক অংশ পাবার নৈতিক অধিকার আছে তাঁদের।

আমেরিকানদের অভ্যাসই হল খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে নীতিবোধকে এক করে দেখা; তাই সরকারকেও তারা, বলতে কি, ধর্মের উপজাত বস্তু হিসেবেই দেখেছেন। ঘোষণায় বলা হয়েছে সৃষ্টিকর্তা সকল মানুষকেই এমন কতকগুলি অধিকার দিয়েছেন যা হস্তান্তর করা চলে না। ঈশ্বরই আমেরিকানদের সকল অধিকারের

* এ সম্পর্কে আরও জানতে হলে এবং সমসাময়িক মার্কিন জীবন স্বেচ্ছা-সংগঠনসমূহের বাকী ইতিবৃত্ত জানতে হলে ব্র্যাডফোর্ড স্মিথ-এর 'এ ডেমক্র্যাটিক ড্রীডাম' পড়ুন।

উৎস, তাই তাঁদের পক্ষে ঈশ্বরের পক্ষ সমর্থন করা যেমন ধর্মীয়, তেমন রাজনৈতিক কর্তব্যও। আর নিজেদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের মধ্যেই আমেরিকানরা দেখেছেন ধর্মীয় আর রাজনৈতিক স্বাধীনতা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, কারণ নিজেদের উপাসনাপদ্ধতি অনুসরণের জন্যে তাঁরা খুসীমত পৃথক পৃথক বসতি স্থাপন করেছেন এবং এই বসতিগুলোর প্রয়োজন হয়েছে কোন না কোন ধরণের স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা।

উপাসনার স্বাধীনতার অর্থ দাঁড়িয়েছে নিজেদের শাসন করবার স্বাধীনতা। উল্টোটাও বলতে পারেন। যিনি তার নাগরিক দায়িত্ব পালন করতে চান না, তিনি নৈতিক দায়িত্ব পালনেও পরাঙ্মুখ। তুলনা করলে দেখা যাবে যিনি তার অংশটুকু পালন করেন, তিনি সকলের শ্রদ্ধাও পান। সামাজিক কার্যে অংশ গ্রহণ আগেও যেমন ছিল, এখনও সেইরকম নৈতিক সম্পদের মাপকাঠি।

তবুও আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হলেও একথা সত্যি যে, একদিকে ধর্ম আর রাজনীতি যেমন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, তখনই অপর দিকে চার্চ আর ষ্টেট (রাষ্ট্র)-কে পৃথক রাখবার দৃঢ়সংকল্প সমান্তরাল হয়ে চলছে। নেতাদের আমরা ধর্মবুদ্ধিসম্পন্ন দেখতে চাই—অর্থাৎ আমরা এমন এক ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখি যিনি মানুষকে সমান করে তৈরী করেছেন এবং যার নৈতিক আইন সমগ্র বিশ্বকে শাসন করে—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা এও চাই যে ষ্টেট এবং চার্চের পরিচালন-ব্যবস্থা তাঁরা পৃথক পৃথক ভাবে চালাবেন। আমাদের পৃথকীকরণ অভ্যাসের উৎস এখানেই। প্রতিটি কাজ অথবা চাহিদার জন্যে আমরা চাই পৃথক সংগঠন। যখনই নতুন কোন সমস্যার সম্মুখীন হই আমরা (যেমন শিশু পক্ষাঘাত, প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার, সমাজে ছন্দ ফিরিয়ে আনার প্রশ্ন), তখনই পৃথক সংগঠন করি। আমরা সবাই অনেক সংগঠনের অনেক কমিটির সদস্য। সবাই আমরা চাঁদা তুলি। এভাবে অত্যন্ত জটিল বিশ্বে অনেক পরিচালনযোগ্য সংগঠনের সদস্য হিসেবে এবং সাক্ষাৎ পরিচয় ও সম্পর্কস্থাপনের মধ্য দিয়ে সমাজের মনোভাব এবং ভাবধারাকে, সজীব রাখতে প্রয়াস পাই।

ধর্ম

বিশ্বের কোথাও ধর্মের এমন উর্বর আর স্বতস্ফূর্ত প্রকৃতি পরিস্ফুট হয়নি। অন্য কোন আধুনিক রাষ্ট্রে ধর্মকে এত কার্যকর ভূমিকায় দেখা যায়নি। এখানে

আড়াই শ'র মত ধর্মসম্প্রদায় আর ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি আছে। অনেক সম্প্রদায়ের সদস্য সংখ্যা লক্ষ লক্ষ, আবার অনেকগুলোর সামান্য সংখ্যক সদস্যই আছে। অনেকগুলো বুদ্ধিজীবি, যেমন ইউনিটারিয়ানরা, আবার অনেকে ধর্মবিশ্বাসের নিদর্শনস্বরূপ চিৎকার আর নাচানাচি করে থাকেন।

সকল গোষ্ঠী মিলিয়ে চার্চের সদস্যসংখ্যা দশ কোটির মত। আমাদের ইতিহাসে আগাগোড়াই দেখা গেছে মোট জনসংখ্যার অনুপাতে চার্চের সদস্য-সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি এই সংখ্যা পূর্বেকার সকল রেকর্ড পেরিয়ে দ্রুততালে এগিয়ে যাচ্ছে। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪ সালে চার্চে উপস্থিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে নব্বই লক্ষের মত। শ্রমিকদের তুলনায় সাধারণ লোক আর যাঁরা কলেজে লেখাপড়া শিখেছেন, তাঁদের তুলনায় যাঁরা শেখেন নি, তাঁরা অধিক হারে চার্চে যান।

কতকগুলি ধর্মসম্প্রদায় একেবারে পুরোপুরি দেশজ, যেমন মরমনস (চার্চ অব জেসাস ক্রাইষ্ট অব ল্যাটার ডে সেইন্টস্) এবং ক্রিশ্চিয়ান সায়েনটিষ্ট। অন্যদের, যেমন ব্যাপটিষ্ট ও কনগ্রিগেসানালিষ্টদের, এখানে বিশেষ ধরণের চারিত্রিক পরিবর্তন দেখা যায়। বাকী সকলে, যেমন রোমান ক্যাথলিক, লুথেরান, এপিসকোপালিয়ান এবং ইহুদীরা, তৈরী চরিত্র নিয়েই এখানে এসেছিলেন, তবে সম্প্রদায়ের মূল দলিলের উপর নির্ভর করে সকলেই নিজেদের স্বেচ্ছাসংগঠনের প্রচলিত পদ্ধতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে প্রয়াস পেয়েছেন।

ধর্ম বিশ্বাস আর ধর্মীয় আচরণের বৈচিত্র সামাজিক জীবনকে বৈচিত্রময় করে তোলে, আবার সকল ধর্ম বিশ্বাসকে সহ্য করবার ক্ষমতাও দেয়। মজার কথাই বলতে হবে, রকমারি ধর্ম বিশ্বাস থাকলেও ধর্ম অথবা ধর্মীয় আচরণ সম্পর্কিত পার্থক্যের মধ্যে আর উল্লেখ যোগ্য কিছু থাকে না। হাস্যরসের যে বিরাট ভাণ্ডার আছে সাহিত্যে তাতে প্রতিটি ধর্মের বৈশিষ্ট নিয়ে কৌতুক করা হয়েছে—(ব্যাপটিষ্টদের অবগাহনসংস্কার, ক্যাথলিকদের শুক্রবারের মাছ খাওয়া, ইহুদীদের একছেদন), ফলে ব্যবধানটুকু ব্যঙ্গের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। ধর্মীয় মত পার্থক্য নয়, কোন ধর্মসম্প্রদায় রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে প্রয়াস পাচ্ছে—এই রকম আশঙ্কা থেকেই উত্তেজনা দেখা দিতে পারে।

অনধিক সাতকোটি আমেরিকান কোন চার্চের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট নন। তাঁদের সঙ্গে চার্চের সদস্যদের মধ্যে ইউরোপে যেমন দেখা যায়, তেমন তীব্র মত পার্থক্য কিছু নেই। এঁদের অনেকেই আগে চার্চে আসতেন, এখন আর আসেন না।

অনেকেই বড় বড় সহরে থাকেন, যেখানে আয়ত্ত-সীমার মধ্যে সমাজ না থাকায় মানুষের সম্পর্কে ব্যক্তিগত ছাপ বলে কিছু থাকে না। অনেকে আবার ধর্মশিক্ষা, ধর্মীয় আচরণ অথবা 'চার্চের ধাপ্পাবাজী'র বিরোধী। আর একদল মনে করেন ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের মিলমিশ হতে পারে না—এ কথায় আবার অনেক বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন না। অনেকের মত এই রকম হাজার রকমের মুক্তির পথের মধ্যে কোনটি সঠিক তা তাঁরা বাছাই করে উঠতে পারেন না। অনেকে আবার এতদূর ব্যক্তিধর্মে বিশ্বাসী যে, কোন কিছুতে যোগদান করতে পারেন না—(মার্কিন গণতন্ত্রের এ হল এক দুঃখজনক ব্যাখ্যা)। অধিকাংশই উদাসীন—শত্রুভাবাপন্ন নন কিন্তু এসব নিয়ে মাথা ঘামাতেও চান না। নিজেদের এ সবের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলতে চান না।

জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে ধর্মকে আমরা অনুপ্রবেশ করতে দিইনি। এই ব্যাপারটা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই বহুধর্মের বিরোধমূলক প্রতিক্রিয়ার উপর জোর না দিয়ে, তাদের মিলনাত্মক প্রকৃতির উপরেই আমরা জোর দিয়েছি। "মানুষের ভ্রাতৃত্ব এবং ঈশ্বরের পিতৃত্ব"—এই ধ্বনি সকল ধর্মই মেনে নিয়েছে। ধর্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মতপার্থক্য যা আমাদের খণ্ডিত বিখণ্ডিতই করতে পারে, তার উপর জোর না দিয়ে মোদ্দা কথাকেই আমরা পছন্দ করি, যা আমাদের একসূত্রে বাঁধতে পারে। আমাদের ইতিহাসের পথই হল এই সাধারণ প্রবণতা (তেরটা পৃথক কলোনী, বিধ্বংসী গৃহযুদ্ধ, তারপর একজাতি)। ঝগড়া-বিবাদ বাদ দিয়ে সাধারণ মতৈক্যের উপরেই আমরা জোর দিই।

ফলে বাইরের দর্শকেরা প্রায়শঃই মনে করেন আমাদের চিন্তাশক্তি এবং প্রজ্ঞার কিছু অভাব আছে। সত্যি কথাটা হল এই যে, সকল চিন্তাধারা, ধর্ম আর কৃষ্টির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার নিয়ত প্রয়াস, আমাদের ছোটখাট মতপার্থক্য সম্পর্কে অসহিষ্ণু এবং বৃহত্তর সত্য ও মিলনে আগ্রহী করে তুলেছে। কোনটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ? ধর্মাচরণে মদ্য রক্তে পরিণত হয় অথবা ঈশ্বরের দাস সকল মানুষই ভাইয়ের মত ? খুব খারাপ হলে চার্চে যাওয়া আসাটা নিছক ধর্মীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সামাজিক চাপে নতি স্বীকার অথবা সামাজিক সুযোগ-সুবিধার পিছনে সেটাই বড় হয়ে দেখা দেয়, সত্যিকার ধর্মীয় প্রেরণালাভ চাপা পড়ে যায়।

অন্যান্য ব্যাপারে যেমন, ধর্মের ক্ষেত্রেও সেই রকম আমেরিকানরা ফলাফল দেখতে চায়। ধর্ম যদি মানুষকে উন্নত করে, ভাল কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে, তার

চিন্তাধারাকে উন্নত করে, চরিত্রের উন্নতি ঘটায়, তবে ধর্মকে সমর্থন করতে হবে। ধর্মকে কাজ দেখাতে হবে। জাতি, শান্তি, শৃঙ্খলা, এমন কি ব্যক্তিগত সাফল্যের দৃষ্টান্তও দেখাতে হবে। ধর্ম তা দেখায়ও।

সার্ভে থেকে দেখা গেছে বিবাহিত দম্পতিদের মধ্যে যাঁরা চার্চে যান, তাঁদের মিলেমিশে থাকবার সম্ভাবনা অধিক। যাদের কোন রকম ধর্মাসক্তি নেই, তাঁদেরই বিবাহে তিনগুণ ব্যর্থতা দেখা দেয়।

চার্চ থেকে সামাজিক সংস্কারের প্রেরণা লাভ করা যায়। এই সামাজিক সুসমাচারই সেটেলমেন্ট হাউস, সোশ্যাল সার্ভে এবং বৃত্তি হিসেবে সমাজসেবার কাজের প্রবর্তক। অন্যান্য কারণও অবশ্য ছিল। নিউ ইয়র্কের ইষ্ট হার্লে'ম-এ অবস্থিত বিরাট স্বাস্থ্য কেন্দ্র এক লক্ষ মানুষের জন্য শিক্ষা, রোগ নিরূপণ, রোগ-প্রতিরোধ আর স্বাস্থ্য সম্পর্কে যত্ন নেওয়া এবং তেইশটা সংস্থার কাজের সমন্বয় সাধনের কার্যসূচী নিয়েছে। একজন সাধারণ পর্যবেক্ষক হয়ত এর ধর্মীয় কিছু পাবেন না। কিন্তু যন্ত্রণা লাঘব এবং সমাজের জন্যে ভাল স্বাস্থ্য অটুট রাখার জন্যে মানুষের চেষ্টার নৈতিক মূল্য আছে। ধর্ম সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রয়োগিক হলেও, তাত্ত্বিক দিক থেকে নয়, নীতিবোধ অথবা নৈতিক দিক থেকেই তার বিচার হয়।

কর্মবাদে ধরেই নেওয়া হয় যে মানুষ নিজের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে এবং পরিবর্তন না ঘটানো নীতিবিরুদ্ধ। তাই ধর্মের প্রভাব আমেরিকায় মার্কিনী আশাবাদ এবং বিশুদ্ধতাকে জোড়দার করবার জন্যেই। কালভিন মতবাদের বিষাদাত্মক ভাব এবং মানবজীবনে পাপ ও বিয়োগ ব্যথার মতবাদকে বড় করে দেখাতে রীণহোল্ড নাইবুর প্রভৃতি তত্ত্ববিদ্‌দের চেষ্টা সত্ত্বেও আমেরিকার চার্চগুলো মানুষের পূর্ণতায় বিশ্বাসী সমাজ ও ব্যক্তি কল্যাণের জন্য রচিত কর্মসূচীর উপর জোর দিয়ে যাচ্ছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কি শ্রেণীবিভাগ আছে?

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে, মনে হয় প্রতিটি সমাজবিদের নিজস্ব পথ আছে। মার্গারেট মীড বলেন যে, শ্রেণীর উল্লেখ না করেই মার্কিন সমাজ-ব্যবস্থার ব্যাখ্যা করা চলে, কারণ সত্যকার কোন রকমের শ্রেণীব্যবস্থা আমেরিকায় নেই। লয়েড ওয়ারনার এবং পল লাণ্ট "ইংয়াংকি সিটি"তে ছটা শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন—সর্বোচ্চ উপরতলা থেকে সর্বনিম্ন নীচেরতলা। সাতটা

কাঠামোর সমন্বয়ে উনানব্বুইটা পদের কথাও তাঁরা বলেছেন। এই সাতটা হল পরিবার, চংক্রান্ত, সংগঠন, অর্থনৈতিক স্থিতি, স্কুল, চার্চ এবং রাজনৈতিক মতবাদ। অবশ্য প্রতিটি শ্রেণীই তার উপর আর নীচের শ্রেণীর সঙ্গে মিশে যায়। নির্দিষ্ট কোন সীমারেখা নেই এবং সে-সীমারেখার উপরে নীচে যাতায়াত চলে। তাই মার্কিন সমাজ সম্পর্কে এই রকমের ধারণা করাই ঠিক হবে সেখানে অনেকগুলো স্তর আছে যা ঘুরানো সিঁড়ির কয়েকটা কোনা মাত্র—যার উপর দিয়ে পুরুষ আর মেয়েরা অনবরত ওঠানামা আর মতের আদান-প্রদান করছে।

উচ্চ মধ্যবিত্তের দলই হল কর্মঠ শক্ত নাগরিকের দল যাঁরা সমাজকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। তাঁদের উপরে আছেন বিত্তবান অথবা উত্তরাধিকারসূত্রে সম্মানের অধিকারী মুষ্টিমেয় কয়েকজন, যারা ভাল কাজে অর্থ দেন অথবা নিজেদের নাম তার সঙ্গে জড়িত হতে দেন, কিন্তু খুব বেশী মেলামেশার মধ্যে থাকেন না। এরপর নীচের দিকে স্তরের পর স্তর রয়েছে, সবার নীচেকার স্তর সমাজ-জীবনে কোন অংশ নেয় না বললেই চলে। প্রায়শঃই ওদের কাজ থাকে না, আইনের খপ্পরে পড়ে, বিশ্রী বাড়ীতে থাকে, পারিবারিক জীবন সম্পর্কে অজ্ঞ এবং প্রায়শঃই সেদিকে কোনরকম স্থায়িত্ব থাকে না। এই অক্ষমতাগুলো পরস্পরের প্রতি বিরক্তির সৃষ্টি করে এবং এক একজনকে এক এক দৃষ্টিতে দেখবার কারণ হয়ে ওঠে। এর ফলে এদের দল সমাজ থেকে আরও দূরে চলে যায়। সিঁড়ির উপরের ধাপের উপদলগুলো নীচের তলার মানুষের অনধিকার প্রবেশে বিরক্ত হয়—এমন কি চার্চ ও স্কুলেও যেখানে খানিকটা সাম্য মেনে চলা হয়, সেখানেও অল্প সুযোগ-সুবিধার মধ্যে নীচু স্তরের ছেলেমেয়ের দল শীঘ্রই বুঝতে পারে যে, তাদের পরিবার সমাজে অপাঙক্তেয় এবং তারাও সেই দলের। এই অবস্থার প্রতিক্রিয়া থেকেই অনেক সময় শিশু অপরাধী দেখা দেয়।

সমাজব্যবস্থার সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে, সাম্য এবং মর্য্যাদার আসন, দুইই ডেমোক্রেসীর জন্যে প্রয়োজনীয়। যদিচ চরিত্রের দিক দিয়ে এ দুটো পরস্পর বিরোধী। সমান করার সকল ব্যবস্থার মধ্যে, আমাদের ধারণাগুলো নিহিত রয়েছে। তবুও উচ্চস্থান আর পদমর্য্যাদা যে এগিয়ে চলার প্রেরণা দেয়, তাই মানুষকে আরও বড় হতে সাহায্য করে। এই দুই নীতির মিলনই আমেরিকার স্বপ্ন। এ স্বপ্নের বাস্তবরূপ লিঙ্কন, যিনি সাধারণ ঘরে জন্ম নিলেও জাতির সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী হয়েছিলেন।

অধিকাংশ বিবাহ সমপর্য্যায়ের নারী ও পুরুষের মধ্যে হলেও, এর বাইরেও অনেক মিলন হয়। এভাবেই সমাজের গতিশীলতা অক্ষুন্ন থাকে। একটা সমীক্ষার ফলাফল উদ্ধৃত করছি। অর্দ্ধেকের কিছু বেশী ক্ষেত্রে দেখা গেল ছোটখাট ব্যবসায়ীরা উচ্চ আয়ের পরিবারে বিয়ে করলেও শতকরা চল্লিশ জনই বেতনভুক বাবার মেয়েকে বিয়ে করেছে। তরুন দম্পতিদের অনেক ঘোরাফেরা করতে হয় বলে তাদের পরিবারগুলোর নিজেদের পদমর্য্যাদা ঠিকমত জানা সম্ভব নয়।

নীচে আরও কতকগুলো প্রভাবের উল্লেখ করা হচ্ছে, যা শ্রেণীবিভেদ শিথিল করে অথবা দূরীভূত করে। নিম্নস্তরের পদমর্য্যাদার ক্ষতিপূরণ হয় যদি পৌর অথবা সামাজিক কাজে ভাল স্থান পাওয়া যায়। বড় বড় সহর এবং নিয়ত ঘুরে-ফিরে বেড়ানো অধিক পদমর্য্যাদা নির্দ্ধারণ অসম্ভব করে তোলে।

যে সকল খেলোয়াড়, শ্রমিক নেতা, পুরস্কারের প্রতিযোগী এবং আনন্দ-প্রদানকারীদের উচ্চহারে বেতন দেওয়া হয়, তাতে এই কথাটাই স্পষ্ট করে জানান হয়েছে সৎবংশজাত অথবা সুশিক্ষিতদের মধ্যেই সমাজ তার পুরস্কার সীমাবদ্ধ রাখতে চায়নি। আচার-ব্যবহার, জামা-কাপড়, কথা-বার্ত্তা আর প্রমোদ অনুষ্ঠানও সবাইকে সমান করবার দিকে চলে।

অনেক উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রে সমানাধিকার রয়েছে। জন-শিক্ষা, আমোদ-প্রমোদের সুযোগসুবিধে, ভোট, সামরিক বিভাগে চাকরী, জুরী হিসেবে কাজ করা, সরকারী পদে বসবার অধিকার, বিপদের সময় পুলিশের সাহায্য নেওয়া, আইন—এই সব ব্যাপারে।

এই সব কারণে মার্কস যে শ্রেণী সংঘর্ষের কল্পনা করেছিলেন, আমেরিকায় তা নেই বললেই চলে। ম্যানেজার অথবা উপরওয়ালার বিরুদ্ধে শ্রমিকেরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে পারে; উন্নতির কোন পথ খোলা না থাকলে বর্ত্তমান চাকরীতে তাঁরা নিরাশ হয়ে উঠতে পারেন। দারিদ্র্যের জন্যে তিক্ততা, বেকারত্ব, আপত্তি-কর কাজ অথবা পারিবারিক জীবনের অনিশ্চিয়তা সমাজ-চিত্রেরই একটা অংশ এবং অধিকার আর সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বহুৎ ব্যবধানও আছে। তবুও অচল অটল শ্রেণী কাঠামো বলে কিছুই নেই।

তাহলেও মার্কিন সমাজ নিগ্রোদের সমান অধিকারের আশ্বাস দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। নিগ্রোদের উপর খারাপ ব্যবহার, দক্ষিণ আমেরিকায় জিম ক্রোইজম-এর অভ্যুদয় না হওয়া অবধি আফ্রিকানরা নিজেরাই নিজেদের ক্রীতদাস

হিসেবে বিক্রী করেছে এবং তারপর কিভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্বের উদ্ভব হল, সে সব দুনিয়ার কোথাও আর অজানা নেই। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে ওঁদের যে বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে, তা কারও চোখে পড়ে না। যেমন : শতকরা সাতানব্বুই ভাগের অধিক নিরক্ষর ছিল ১৮৬০ সালে, ১৯৫২'র অক্ষরজ্ঞান-হীনের হার শতকরা দশভাগেরও কম। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যত জার্মান আছে, তার চেয়ে অধিক সংখ্যক নিগ্রো আছে মার্কিন মুল্লুকের বিশ্ব-বিদ্যালয়-গুলীতে (১২৮,০০)। ২১৬,০০০,০০০, রাশিয়ান এবং অফ্রিকার ১১৩,০০০,০০০ নিগ্রোদের তুলনায় আমেরিকায় নিগ্রোদের মোটরগাড়ীর সংখ্যা অধিক। সশস্ত্র বাহিনীতে আর কোন ব্যবধানই নেই। ১৯৪০ থেকে নিগ্রোদের বেতন শতকরা চারশত ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। তুলনায় শেতাঙ্গদের বেড়েছে শতকরা আড়াইশ' ভাগ। ১৯৩০ থেকে কলেজগুলোতে নিগ্রোদের সংখ্যা শতকরা আড়াই হাজার বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯০০ সাল থেকে শেতাঙ্গদের তুলনায় নিগ্রোদের কলেজে যাবার গতি, শেতাঙ্গদের তুলনায় ছ' গুণ বেড়েছে। সুপ্রীম কোর্ট পাবলিক স্কুলগুলোতে সকল রকমের ব্যবধান আর যানবাহনগুলোতে পৃথক আসনের ব্যবস্থা তুলে ফেলবার ব্যবস্থা করেছেন। প্রায় দু'লক্ষ নিগ্রো গড়ে আটাত্তর একরের খামারের মালিক। ১৯০০ সালে শতকরা একজন নিগ্রো শিল্পে কাজ করত। এখনকার হার শতকরা তিরিশ ভাগের উপরে — ১,৫০০,০০০ জন। জাতীয় ইউনিয়নগুলোর ১৬,০০০,০০০, জন সদস্যের মধ্যে ১,২৫০,০০০ জন নিগ্রো।

তিরানব্বুইটি সিটি কমিশন এবং বে-সরকারী সংস্থা বর্ণ সম্পর্কের উন্নতি বিধানের কাজ করছে, এদের অর্থ আসে সংগৃহীত ট্যাক্স থেকে।

দক্ষিণ আমেরিকার শেতাঙ্গদের ভোটে সিটি কাউন্সিলের দায়িত্বপূর্ণ পদগুলোতে নিগ্রোরা নির্বাচিত হয়েছেন। আইনসভা এবং কংগ্রেসেও তাঁরা বসেন। রাষ্ট্রসংঘের আণ্ডার সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করছেন র‍্যালফ-বান্চ। বিভাগীয় বিপণি, টেলিফোন কোম্পানী, ফেডারেল সরকার প্রভৃতি অনেক সংস্থার কর্তৃপক্ষই কোনরকম ব্যবধান না রেখে নিগ্রোদের কাজ দেন। মারিয়ান অ্যাণ্ডারসন এবং লুই আর্মষ্ট্রং-এর মতো শিল্পী ও আমোদ-প্রমোদ শিল্পীরা জাতীয়জীবনের অনেক কিছুই যুগিয়ে চলেছেন এবং দুনিয়ার সর্বত্র তাঁরা সুপরিচিত। নিগ্রো ভোট তাচ্ছিল্য করলে, কোন জাতীয় দলের পক্ষেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা সম্ভব নয়।

কুসংস্কার একটা ব্যাধি এবং দুনিয়ার সর্বত্রই তা আছে। এর মূল রয়েছে সেই আদিম যুগে যখন মানুষের ধারনা ছিল আগন্তুকের দল ছোঁয়াচে রোগ নিয়ে আসে এবং সমাজের পক্ষে তারা রীতিমত বিপজ্জনক। সকল আগন্তুককে এক করে আমেরিকাকে গড়ে তোলা সত্যিই একটা কৃতিত্ব এবং অত্যন্ত সুস্পষ্ট ব্যবধানকে মানুষের অন্তর্নিহিত শত্রুভাবের উৎস হিসেবে দেখা অত্যন্ত সহজ হলেও, শোচনীয়; সাফল্য, সম্মান আর বন্ধুত্ব অর্জনের ব্যর্থতার পর মানুষকে এই শত্রুভাবে পেয়ে বসে।

এই সর্বজনীন মনোবিকারের বলি হতে হয়েছে নিগ্রোদের। তবে সম্প্রতি যন্ত্র থেকে উদ্ভূত সম্পদ আর কলকারখানায় স্বাভাবিক গণতন্ত্র থেকে তাঁরা উপকৃত হচ্ছেন। দুই বিশ্বযুদ্ধের পর নিগ্রোদের পাইকারী হারে উত্তর আমেরিকায় (১৯১০ থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যে তিরিশ লক্ষ) যাওয়ার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। দক্ষিণাঞ্চলের বহু বিলম্বিত ধারাবাহিক শিল্পায়নও নিশ্চয়ই প্রতিক্রিয়াযুক্ত হবে না।

ইতিমধ্যেই দক্ষিণাঞ্চলের অনেক নিগ্রো পদমর্যাদার দিক দিয়ে শ্বেতাঙ্গ-দের উপরে উঠে গেছেন। বর্ণ সম্পর্কের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হতে পারে নিগ্রোদের ভিতরে একটি উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব। শিক্ষিত, অবস্থাপন্ন এঁদের উপস্থিতিই আগেকার নিগ্রোদের অজ্ঞ, উচ্চাশাহীন চিত্রকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। সমান অধিকারের ক্রমবর্ধমান সংগ্রামের বিচক্ষণ নেতৃত্ব এ রাই দিতে পারেন।

সাধু সমাজ

সমাজে সরকার এবং আইনের স্থান সম্পর্কে লিখবার মত জায়গা আর খুব বেশী নেই। সম্ভবতঃ অধিকাংশ স্থানীয় সরকারী সংগঠনের ঐচ্ছিক দিকটা দেখানোর জন্যে ইতিমধ্যেই অনেককিছু বলা হয়েছে। শিক্ষানবীশের দল বিনা বেতনে অথবা সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এই সকল সংগঠনের কাজ করে থাকেন। ব্যক্তিবিশেষের উপর কর্তৃত্বভার না দিয়ে প্রায়শঃই বোর্ডের উপর ক্ষমতা অর্পণের সিদ্ধান্ত করা হয়। কখনও বা গোটা সমাজকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়। যেমন নিউ ইংল্যাণ্ড। এখানে টাউনের সভায় সব কিছু স্থির হয়। এই ভাবে ক্ষমতা দিতে অনিচ্ছার কারণ হল এই যে তাতে এক-জনের অত্যধিক ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে পড়ার বিপদ থাকে। আবার কাজটাও

এমন বিরাট আকার ধারণ করে যে সাধারণ নাগরিকের পক্ষে অবসর সময়ে তা করে ওঠা আর সম্ভব হয় না।' পঁচিশ হাজার মানুষের কোন নগরীর মেয়রও পার্ট টাইম অফিসার। অফিস চলাকালে তাঁর সাক্ষাৎ পেতে হলে আসতে হবে তাঁর ড্রাগ ষ্টোর্স অথবা ইনস্যুরেন্স অফিসে।

স্থানীয় সংগঠনের সংখ্যা ১১৭,০০০-এর মতো হবে। এর অর্ধেকের বেশী জেলাগুলিতে কাজ করে। এর থেকে সহজেই বোঝা যায় যে এখানকার মানুষেরা হোম রুলের উপর অর্থাৎ নিজেদের দ্বারা শাসিত হবার উপর যথেষ্ট মূল্য আরোপ করে।

পাঁচ হাজারের অনধিক অনেক সমাজেই স্থানীয় পুলিশ আদৌ নেই। প্রয়োজনও হয় না। সমাজের আকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই অপরাধ নিবারণ এবং শাস্তি বিধানের সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করে। সকলে সকলকে চেনে যে সমাজে, সেখানকার সমাজের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সঙ্গে নৈর্বক্তিক সমাজের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার তুলনা করা যায় না। নিঃসঙ্গতা, মর্যাদার আসন এবং স্বীকৃতির অভাব, অপরাধে উৎসাহ যোগায়। অপরিসর ঘরবাড়ী, উদাসীন মা-বাবা, নোংরা আবর্জনা, আর অসুখ-বিসুখ অপরাধ সৃষ্টি করে। বস্তি উচ্ছেদ এবং জীবনধারনের মান উন্নয়ন সবচেয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। আর একটা উপায় হল পরিবার উপদেষ্টা সংগঠনের প্রয়োগ এবং বিপদ আসবার আগেই তাকে প্রতিহত করা। আরও একটা উপায় হল স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন যা বন্ধুভাবে সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিতের সেবা করে।

মার্কিন জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য প্রতীক হল নিজের সহরটি। প্রায়শঃই এই সহরটি আপনি যেখানে বসবাস করেন সেটা নয় (বিশেষ করে আপনি যদি বড় সহরে থাকেন); যেখান থেকে আপনি এসেছেন, সেই সহরটি বাসস্থানের চেয়ে অনেক বেশী, এ যেন একটা প্রতীক যা একটা পরিবারের মতোই। সেখানকার নেতারা বহু সংগঠনের জটিল পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাবা-ভাই আর লালন-পালন ও সমগোত্রীয় ভাব, "সামাজিক ভাব" এবং স্থানীয় গঠন অক্ষুণ্ণ রাখার ক্ষেত্রে মায়েদের প্রতিনিধিত্ব করেন।

নিছক ভাবমূলক নয়, সমাজ সজীব কিছু। ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদার মধ্যে সমাজই সামঞ্জস্য বিধান করে, উপদলের উর্দ্ধে ব্যক্তিকে তুলে ধরাই তার কাজ। নরদেহ-বিজ্ঞানী (অ্যানথ্রপলজিষ্ট) র‍্যালাফ লিনটন তাই বলেছেন, "জীবন একটা সমাজকেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত। এ সমাজ বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিগত সংযোগসৃষ্টির

পক্ষে যথেষ্ট বড় আবার অধিকাংশ সদস্যের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের দিক দিয়ে খুবই ছোট। অধিকাংশ মানুষের কাছে এই সব চেয়ে সুখী জীবন।"

অধিকাংশ আমেরিকানের উপর একথা অবশ্যই প্রযোজ্য। আবেগ আর কর্ত্তব্যের শক্তবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে তারা পরিবার, চার্চ, সহর, বিদ্যার্থী সংগঠন, প্রতিবেশী, পেশা অথবা অফিসের গোষ্ঠী, সামাজিক ক্লাব, রাষ্ট্র, অঞ্চল এবং জাতির সঙ্গে।

তাঁদের ধারণা গণতান্ত্রিক সমাজের উপযোগী এই সমন্বয়ের সুর ঐক্য নয়, বৈচিত্র থেকেই আসে। আসে সংগঠনের নানাত্ববাদ আর নিজেদের আইনে চালিত বহু কেন্দ্রের নিজেদের মধ্যে গড়ে তোলা শ্রমবিভাগ থেকে। এমন একটা ব্যবস্থার উত্তেজনা, সংঘাত, মতপার্থক্য, বিরোধ—এসব এসে পড়বেই। তবে এ ব্যবস্থা গতিশীল। নিয়ত গতির ফলে এ ব্যবস্থা পেশীমান, প্রতিটি চাপ সম্পর্কে সংবেদনশীল, পরিবর্তনের প্রয়োজন সম্পর্কে সজীব, আত্মনিয়ন্ত্রিত এবং এমন কি—সংগঠনের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে—আত্মবলুপ্তির পথ বেছে নেয়।

সরকারের জন্যে অপেক্ষা করে না, বরং এ সকল সংগঠন নিজেদের সংগঠন থেকেই শক্তি আহরণ করে। বস্তি, আমেরিকার সহরের পক্ষে সর্ব্বনাশা? অ্যাক্সন—অর্থাৎ কাজ—নামে এক সংগঠন গড়ে তোলা হল (আমেরিকান কমিটি টু ইমপ্রুভ আওয়ার নেবারহুড)। শিশু-অপরাধ সমস্যা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে? সমাজের ধর্ম, সমাজ, আমোদ-প্রমোদ এবং শিক্ষা সম্পর্কিত সম্পদ একত্র করে, বহুসংগঠনের সদস্যের বৈঠক আহুত হয়—তারপর কার্যসূচী প্রকাশ করা হয়।

সামাজিক ভাব, মানুষের কোন দলের সদস্য হবার প্রেরণা আমেরিকান স্বত্তার অত্যন্ত গভীরে রয়েছে; এর মূল রয়েছে তার ব্যক্তিস্বত্তা আর ইতিহাসের মূলে। স্থানীয় সমাজের জটিল সংগঠন সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা না হলে কারও পক্ষেই যুক্তরাষ্ট্রকে সহজে জানা সম্ভব নয়।

শিক্ষা

আমেরিকার অনেক আচরণ আর সংগঠনের মতো স্কুলসমূহের উৎসও ধর্ম। গভর্ণর বাকলে, সপ্তদশ শতাব্দীতে ভার্জিনিয়ায় একটি পাবলিক স্কুলও নেই, যা বিপজ্জনক বিদ্যা বিতরণ করে যুবকদের বিপথে চালিত করতে পারে ব'লে গর্ব করলেও, সেই ১৬৪৭ সালেই নিউ ইংল্যাণ্ড এই পাবলিক স্কুলগুলোকেই বাধ্যতা-মূলক করে দিয়েছে বদমেজাজি স্যাটানের ধূর্ততাকে হারিয়ে দেবার জন্যে আর চার্চের জন্যে একদল শিক্ষিত পাদ্রী তুলে ধরার জন্যে। নতুন সহর পত্তনের জন্যে অনুদান দেবার সময়ে, নিউ ইংল্যাণ্ড আর সেখান থেকে পশ্চিমাঞ্চল অবধি অনেক জমিই সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল স্কুলগুলোর খরচ চালানোর জন্যে। সাবেকী স্কুলগুলো প্রায়:শই স্থূল ধরণের ছিল। পড়ান হত শুধু ভাষার মূল কথা আর অঙ্ক, এবং বছরের কয়েকটা মাস মাত্র খোলা থাকত। তবে সেখান থেকেই এই নীতি স্বীকৃতি পেয়েছে যে শিক্ষিত হবার অধিকার সকলেরই আছে। আর সেখান থেকেই উৎপত্তি ঘটেছে সার্বজনীন জনশিক্ষার প্রথম ব্যবস্থা। (গণগ্রন্থাগার এবং মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও আমেরিকাই প্রথম)।

সুসংস্কৃত ইউরোপের বঞ্চিতের দলের শিক্ষা আর সংস্কৃতির বুভুক্ষাই, তাদের আমেরিকায় টেনে এনেছিল। তাদের দীর্ঘ দিনের দারিদ্র মার্কিন সমাজের, বিশেষ করে সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থার উপর বোঝা স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ইউরোপীয়েরা আমাদের যে গণসংস্কৃতির কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উপর দোষারোপ করে, তার মূল এখানেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার ক্ষেত্রে পৃথক কোন ব্যবস্থা নেই। ফেডারেল সরকারের শিক্ষার উপর কোন কর্তৃত্ব নেই। আমাদের ডেমোক্রেসীর সবচেয়ে শক্তিশালী এই অঙ্গের কোন উপরওয়ালা নেই, শিক্ষাজগতের নেতাদের নেতৃত্ব দেবার মত কোন কাউন্সিল নেই, সর্বত্র স্বীকৃত কোন পাঠ্যসূচী অথবা শিক্ষক-দের স্বীকৃতি-পত্র দেবার কোন ব্যবস্থাও নেই, স্নাতকদের কৃতিত্ব পরিমাপের সাধারণ কোন মানও নেই। বৈচিত্র্য সবচেয়ে ঈপ্সিত মূল্যবান বস্তু। প্রতিটি স্থানীয় স্কুল জেলা, প্রতিটি ছোট কলেজ এবং বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের গন্তব্য

স্কুল স্থির করার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এখানেও নানাত্ববাদ এবং স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় হল বোঝাপড়ার চাবিকাঠি।

শিক্ষার গুরুত্ব এবং কার্যকারীতায় বিশ্বাসই হল মার্কিন পদ্ধতির কেন্দ্রবিন্দু। এখন স্কুলে যাওয়া সুরু হয় তিন বছর কিংবা আরও অল্প বয়েস থেকে আর শেষ হয় জীবনের শেষ লক্ষ্য সম্পর্কিত প্রাপ্ত শিক্ষার পর্যায়ে, যাতে জীবনের শেষ অধ্যায়ে যাঁরা পৌঁছেছেন, তাদের জন্যে অনেক অনেক পাঠ্যসূচী থাকে।

স্কুল ও বাড়ী

আজকের শিক্ষা ব্যবস্থার সজীবতার একটা বড় উদাহরণ হল স্কুলের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের আগ্রহ। এই আগ্রহ প্রায়শঃই কঠোর সমালোচনায় এবং উৎসাহব্যঞ্জক মতপার্থক্যের রূপ নেয়। একদল দাবী করেন, ডেমোক্রেসীতে কি ভাবে থাকতে হবে, স্কুলগুলিতে অবশ্যই তা শেখান হবে। অপর পক্ষ বলেন, নির্বোধ, ওসব শেখান যায় না। ওদের মূল কথাগুলো জানিয়ে দাও। জানিয়ে দাও কি করে পড়তে আর চিন্তা করতে হয়।

মা-বাবার দল মনে করেন, স্কুলের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু দোষত্রুটী রয়ে গেছে; শিক্ষকের দল সহজে না হলেও, সমাজের অসন্তুষ্টির কথা জানতে পারেন। ফলে সুরু হয় অবিচ্ছিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তার মধ্যে বিচক্ষণতা যেমন থাকে, নির্বুদ্ধিতাও তেমনই থাকে। স্কুলপ্রথাকে আমরা নিরন্তর নির্মাণ আর পুনর্নিমাণ করে চলেছি, যা অনেক কাছে এসে গেলেও, গতিশীল সমাজের চাহিদা কখনই মেটাতে পারে না।

শিক্ষা সম্পর্কে মতপার্থক্যের কারণগুলোর অনেকগুলিই টেকনিকাল ধরনের, যেমন ভাল করে পড়ানো কি করে সবচেয়ে ভাল করে শেখানো যায়। অন্যান্য কারণের মূলে রয়েছে সংস্কৃতি ক্ষেত্রের মৌলিক মতবিরোধ। যেমন ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও চার্চের লোকজন, এবং মেয়েদের ক্লাব, বয়স্কদের সংগঠন এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংগঠনগুলো, তাঁদের প্রায়শঃ পরস্পর-বিরোধী মতবাদকে স্কুলের পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত করতে চান। এই ধরণের টানা-হেঁচড়া নানাত্ববাদী গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার একটি অবশ্যম্ভাবী অংশ। সমাজে ভূমিকা নির্ধারণে তরুণ মন তৈরীর প্রমাণিত যন্ত্র হিসেবে শিক্ষাকে সকলেই দেখেন, তাই মতবাদ নির্ধারক সকল শক্তির দৃষ্টিই থাকে স্কুলের উপর। সম্প্রতি শক্তিশালী নিউ ইয়র্ক ষ্টক এক্সচেনজ ব্যালকনী বালকসুলভ উচ্চ কলরোলে সচকিত হয়ে উঠেছিল।

তখন আর-সি এ'র উপর ডাকাডাকি চলছে। চিৎকার করছিল এগার বছর বয়েসের ক্লাসের ছাত্ররা, যারা স্কুলে ষ্টক মার্কেট সম্পর্কে পড়াশুনা করেছে। ছেলের দল তাদের পেনিগুলো একত্র করে আর. সি. এ.-র একটা শেয়ার চেয়ে বসল!

চারিপাশের সামাজিক চাপের তুলনায় শিক্ষকেরা কিছুটা উদার মনোভাবাপন্ন হয়ে থাকেন, তাই সমাজের বাকী অংশের সঙ্গে স্কুলের একটা নিদারুণ উত্তেজনার ভাব থেকে যাওয়া অনিবার্য। সামনে দিগন্ত নিয়ত প্রশস্ত হতে দেখছেন বলেই শিক্ষকেরা তাঁদের ভূমিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন, সেই জন্যেই তাঁরা তরুণদের ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব আর অবসর, আগামী যুগের উপযোগী করে তুলবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, সেই জন্যেই স্থিতাবস্থার অবধারকদের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ বাধে।

আমেরিকানদের শিক্ষার ক্ষমতা সম্পর্কে গভীর এবং বল্‌তে গেলে, প্রায় অযৌক্তিক আস্থা আছে, আবার বুদ্ধিবাদী জীবন নিয়ে ব্যঙ্গও করা হয়। অধ্যাপকদের বলা হয় বড় বড় চুলওয়ালা অন্যমনস্ক অধ্যাপক। এই মনোভাবের সঙ্গে শিক্ষকদের লড়াই করে চলতে হয়। একই সঙ্গে শ্রদ্ধা আর অবজ্ঞা সম্ভব কি করে? অতি-নৈষ্টিক এবং বহিরাগতদের ঐতিহ্য থেকে আসে শ্রদ্ধা আর অবজ্ঞা আসে আত্ম-প্রত্যয়ী সিদ্ধান্ত অঞ্চল থেকে যেখানে শুধুমাত্র বাস্তবকেই মূল্য দেওয়া হয়।

শ্রেণীগত শ্রেষ্ঠত্বের সকল চিহ্নের বিরুদ্ধেই আমেরিকানদের সংগ্রাম। শিক্ষিত ব্যক্তিকে যাঁরা তাঁর বিদ্যাবত্তার জন্যে শ্রদ্ধা করেন, তাঁদের আশঙ্কা তিনি হয়ত সর্বপ্রধান হয়ে যেতে পারেন অথবা তাঁর বিদ্যাবত্তা অল্প-শিক্ষিতদের কঠোর পরিশ্রমলব্ধ মর্যাদার আসন হয়ত টলিয়ে দিতে পারে, নয়তো তার উদ্ভট ভাবধারা হয়ত অধিকতর ট্যাক্স কিংবা অন্যান্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। মা-বাবারা শিক্ষকের প্রভাবে আপত্তি জানান, কারণ ছেলেমেয়েরা মা-বাবার অনুমোদিত নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে যেতে হলে, তাঁদের নাম উল্লেখ করে। মা-বাবার আচরণ অথবা ব্যাকরণ সংশোধনের সময়েও শিক্ষকদের নাম করে তারা। যে দিন মা তাঁর সন্তানকে শিক্ষকের হাতে তুলে দেন তাকে ছাত্র হিসেবে মানুষ করবার জন্যে, সেদিন তিনি যেমন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন, ঠিক সেই রকমই এই ভেবে চিন্তিত হন যে, তাঁর সন্তান বুঝতে পারবে শিক্ষক সকল বিষয়ে অধিক খবরাখবর রাখেন। প্রায়শঃই বাড়ীতে যা পায় নি, ছেলে মেয়েরা স্কুলে শিক্ষকের মধ্যে তাই পেয়ে যায় এবং সে জন্যেই ভয়ের কারণ প্রমাণিত হয়।

এর থেকেও খারাপ কথা এই যে ছেলেমেয়েরা যখন কলেজে প্রবেশ করে, কিংবা আরও আগে তারা চার্চে যাওয়া বন্ধ করে, ধূমপান ও মগুপান সুরু করে এবং অধিক রাত অবধি বাড়ীর বাইরে থাকে—বড় হবার এই সব লক্ষণের জন্যেই দোষারোপ করা হয় শিক্ষকদের।

মা-বাবারা ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠান সেই ভবিষ্যতের জন্যে তাদের তৈরী করবার জন্যে, মার্কিন জীবন যার জন্যে সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকে। তাই দুই অথবা আরও অধিক পুরুষের বিভাজক শক্তির প্রতীক হয়ে ওঠে স্কুলগুলি। এই শক্তি বস্তুতঃপক্ষে উদ্ভুত প্রগতি আর গতির ধারণা থেকে, যা সংস্কৃতির ভিত্তিমূল। যেটুকু করা সম্ভব, স্কুলগুলির কাছ থেকে তার থেকে অনেক বেশী আশা করা হয় এবং পরিবারের দায়িত্বগুলো যতটা না স্কুলের উপর ছেড়ে দেওয়া হয় (যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভব্যতা, নার্সিং শিক্ষা), তার চেয়ে বেশী মা বাবার দল নিজেদের দায়িত্ব ত্যাগের জন্যে আর এই ত্যাগের ফলে স্বস্তি পেয়েছেন তার জন্যে নিজেদের অপরাধী মনে করেন। তারপর এই অপরাধ প্রক্ষিপ্ত হয় শিক্ষকের উপর এবং তাঁর নিন্দা হয়।

সমাজে শিক্ষকের ভূমিকা সম্পর্কেও একটা দোটানা মনোভাব থেকে যায়। অধিকাংশ পিতা-মাতার চেয়ে তাঁদের কঠোর জীবন পালন করতে হবে, অথচ তার জন্যে প্রয়োজনানুযায়ী তাঁর পদমর্যাদা বাড়ান হবে না। ধরে নেওয়া হয় যে তিনি সকলকে সমান চোখে দেখবেন, অথচ উচ্চ মর্য্যাদাসম্পন্ন পরিবার আশা করেন তাঁদের ছেলেমেয়েদের উপর বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দেওয়া হবে প্রায়শঃই পেয়েও থাকে), অপর দিকে যাঁদের সুযোগ-সুবিধা কম, তাঁদের ছেলেমেয়েরা বুঝতে অথবা জানতেও পারে না যে তারা নিজেদের অবাঞ্ছিত মনে করছে। শিক্ষকদের সমর্থনেও অবশ্য বলতে হবে যে, অনেকে এই ধরনের ব্যবধান যাতে না করা হয়, তার জন্যে বিশেষ ভাবে কষ্ট করেছেন। যাদের আশা ও প্রেরণা দিয়েছেন, তারা সারাজীবন এঁদের স্মরণ করে।

সকল শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের একত্র করে বলেই স্কুল, সমাজের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক শক্তি। এঁরা পরস্পর পরস্পরকে মেনে নেয়, কখনও বা সামাজিক কিংবা অর্থ নৈতিক মর্যাদার কথা ভুলে গভীর বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং নিজেদের প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের যা কিছু ভিত্তি হতে পারে তার সঙ্গে চলতে অভ্যস্থ হয়। খেলাধূলো আর পড়াশোনা সমান করে তোলা ব্যাপারে একটি বড় হাতিয়ার। স্কুলে মেধাবী অথবা কর্মঠ ছেলেমেয়েরা তাদের অন্যান্য

ছাত্র-ছাত্রীদের, পরিবারের পদমর্য্যাদায় যাদের স্থান অনেক উঁচুতে তাদের পেরিয়ে যাবার সুযোগ পায় স্কুলে।

গণতন্ত্র ও শিক্ষা

যেদিন থেকে নীল রংয়ের ছোট সাটিনের জামা অথবা আনকোরা ইস্ত্রী করা পোষাক পরিয়ে বাচ্চাদের নার্শারি স্কুলে নিয়ে যাওয়া হয়, সেদিন থেকে যত দিন না তারা আঠার বছর পরে কলেজ ডিপ্লোমা পাওয়া সেই প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে শত শত মানুষের মুখ দেখতে না পারছে, ততদিন স্কুলই তাদের জীবনের সব চেয়ে বড় সত্য, পরিবারের পরেই তার স্থান। শিক্ষকের প্রভাব এমন গভীর ভাবে অঙ্কিত হয় যে, অনেক বছর পরেও তারা মনে রেখে দেয় স্কুল শিক্ষকের চেহারা, তার চালচলন, সহৃদয়তা অথবা তাঁর অধৈর্যের কথা।

যে বিষয়গুলোর জন্যে ছেলেমেয়েদের সাধারণতঃ পাঠান হয়, তা ছাড়াও স্কুলে তারা পরস্পরের প্রতি কেমন ব্যবহার করতে হয় তা শিখতে পায়। নার্শারি স্কুলের ছেলেমেয়েদের শেখানো হয় যে, তারা অন্যের খেলনা জোর করে কেড়ে নিতে পারে না, অথবা নিজের ক্ষতি না করে বদমেজাজী হতে পারবে না। স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক কি তাও তাদের শেখান হয়। তারা জানতে পারে যে মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনার অধিকারী (অবশ্য আগের চেয়ে কম), কোমল এবং অল্পে ভেঙ্গে পড়ে। তবুও খেলাধূলো আর ক্লাসের কাজে ছেলেদের হারিয়ে দিতে পারে। মেয়েদের যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তা হয়ত আরও কঠোর, কারণ সাফল্যকে কখনই যেন তারা এত এগিয়ে নিয়ে না যায়, যাতে পুরুষের দল অনেক পিছনে পড়ে থাকে। তাহলে জৈবিক প্রয়োজনীয়তায় তাদের যা করণীয় আছে, তা আর করা হবে না।

আস্তে আস্তে অধিক মাত্রায় দলবদ্ধ কাজ আর খেলার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে স্কুলগুলো বুঝেসুঝেই শিক্ষা দিচ্ছে, একদা যে প্রতিদ্বন্দ্বীতার মনোভাব এত প্রাধান্য পেয়েছিল, তাকে এখন অনেক ছোট করে দেখা হয়। বানান প্রতিযোগীতার স্থলে এখন এসেছে "প্রজেক্ট" ব্যবস্থা। ছাত্রদের একসঙ্গে কাজ করতে উৎসাহ দেওয়া হয়। যেমন ধরুন, আফ্রিকা সম্পর্কে। তারা ছবি আঁকবে, মানচিত্র আঁকবে, খেলবে, বিষয়টি সম্পর্কে গল্প করবে। শিক্ষক এখন আর ছড়ি হাতে গুরুমশাই নন, ওদের চালিয়ে নেন না, নেতৃত্ব করেন। যাই হোক না শিক্ষার এই হল আক্ষরিক অর্থ—জ্ঞানবৃদ্ধি করা। তার সঙ্গে পরিকল্পনার কাজে

শিক্ষক ছেলেদের নেতৃত্ব করেন। আলোচনা, কি পড়া হবে, কোথায় এবং কবে হবে সে সম্পর্কে আলোচনা,—এসব ব্যাপারেও তাঁদের নেতৃত্ব দিতে হয়।

এখন সকলেই জানেন যে, প্রগতিশীল শিক্ষার দার্শনিক উৎস হলেন ভেরমণ্ট-এর জন ডিউই (১৮৫৯-১৯৫২)। পল্লীজীবনের সহযোগীতামূলক, সম্প্রদায়-ভিত্তিক, কাজ করে শেখার পদ্ধতি তাঁর মনে ছিল এবং যে কার্যকারীতার সঙ্গে এই পদ্ধতি শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি প্রয়োগ করেন, তাতে গোটা দুনিয়াই প্রভাবিত হয়। ডিউই দেখেছিলেন, স্কুল পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতিক্ষেত্র নয়, মানুষের জীবনের কেন্দ্রস্থল। স্কুলের মধ্যেই গোটা সমাজ সংক্ষিপ্তাকারে প্রতিবিম্বিত হয়। তাই ছাত্রদের কিছু মুখস্ত করবার চেয়ে কাজ করতে উৎসাহিত করতে হবে বেশী। তাহলেই শেখার ব্যাপারে তাঁরা নিজেরা সক্রিয় অংশ নেবে। এবং ফল এই হবে যে, অভিজ্ঞতার দৌলতেই তারা ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে নিজেদের তৈরী করবে। হাতে কাজ করে তারা শিখবে।

স্কুল আর ক্লাসরুমের মধ্যে আবদ্ধ নেই। দমকল বা পোষ্ট অফিসে অথবা প্রাকৃতিক পরিবেশের ভিতরে নিয়ে যাওয়া এবং যে পৃথিবীতে ছাত্র-ছাত্রীরা বসবাস করে তার বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন—এসব এখন শিক্ষাদান পদ্ধতির অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্বোপরি, বিষয়টি নয়, ছাত্রই এখন বিবেচনার কেন্দ্রস্থল। তার চাহিদা মেটান এবং গণতন্ত্রে তার ভূমিকা প্রস্তুত করা এখন স্কুলেরই কাজ—লেখাপড়া আর অঙ্ক কষায় বাধাধরা কয়েক ঘণ্টা ব্যয় করার দিন আর নেই।

ছেলে বড় হবে, কিন্তু পাঠ্যসূচীর পরিবর্তে তার উপর গুরুত্ব আরোপ করার এই সুব্যবস্থা শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা অতটা বড় নন তাঁদের হাতে পড়ে বিকৃত রূপ নেয় এবং প্রগতিশীল শিক্ষার নামমাত্র প্রধানের অধীনে অর্থহীন অনেক কিছুই সংগৃহীত হতে থাকে। কিন্তু বাড়াবাড়িগুলো ডিউই'র শিক্ষা সম্পর্কিত মত বাদ থেকে বাদ দিয়ে, নিয়ত প্রগতিশীল গণতন্ত্র উপলব্ধির ব্যাপারে তাঁকে মুক্তিযজ্ঞের এক বিরাট শক্তি হিসেবে মেনে নিতেই হয়।

প্রমাণিত হয়েছে যে তরুণদের মধ্যে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সম্পর্কের অভাবের সঙ্গে অপরাধ, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, আত্ম অহঙ্কার এবং অর্থ-নৈতিক প্রতিযোগীতা সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। বিপক্ষে আরও শক্তিশালী কিছু না থাকলে, স্কুলের গণতন্ত্রীকরণ সুন্দর সমাজ জীবনের সূচনাই করে থাকে।

শিক্ষা ব্যবস্থাকে ডিউই সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে দেখেছেন এবং সেদিক দিয়ে তার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, চিন্তা করার কাজটা মূলত সমস্যা পূরণ এবং তার সমাধানের কাজ। তাই ছেলে-মেয়েদের সেই সব সমস্যার উত্তর বার করতে উৎসাহ দিতে হবে যা তাদের কাছে অর্থপূর্ণ। যেমন, তারা যদি প্রশ্ন করে সহরে কি করে জল সরবরাহ করা হয়, প্রগতিশীল শিক্ষক কয়েকটা কথায় তার জবাব না দিয়ে ছেলেদের কাছে জানতে চাইবেন জলসরবরাহ ব্যবস্থা দেখবার জন্যে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে তারা রাজী কিনা। তারা রাজী হলে পরিকল্পনা করা হবে যার সুরুতে হয়ত থাকবে সহরের জলাধারার এবং জলসরবরাহ কেন্দ্রে গমন এবং হয়ত তার মধ্যে আর্দ্রতা'ও ঘনীকরণ সম্পর্কে পরীক্ষা, আবহাওয়া এবং বৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে চর্চা, জলের ব্যবহার এবং সংরক্ষণ সম্পর্কে গাণিতিক পরিগণনা, বৃষ্টি, নদী ও হ্রদ সম্পর্কে কবিতা পাঠ, পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য নদী ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা প্রভৃতিও থাকবে। চলচ্চিত্র, ছবির বই, স্লাইড, মানচিত্র—এই সবের সাহায্যও নেওয়া হবে।

এভাবেই শিশু জানতে পারবে কি করে সমস্যা সমাধান করতে হয়, কি করে অধিক প্রশ্ন করতে হয় এবং নিজের থেকে তার জবাব পেতে হয়। পুরাতন ব্যবস্থার মধ্যে এই কথাটাই যেন নিহিত ছিল যে, শিক্ষক যে প্রশ্নই করুন না কেন, তার একটা "সঠিক" জবাব থাকবেই।

নতুন ব্যবস্থা এ কথাটাও স্বীকার করে নিয়েছে যে কখনও কখনও কোন সঠিক জবাবই থাকে না। সমস্যার সঙ্গে বিহার করতে শিখতে হবে, জোয়ার-ভাটা জয়ের আশা থাকলেও, তরঙ্গ আর জলাবর্তের সঙ্গে লড়াই করে যেতে হবে।

পাবলিক স্কুলে এই সবও চেষ্টা করা হয়।

বিনোদন ও সৃজনে যাতে আগ্রহ হয়, সেজন্যে ছেলেদের উৎসাহিত করা হয়।

নিজের ক্ষমতা ও শক্তি অনুযায়ী ছেলেদের এগিয়ে যেতে দেওয়া হয়; শিশুর স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়, কোন রকমের অভাব অথবা প্রয়োজন থাকলে তৎপ্রতি অভিভাবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং মা-বাবা উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে না পারলে সাহায্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়।

খেলাধূলো, ব্যায়াম এবং সত্যকার স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিক্ষিত করে ছেলের শরীর গঠনের দিকে জোর দেওয়া হয়।

প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে শিশুকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

গণতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা এবং আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়। বিশেষ করে মার্কিন ধাঁচের গণতন্ত্র ;

এমন সমাজ-চেতনা জাগরূক করা হয় যা বড় হবার পরও থেকে যায়, যা সমাজের জন্য নিঃস্বার্থ, সদর্থক এবং স্বেচ্ছামূলক কাজের জন্যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে।

শিল্প ও কৃষি কার্যের জন্য যে কারিগরী দক্ষতার দরকার হয়, তার ব্যবস্থা করে ;

প্রতিটি ছাত্র এবং তার প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়।

স্কুলকে সমাজের অংশে এবং সমাজজীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে।

মা-বাবাদের অধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য বুঝতে সাহায্য করে।

তারপর পড়ানো, পড়া, লেখা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, কলা, ভাষা প্রভৃতি এত বিষয়বস্তু রয়ে গেছে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই, স্কুলগুলো তাদের গন্তব্যস্থল অবধি যেতে পারে না।

স্কুল পরিচালনা

অন্য কোন সমাজই শিক্ষার জন্যে এত অর্থ আর শক্তি ব্যয় করে নি। মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ এই শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট।

তিন কোটি সত্তর লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী ১৬৫,০০০ এর অধিক স্কুলে পড়াশোনা করে। শিক্ষকের সংখ্যা দশ লক্ষের অধিক এবং ব্যয়ের বহর নব্বুই কোটি ডলারের মত। জন সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গেই শুধু ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না, বৃদ্ধির অন্যতম কারণ অধিক সংখ্যায় ছেলেরা হাই স্কুল, কলেজ, আর গ্রাজুয়েট স্কুলে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চৌদ্দ থেকে সতের বছরের ছেলেমেয়েদের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ হাই স্কুলে যায়, যা অন্য কোথাও এখনও সম্ভব হয় নি। হাই স্কুলের গ্রাজুয়েটদের শতকরা চল্লিশ জন উচ্চশিক্ষা নিতে বেরিয়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ষোল বছর অবধি এখানে শিক্ষা বাধ্যতামূলক। শিক্ষার ব্যয় রাষ্ট্রই বহন করে।

প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের শতকরা বার জনের মতো বে-সরকারী স্কুলে যায়, যার অনেকগুলোই চার্চের পরিচালনাধীন। তবুও, হাই স্কুলের মাধ্যমে মার্কিন শিক্ষাপদ্ধতি মুখ্যত রাষ্ট্রায়ত্ত। কি করে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় এই শিক্ষা ব্যবস্থা ?

না, ফেডারেল সরকার নিয়ন্ত্রণ করেন না। এই ব্যাপক প্রয়াসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে জাতীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলে কিছু নেই। মার্কিন শিক্ষা-দপ্তর স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কল্যাণ দপ্তরের একটি অংশমাত্র এবং তার কাজ রাজ্য-সমূহের নিকট ফেডারেল সরকারের শিক্ষা সম্পর্কিত অনুদান পৌঁছাইয়া দেওয়া ও শিক্ষা সম্পর্কে গবেষণামূলক কার্যসূচী গ্রহণ। জন শিক্ষার জন্য যে অর্থ ব্যয়িত হয় ফেডারেল সরকার তার চার ভাগেরও কম যুগিয়ে থাকেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চাশটি পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা আছে (কলামরিয়া জেলা ধরলে একান্নটি,) কারণ সংবিধানে শিক্ষার প্রশ্নটি রাজ্যের "অথবা জনগণের" উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আরও সঠিক বলতে গেলে বলতে হয়, যুক্তরাষ্ট্রের ষাট হাজার স্কুল ব্যবস্থা আছে—আনুমানিক এতগুলি স্কুল জেলাই আছে। রাজ্যগুলির নানান ধরণের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকলেও অনেক ক্ষমতাই থাকে অভিভাবকের (এবং অন্যান্য ভোটারদের) হাতে, যাঁরা স্কুল বোর্ড নির্বাচিত করেন। স্কুলের জন্যে কত ট্যাক্স দিতে হবে তাও এঁদের ভোটেই নির্ধারিত হয়। এঁরাই অভিভাবক-শিক্ষক সংস্থা পরিচালনা করেন, যা বাড়ী আর বিদ্যায়াতনের বিরোধে সামঞ্জস্য বিধান করেন এবং হিসেবী করদাতারা প্রয়োজনীয় যে টাকাটার জন্যে ভোট দিতে রাজী হন না, তা সংগ্রহ করেন। গড়ে স্কুল তহবিলের শতকরা ষাটভাগ স্থানীয় ট্যাক্স থেকে আসে, বাকী চল্লিশভাগ আসে সংশ্লিষ্ট রাজ্য থেকে যা আয়কর এবং পেট্রোল, মদ এবং অন্যান্য ট্যাক্স থেকে আয়েব বছর বৃদ্ধি করে। এই চল্লিশ ভাগ এ রাজ্যের শিক্ষাদপ্তরকে যে সুযোগ করে দেয়, তা থেকে তাঁরা স্থানীয় স্কুল বোর্ডগুলোকে পরিচালনা করতে পারেন, তাহলেও অধিকাংশ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাই যথেষ্ঠ বিকেন্দ্রীভূত, যার ফলে সকল ক্ষেত্রেই সমাজ নিজেই তার নিজস্ব চাহিদা নিরূপন করতে পারে। সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় সদস্য-দের নিয়েই গঠিত হয় স্থানীয় স্কুল বোর্ডগুলো। পল্লীঅঞ্চলের স্বাভাবিক প্রবণতা চাষীকে নির্বাচন করার দিকে, সহরাঞ্চল নির্বাচন করতে চায় ব্যবসায়ী আর বিভিন্ন পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এবং, সাম্প্রতিককালে অধিক হারে, শ্রমিক-প্রতিনিধিদের। মেয়েরা প্রায়শঃই নির্বাচিত হয়ে থাকেন। বোর্ডে সমাজের মনোভাব প্রতিবিম্বিত হয়, তাই অধিক সুযোগ-সুবিধার জন্যে ট্যাক্স বৃদ্ধি অথবা নতুন স্কুল বাড়ী নির্মাণের ব্যাপারে খুব উৎসাহী নাও হতে পারেন। কিন্তু যেহেতু সমাজের প্রতি তাঁদের একটা কর্তব্য আছে, তাই বুদ্ধি করে

স্বেচ্ছামূলক কাজ করে যেতে পারলে নতুন ভবনের অথবা শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির দিকে জনগণের ভাবাবেগ আকৃষ্ট হতে পারে।

রাজ্যের শিক্ষা কমিশনার বোর্ডকে এটা-ওটা করতে নির্দেশ না দিয়ে প্রায়শঃই মিষ্টি কথায় উচিত পথে চালিত করতে প্রয়াস পান। কিন্তু রুটিন মাফিক কাজ অথবা শিক্ষকদের ট্রেনিং অথবা যথাযথভাবে চালিত করার কাজে রাজ্য কর্তৃক নিযুক্ত কোন সুপারভাইজার হাত দিতে চাইলে বোর্ড খুশীই হন।

যুক্তি দেখিয়ে বলা যেতে পারে স্থানীয় বোর্ডকে এত ক্ষমতা দিলে আধুনিক শিক্ষা ব্যহত হয়। কিন্তু স্থানীয় স্কুল বোর্ডের ঐতিহ্য সেই সময়কার, যখন কোন রকম জাতি গঠিত হয় নি এবং নিজেদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা নির্ধারণে সমাজের অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছিল। আজও এই আমাদের ঈপ্সিত লক্ষ্য। "সঠিক" শিক্ষা ব্যবস্থা কি—যেখানে কমিশনার পড়েছেন সেই শিক্ষকদের ট্রেনিং কলেজের নির্ধারিত ব্যবস্থা, অথবা সমাজ তার এবং তার ছেলেমেয়েদের চাহিদা অনুযায়ী যাকে উপযোগী মনে করে সেটা ?

যে কমিটিতে পাঠ্যসূচী এবং স্কুলের অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হয়, মা-বাবারা সেখানে যেতে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যাপারে তাদের সাহায্য করতে এখন উৎসাহ বোধ করেন। বিভিন্ন সমাজের ক্ষেত্রে উত্তরটাও বিভিন্ন ধরণের হবে। নিউ ইয়র্কের স্কারসডেলের অধিকাংশ ছেলেমেয়েই কলেজে যায়, সেখানকার হাই স্কুলগুলোতে কলেজে যাবার উপযোগী পাঠ্যসূচীর উপর অবশ্যই জোর দেওয়া হবে। পল্লীঅঞ্চলের অধিকাংশ ছেলে চাষবাসে ফিরে যাবে—তাই সেখানকার ছেলেদের কৃষি-বিজ্ঞানের মূলকথা ও বর্তমান দুনিয়া সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান, এবং মেয়েদের পুষ্টি, শিশু পালন আর গার্হস্থ্য বিদ্যা সম্পর্কে কিছু ধারণা দিলেই চলবে।

বৃত্তি শিক্ষা

বাস্তববাদী আমেরিকানরা অনেক দিন থেকেই বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর জোর দিয়ে আসছে। একদা কলেজে যার প্রস্তুতি-ক্ষেত্র ছিল, হাই স্কুলগুলাতেই এখন কাষ্ঠ ও ধাতব শিল্পের বিভিন্ন চালু শিল্প, ষ্টেনোগ্রাফী, বুক কীপিং, সাংবাদিকতা, গার্হস্থ্য, অর্থনীতি ও কৃষি সম্পর্কে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা আছে। ফেডারেল সরকারের সাহায্যপুষ্ট বৃত্তিশিক্ষা হাই স্কুলের মাধ্যমে দেওয়া হয়ে থাকে। চৌদ্দ বছরের উপরে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যারা নির্দিষ্ট কোন পর্যায়ে উঠেছে অথবা কাজ সুরু করেছে তারা এই ব্যবস্থার আওতায় পড়ে।

কৃষি বিষয় নিয়ে অধ্যয়নরত একটি ছেলে তার বাড়ীর খামারের সার্ভে করল তার উৎপাদনক্ষমতা নির্ধারণের জন্যে, তারপর যে শস্য উৎপন্ন হতে পারে বাজারে তার চাহিদা থাকতে পারে কি না তা বিশ্লেষণ করে দেখল, তারপর শূকরের দিকে দৃষ্টি দিল এবং পরপর চার বছর প্রতি বছরে একটন ওজনের শূকর শিশুর ব্যবস্থা করল—ছ' মাস পরে যার ওজন দুহাজার পাউণ্ডের মত হয়। অতঃপর সে শস্য কাটায় মন দিল, পরে খামার আর বাজারের চাহিদা মত অন্য কাজ। সবশেষে সে নিজের জন্যে জমি কিনল এবং অংশীদার হিসেবে বাবার সঙ্গে ব্যবসা সুরু করল।

জাতীয় সংস্থা হিসেবে সংগঠিত ফিউচার ফারমার্স অব আমেরিকা (আগামী দিনের মার্কিন চাষী) এই রকম সর্বক্ষণের কৃষি ছাত্রদের স্বল্পব্যয় এবং জনসেবার অভ্যাস আয়ত্ত করতে শেখায়, যা তাদের ভবিষ্যতে গ্রামীন সমাজের নেতা হতে সাহায্য করতে পারে।

মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়া সমস্যার, আংশিক সমাধানের সূত্র রয়েছে বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে। দুনিয়ার যে কোন দেশের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের স্কুলগুলোতে ছাত্র উপস্থিতির হার অনেক বেশী হলেও ছেলেদের সিকিভাগই স্কুলে যায় না। এর কারণ হল হীন মনোভাব এবং ক্লাসে উপস্থিত হওয়া ব্যাপারে সাদামাঠা নিয়মকানুন। অনেকেই মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দেয় কারণ পড়তে পড়তে তাদের ক্লান্তি এসে যায়। স্বাধীনতা, নতুন জামা-কাপড়, মোটরগাড়ী প্রভৃতি আর সাপ্তাহিক বেতনের লোভ এর অন্য কারণ।

সাফল্যের সোপানগুলি উন্মুক্ত রাখার জন্যে এখন যে সব চেষ্টা করা হয়, তার মধ্যে রয়েছে সহায়ক কার্য্যসূচী (গাইডেন্স প্রোগাম) যা নিম্ন আয়ের সমাজের মেধাবী শিশুদের স্কুলে থেকে যেতে উৎসাহিত করে; কর্মরতদের জন্যে তৈরী করে শিক্ষাদান পরিকল্পনা, যা শ্রমিককে তার কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ দেয়। কোম্পানীতে এই রকম একটা ব্যবস্থা থাকাতেই শুধু শ্রমিকেরা নিশ্চিত ধরে নেয় যে, এই অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা তার আশা আকাঙ্খার পরিপন্থী নয়।

উচ্চ শিক্ষা

পাবলিক স্কুলগুলো বহুলাংশে আত্ম-শাসিত হলেও রাজ্যসমূহের শিক্ষা দপ্তর, শিক্ষকদের কলেজ এবং স্থানীয় স্তর থেকে জাতীয় স্তর অবধি অন্তহীন সম্মেলনের প্রভাবে পড়েই। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়

এবং প্রতিটি পল্লীর কলেজ নিজের রুচি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ উদ্ভাবন করে ও তাকে সাজিয়ে নেয়। ভাল ছেলে পাবার জন্যে নিয়ত এদের মধ্যে যে প্রতিযোগীতা হয় তার জন্যে সব সময়েই পাঠ্যসূচী পরিবর্তিত এবং শিক্ষার নতুন নীতি উদ্ভাবিত হয়। অতিরিক্ত কিছু করবার প্রতিশ্রুতি থাকে অথবা কোন বৈশিষ্টের উল্লেখ থাকে যা প্রতিযোগীদের মধ্যে একটি সংস্থাকে অন্যতম করে তোলে। একটি কলেজ পাণ্ডিত্য অর্জ্জনের মোক্ষম রাস্তা হিসেবে তার পাঠ্যসূচীতে প্রাচীন গ্রন্থের একটি তালিকাকে স্থান দেয়, অপরটি চাকুরীর সময়-কাল বুঝে শিক্ষার সময়-কাল নির্দ্ধারণ করে। আবার এমন সংগঠনও আছে যাদের প্রসিদ্ধির একমাত্র কারণ হল তাদের ফুটবল টিম।

আমেরিকান ধরণের কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয় বলে কিছু নেই। মার্কিন মুল্লুকে উচ্চ শিক্ষার প্রায় দুই হাজারটি কেন্দ্র আছে এবং কোন দুটিই এক ধরণের নয়। এই কেন্দ্রগুলিতে ৩,০০০,০০০ ছাত্র-ছাত্রী আছে। প্রেসিডেন্ট-এর কমিশনের ধারণা মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের নৈতিক অথবা বৃত্তি-মূলক শিক্ষাগ্রহণের মানসিক ক্ষমতা আছে। এই কমিশন ১৯৬০ সালে ৪,৬০০,০০০ জন ছাত্র-ছাত্রী হাই স্কুলের সীমা অতিক্রম করবে স্থির করেছেন। তবুও এখন কলেজের ছাত্র সংখ্যার দিক দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান সকলের উপরে। এখানে গ্রাজুয়েটদের প্রতি চার জনের মধ্যে একজন উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন। ইউরোপে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে কলেজের ছাত্রদের কুড়ি জনের মধ্যে মাত্র একজন।

বিদেশে প্রায়শঃই মনে করা হলেও, এমন ধারণা করা ভুল হবে যে দু'তিনটে বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম আর সকলের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। আকারে বৃহৎ, বিভিন্ন রাজ্যে ও অঞ্চলে বিভক্ত, এবং বৈচিত্রে বিশ্বাসী বলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহু শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। অনেক সময়েই দেখা যাবে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে কোন গ্রামীন কলেজে, যা সহর থেকে শত যোজন দূরে। সাম্প্রতিক এক সার্ভে থেকে জানা গেছে যে, প্রথম শ্রেণীর পঞ্চাশটি বিজ্ঞান বিষয়ক বিদ্যায়তনের উনচল্লিশটি ছোটখাট কলেজ এবং দেশের উচ্চপদস্থ কর্মচারীকুলের শতকরা অষ্টাশী ভাগ কলেজ গ্রাজুয়েট, যাঁদের শতকরা একাত্তর জন আসেন ছোটখাট কলেজ থেকে।

রিফরমিষ্ট স্কুলের অনেকগুলোই স্বাভাবিকভাবে বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত—যেমন জন হপকিন্স যাঁরা সর্বপ্রথম ইউরোপীয় চিন্তাধারানুযায়ী

গ্রাজুয়েট শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন, স্বোয়ার্থমোর, যেখানে ইংরেজীতে অনার্স ব্যবস্থা মার্কিন রীতিতে চালু হয়, অ্যান্টিওক, যেখানে ক্লাসের কাজের সঙ্গে সঙ্গে এমন কাজ দেওয়া হয় যাতে উপার্জন হয় এবং বেনিংটন ও সারা লরেন্স, যেখানে জন ডিউই'র শিক্ষাদর্শ সর্বপ্রথম কলেজ-স্তরে পৌঁছে দেওয়া হয়।

শিক্ষায়তনসমূহের তিন ভাগের দুই ভাগই বে-সরকারী, প্রধানতঃ চলে দান এবং অনুদানের দৌলতে। বাকীগুলো রাজ্য অথবা সহর পরিচালিত শিক্ষা-য়তন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংগৃহীত কর দিয়ে চলে, তাই স্বল্প বেতনের জন্য অধিক ছাত্র-ছাত্রী আকৃষ্ট হয়। অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান ব্যয়-বাহুল্যের জন্যে বে-সরকারী শিক্ষায়তনসমূহকে নিয়ত বেতনের হার বৃদ্ধি করে যেতে হচ্ছে। কয়েকটা শিক্ষায়তন যেমন কর্ণেল অথবা সরাকিউস আধা-সরকারী এবং আধা-বেসরকারী। কতকগুলো শিক্ষায়তন একটি মাত্র ক্ষেত্রের জন্যে উৎসর্গীকৃত হলেও অধিকাংশেরই ঝোঁক সকল রকমের শিক্ষা দানের দিকে। কোন আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ই দর্শন, আইন, চিকিৎসা এবং পুরাতত্ত্বের সঙ্গে পশু চিকিৎসা স্কুল এবং নার্সেস ট্রেণিং স্কুল থাকাটাকে অদ্ভুত কিছু বলে মনে করে না। সকল রকমের পেশার জন্যে একই ধরণের সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে, মার্কিন শিক্ষায়তনগুলি সকলের জন্যে সমান সামাজিক সিঁড়ির ব্যবস্থা করতে সাহায্য করে। ধরে নেওয়া হয় যে এই সিঁড়িতে সকল নাগরিকেরই উঠবার অধিকার আছে।

অন্য যে কোন সমাজের ন্যায় এখানকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহও সর্বাধিক প্রভাবশালী সামাজিক ও অর্থ নৈতিক দলের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে। দানের উপর নির্ভরশীল বে-সরকারী কলেজগুলোকে এমন বোর্ড নির্বাচন করতে হয় যা দান সংগ্রহ করতে পারে। রাজ্য পরিচালিত শিক্ষায়তনসমূহকে শক্তিশালী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করতে হয়। উভয় পক্ষকেই তাদের স্নাতকদের উপর নির্ভর করতে হয়—যে নির্ভরতা ফুটবল ও অন্যান্য প্রতিযোগীতা-মূলক খেলাধূলোর কার্যক্রম থেকে উদ্ভুত ভাবাবেগ থেকে আসে।

আমেরিকার আণ্ডার গ্রাজুয়েট পাঠ্যসূচীর মূল কথা সংক্ষেপে এই: লেকচারের বদলে প্রত্যেককে আলাদাভাবে শিক্ষাদান এবং দলীয় আলোচনার উপর অধিক গুরুত্ব দান; জটিল জগতে প্রাপ্ত বয়স্ক জীবনে ছাত্রদের তৈরী করবার আগ্রহ—এ জন্যে তাদের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় যাতে তারা অর্থনীতি, সরকার এবং আন্তর্জাতিক দুনিয়া সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানলাভ করতে পারে; আর্ট এবং

সূক্ষ্ম জীবনে আর্টের স্থান সম্পর্কে অধিক গুরুত্ব দান ; ছাত্র-ছাত্রীদের চাকরী, মাতৃত্ব এবং শিশু পালনের উপযোগী করে তোলা।

এই বৈচিত্রময় ব্যবস্থাকে একত্র করবার জন্যে জনৈক অজ্ঞাতনামা প্রতিভা পয়েন্টপ্রথার প্রবর্তন করেন। সপ্তাহে এক ঘণ্টা ক্লাশের কাজের কৃতিত্বের জন্য প্রতিবার একটি পয়েন্ট অথবা কৃতিত্ব দেওয়া হয় ; তিন ঘণ্টার পাঁচটি কোর্সের জন্যে প্রতিবার পনর পয়েন্ট, গ্রাজুয়েটদের জন্যে ১২০ পয়েন্ট। একেবারে সোজা ব্যাপার। এভাবে গাণিতিক পদ্ধতিতে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে হারভার্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যা বিষয়ক কোর্স পডাঙ্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে-এর উল সংগ্রহ বিষয়ক কোর্সের সমান এবং প্রয়োজন অথবা খেয়াল-খুসী মত এখানকার ছেলেরা ওখানে আর ওখানকার ছেলেরা এখানে ট্রান্সফার নিতে পারে।

বাস্তবে এই ধরনের সমান সমান ভাবে কেউই বিশ্বাস করেন নি, তবুও কাগজ-কলমের কাজ অনেক সহজ হয়ে গেছে এবং অনেকের মুখরক্ষা হয়েছে। কোন ছাত্র এক শিক্ষায়তন থেকে আর এক শিক্ষায়তনে যেতে পারে, এমন কি নতুন শিক্ষায়তন গর্বভরে অন্য শিক্ষায়তনের দেওয়া কৃতিত্বের ছাপ অস্বীকার করলেও এবং নিজের মান অনুযায়ী অপরের মেধার পরিচায়ক প্রতীক চিহ্নগুলো (খুব ভাল—ক, ভাল—খ, মন্দ নয়—গ ; দেখতে হবে অর্থাৎ উল্লেখিত বিষয়ে কৃতিত্ব মেনে নেবার আগে পরীক্ষা দরকার—ঘ, অকৃতকার্য— 'ঙ' অথবা 'চ') বারবার মানতে অস্বীকার করলেও। কোন ছেলে বারবার 'ঘ' অথবা 'ঙ' কি 'চ' পেলে তাকে পড়ার মান উন্নত করার জন্য গ্রীষ্মকালীন স্কুলে পাঠান যেতে পারে। এই রকম ছেলে অথবা যে সকল শিক্ষক পরবর্তী স্তরে উন্নীত হতে চান কিংবা যে সব ছেলে চার বছরের বদলে তিন বছরে কলেজী শিক্ষা শেষ করতে চায় তাদের জন্যে প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই গ্রীষ্মকালীন স্কুল রয়েচে।

শিক্ষকেরা ছাত্রদের চালনা এবং পরিচালনা করেন ; তাঁরা বাদে থাকেন একদল বিশেষজ্ঞ, ছাত্রদের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি দেওয়াই যাঁদের কাজ। নিশ্চিত করে বলা যায় যে মধ্যযুগের কোন রাজপুত্রেরও এখানকার নীচুস্তরের আণ্ডার গ্রাজুয়েটদের ন্যায় এত বিশেষজ্ঞের দ্বারা নিজেদের পড়াশোনা সম্ভব হয় নি। সর্বপ্রথম রয়েছেন ডীন। গোটা কলেজেরই পিতার ন্যায়, একাধারে কঠোরতা ও কোমলতার আদর্শ প্রতিমূর্তি তিনি। ছেলের দল যখন এমন কোন নষ্টামি করে, গোটা সহর চটে যায় (ছোট কলেজ জীবনের একটি

অপরিহার্য অঙ্গ হল টাউন ও গাউনের সংঘষ,) ডীন যথোচিত শাস্তির ব্যবস্থা করেন। তবুও অপরাধীদের ভয় দেখিয়ে নষ্টামির কথাগুলো বার করে তিনি শেষ পর্যন্ত কঠোর শাস্তি দেন না, এবং এমন কি. কঠোর ভাবে তিরস্কার করার সময়েও ছেলেদের বুঝিয়ে দেন যে, তিনিও এককালে বালক ছিলেন, সহরের চেয়েও তিনি বয়ঃবৃদ্ধ এবং এই ঘটনা ভবিষ্যৎ-জীবনে তাদের হাসির খোরাক যোগাবে। ছেলেরাও ডীনকে ভালবেসেই চলে যায়, বুঝতেও পারে না যে, এই অসদাচারণের মধ্য দিয়ে তারা ঈপ্সিত আদর্শ পিতার সন্ধান পেয়েছে, পূর্ণতা পাবার জন্যে যাঁর বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ করতে হয়।

ম্যানেজাররা যেমন শিল্পকে করায়ত্ত করেছে সেই রকম ব্যবস্থাপকদের বিপ্লব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও এসেছে। উৎপাদক ও ক্রেতা এবং শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে রয়েছেন একদল বিশেষজ্ঞ, ছাত্রদের মুক্তির জন্যে যাঁদের সহায়তা অপরিহার্য মনে করা হয়। সম্ভবতঃ কথাটা সত্যি। একদা যে অভিজ্ঞতা হয়ত এতটা প্রত্যক্ষ না হলেও, অত্যন্ত সহজ সরল ছিল, আজ বহুভাগে বিভক্ত হয়ে তাঁদের আওতায় এসেছে।

মার্কিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র সম্পর্কে বলা যায় যে, কলেজের ভূমিকা সর্বত্র অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং হয়ত বিপজ্জনকও। আদর্শের দিক দিয়ে নিখুঁত হলেও, দুর্দ্দমনীয় মনুষ্য উপকরণ নিয়েই একে চলতে হয়। যুগ যুগ ধরে শিক্ষকের দল সেই অতি প্রাচীন আদর্শ যার 'শরীর সুস্থ তার মনও সুস্থ' এর পুনরুক্তি করে যাচ্ছেন খেলাধূলো আর প্রতিযোগীতামূলক স্পোর্টস-এর যুক্তি হিসেবে। কিন্তু এখন সুস্থদেহের পক্ষে আরও অনেক অবলম্বনের দরকার হয়ে পড়েছে। তার মধ্যে রয়েছে ব্যয়বহুল ক্লিনিক, যার জন্যে দরকার ডাক্তার ও নার্স এবং 'ইন্‌ফার-মারী.' যেখানে এমন শিশুব্যাধির চিকিৎসা হতে পারে কলেজে প্রবেশের পরে যা দেখা দেয়। এখন পুরুষ ও মেয়ে অথবা দিন রাত্রের মত মন আর দেহকে পৃথক ভাববার অবকাশ নেই। তাই হাতেকাছে কোন মানসিক ব্যাধি চিকিৎসক থাকা চাই। সামাজিক কার্যক্রমেরও দরকার আবার ছেলেমেয়েরা যৌন প্রাচী-রের ধারে কাছে খেলাধূলো করবে অথচ আঘাত পাবে না—এই বিস্ফোরক পরিস্থিতিরও একটা সমাধান চাই। এখানে কাজ করে শেখার নীতিটি রীতি-মত বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

যে কেউ যে কোন জিনিষ শিখতে পারে এই ধারণা এবং খাদ্যের ভারসাম্য—
—সে ভারসাম্য, খেলা ও কাজ, ব্যক্তি ও সমাজ, দেশ ও সহর, ইন্দ্রিয় সুখ ও

ধর্ম, গতি ও অবসর, মনের লঘুত্ব ও গুরুত্ব, যে ব্যাপারেই হোক না কেন, সাফল্য ও সুখ আনবেই—এ মানুষের অনেক দিনের বিশ্বাস। তাই কলেজের খাদ্য তালিকা খতিয়ে দেখা দরকার। আরও যে সব সম্বন্ধে খতিয়ে দেখা দরকার, সে হল কিছু খেলাধূলো, আর হয় এমন কিছু কাজ, যেমন অধ্যাপকদের সঙ্গে যোগাযোগ—অন্য কিছু না হলেও অপরের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সম্ভবতঃ নিজের কয়েকটা বাড়তি পয়েন্ট সংগ্রহের জন্যে বন্ধুদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার অথবা (ছেলে হলে) নিজের পৌরুষ জাহির করবার জন্যে যথেচ্ছ অসদাচারণ কিংবা ছাত্রদের কার্যধারা হিসেবে যা পরিচিত তার বেশ কিছুটা।

দৈনিক অথবা সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকার সম্পাদনা, স্কুলের বার্ষিকী অথবা পত্রিকা প্রকাশ, বিতর্ক করা, হরেক রকমের খেলার কোন একটার বাইরে গিয়ে টীম গঠনে সাহায্য করা, তাদের দেখাশোনা, ক্লাসে মনিটর হিসেবে কাজ করা নাচ ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, অভিনয় করা অথবা অভিনয়ে সাহায্য করা, আনন্দসঙ্গীত অথবা সমবেত সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ, ব্যাণ্ড, অর্কেষ্ট্রা অথবা চেম্বারগ্রুপে থাকা, সাহিত্য বিজ্ঞান অথবা খেয়াল সম্পর্কিত ক্লাবে অংশ-গ্রহণ, ফরাসী, জার্মানী অথবা স্প্যানিশ ক্লাব অথবা হাউস বা টেবিল-এ যোগ-দান করা, কোন দলে যোগদান এবং পরে তার কার্যকর্তার দায়িত্ব গ্রহণ অথবা গৃহকে আর্থিক দিক থেকে দেউলে হতে না দেবার সর্বদা অসফল (অথচ ব্যর্থ নয়,) সংগ্রামে সাহায্য করা—ছাত্রদের কার্যক্রম এই সব পথ ধরেই চলে।

এই সকল কার্যক্রম, এর বৈচিত্র এবং গতিশীলতা আমাদের দর্শকদের বিস্মিত করে তোলে। তবুও বাইরের জীবনের সঙ্গে তুলনা করলে এর পক্ষে যুক্তিগুলো পরিস্কার হয়ে যায়। অন্য দলের কাউকে কোন ছেলে যখন বলে, "ষ্টুডেন্ট গভর্ণমেন্টের চেয়ারম্যান পদের জন্যে লিউ বেকারকে তোরা সমর্থন করিস, আমরা তোদের প্রার্থীকে ফুটবল ম্যানেজারের পদে ভোট দেব" তখন থেকেই সুরু হয়ে যায় বাণিজ্যিক আর রাজনৈতিক জীবনের দেওয়া নেওয়া শিক্ষার পালা।

সম্ভবতঃ সব থেকে বড় ক্ষমতা হল মানুষের উপর কর্তৃত্ব করা—যে ক্ষমতাকে রীতিমত শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয় এবং রীতিমতভাবে পুরস্কৃত করা হয়। কলেজের ছাত্ররা এই শিক্ষাই পায় যে ব্যবসা আর অবসরযাপনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনই আর্টের কাজ। অপরের সঙ্গে একত্রে পানাহার করতে হবে, তাদের সঙ্গে একই ঘরে শুয়ে দরকার হলে ভয় দেখাতে হবে, খেলাধূলোর সুযোগে ঘনিষ্ঠভাবে তাদের

সঙ্গে মিশতে হবে, চতুরতার সঙ্গে তাদের শক্তি আর দুর্বলতা নিরূপণ করতে হবে এবং জয়লাভ যখন নিশ্চিত তখন তাদের সুযোগ দিতে হবে—এ হল শিক্ষার অন্য দিক। এসব শিক্ষাজগতে উচ্চ মূল্য না পেলে, সমাজেও স্থান পায় না। আণ্ডার গ্রাজুয়েট পাণ্ডিত্যের একটা অংশই হল এসব জানা। তাই আমেরিকার কলেজ ছাত্রের দলকে বিদেশীর চোখে যদি বুদ্ধিমান মনে না হয়, বিস্মিত হবার কিছু নেই। কলেজে এরা পণ্ডিত হবার জন্যে আসে না, আসে সেই খাদ্যের ভারসাম্যের নিশ্চিত সূত্রের কথা জানতে; যা সারাজীবন তাদের উপযুক্ত করে রাখতে পারে।

স্ত্রী-শিক্ষা

এই জীবনের একটি বিশেষ দিকে রয়েছে নারী। দূর প্রাচ্যের কথা বাদ দিলে অধিকাংশ আণ্ডার গ্রাজুয়েট কলেজেই সহশিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে। ছেলে-মেয়েরা একই ক্লাসে বসে, একই টেবিলে খায়, একই বই পড়ে, একই আগ্রহ সৃষ্টি হয় তাদের মধ্যে, সবুজ ঘাসে শুয়ে জীবন নিয়ে আলোচনা করে একই সঙ্গে, বিভিন্ন দিনে নিজেদের যাচাই করে নেয়। যে সমাজে ভিন্নগোত্রে বিবাহের চল আছে অথচ তরুণ-তরুণীদের সে ব্যাপারে কোন সাহায্য করে, সেখানকার কলেজগুলোর একটা উল্লেখযোগ্য কাজ হল ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনসঙ্গী খুঁজে বার করতে আর সমবয়সী বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে মেশবার আর নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা নিয়ে চর্চা করবার সুযোগ করে দেওয়া এবং এপথে জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়া আর বিয়ে ব্যাপারে মতামত গড়ে তুলতে সাহায্য করা।

এখন অনেক ক্ষেত্রেই কলেজে থাকা কালে ছাত্রছাত্রীরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। জীবনের যে উত্তেজনা সব-কিছু উল্‌টে-পাল্‌টে দিতে পারে, তা থেকে অব্যাহতি পেয়ে যে জীবনযাপনের জন্যে তারা দেহের দিক থেকে প্রস্তুত হয়, সে দিকে পা বাড়াতে পারে। যুদ্ধের পর থেকে এই পরিবর্তন এসেছে। তখন থেকেই স্বাভাবিক বয়েসের তুলনায় চার-পাঁচ-বছরের বড় বড় ছেলেমেয়েরা কলেজে যাচ্ছে। এই ব্যবস্থা এখনও চলছে। আজকের আণ্ডার গ্রাজুয়েটদের মধ্যে শতকরা ষোল জনই বিবাহিত। অনেক কলেজ এবং অভিভাবক এখনও ব্যাপারটাকে ভালভাবে নিতে পারেন নি।

কলেজের ছাত্রীদের বিষয় নির্বাচন কিছু জটিল, কারণ প্রায়শঃই তাদের কয়েক বছরের জন্যে কাজ করতে হয়। ছাত্রীদের মধ্যে যাদের গ্রাজুয়েট ক্লাসে বিয়ে হয়ে

যায়, তারা ল' অথবা মেডিকেল কলেজে গিয়ে স্বামীদের সাহায্য করে—তারপর বাকী জীবনটা গৃহস্থবধূ, মা এবং সমাজসেবিকা হিসেবে কাটায়। তাই দুটো পেশার জন্যে তাদের তৈরী হতে হয়। বৃত্তিগত শিক্ষাই ছাত্রীদের যৌতুকের অর্থ এবং জীবনবীমা পলিসি। বিয়ে করলে এ থেকেই তার ভাল স্বামী জুটবে। স্বামী নির্বাচনে সে যদি ব্যর্থও হয়ও, অভাব আর পরনির্ভরতা থেকে তাকে বাঁচাবে। ভাল চাকরী পাবার এ হল একটি রক্ষাকবচ।

তাই কেরিয়ার নির্বাচন করে মেয়েরা তার জন্যে প্রস্তুত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্বাচিত হয় শিক্ষকতা, কারণ অধিকসংখ্যক পাবলিক স্কুলের শিক্ষকই মেয়ে (চারজনে তিনজন)। তবে অন্য যে কোন কিছুও হতে পারে, কারণ কোন পথই মেয়েদের জন্যে রুদ্ধ নয়। তবে অনেক ক্ষেত্রেই উপরে ওঠা তাদের পক্ষে বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে এবং ছেলেদের সমান বেতন পায় না বললেই চলে। আগামী দিনের মা হিসেবে কলেজের ছাত্রীরা প্রায়শঃই মনোবিদ্যা ও শিশুপালন এবং কতকগুলো স্কুলে (অবশ্য উচ্চপর্যায়ের বুদ্ধিজীবিরা পাঠ্যসূচী থেকে এসব বাদ দিয়ে থাকেন) গার্হস্থ্য-অর্থবিজ্ঞান নিয়ে পড়বে। মেয়েরা পুরুষ বন্ধুর মতোই শিবির রাজনীতিতে অংশ নেবে কারণ পরে তারাও বন্ধুদের জয় আর নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করবে।

গ্রাজুয়েট শিক্ষা

আণ্ডার গ্রাজুয়েট কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট স্কুলে ঝাঁপ দেওয়াটা অনেক দিক দিয়েই হাই স্কুল থেকে কলেজে যাবার মত আকস্মিক ব্যাপার। দেশের ২১৮,০০০ জন গ্রাজুয়েট ছাত্র লেখাপড়ার অত্যন্ত প্রতিযোগীতামূলক ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভের জন্যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নিজেদের তৈরী করে। এই ক্ষেত্রগুলো হল আইন, চিকিৎসা, দর্শন অথবা গভর্ণমেন্ট। গ্রাজুয়েট স্কুলে একটা স্থান পাবার জন্যে তাদের প্রতিযোগীতায় নামতে হয়। সকলেই জানে যে কৃতিত্ব দেখাতে না পারলে তাদের বাদ দিয়ে দেয়া হবে।

শিবির-রাজনীতি, খেয়াল, খেলাধূলো অথবা রাত্রিব্যাপী 'বুল সেসনে' যোগ দেওয়ার মত সময় তাদের নেই। এক বছর আগে এগুলোকে যেমন আঁকড়ে ধরে ছিল, গ্রাজুয়েট ছাত্রের দল এখন এসব থেকে তেমনই শত হাত দূরে থাকে। এখন তারা নিজস্ব কক্ষ চায়, দলবদ্ধভাবে একটি কক্ষে অথবা রুমমেটের সঙ্গে একটি কামরা ভাগাভাগি করে নিতে আর চায় না। ক্লাসে অথবা সেমিনারে না

থাকলে এই সময় তারা প্রায়শঃই লাইব্রেরী অথবা ল্যাবরেটারীতে কাটায় নয়তো অধিক রাত অবধি নিজেদের মুষ্টিমেয় মূল্যবান বইগুলো অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করে। কখনও কখনও তারা সময় করে সিনেমায় বা কনসার্টে যায়, টেনিশ খেলে কিংবা কারও সঙ্গে দেখা করে, তবুও এই সময়ের প্রধান উপজীবিকা হল অধ্যয়ন।

সাগরপারের আগন্তুকেরা গ্রাজুয়েট স্কুল অধ্যাপকেরা যে পরিমাণ পড়াশোনার জন্য জোর দেন, লেকচারগুলোতে ছাত্রদের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা, টেষ্ট আর পরীক্ষা গবেষণাপত্রের লম্বা-চওড়া উত্তর, এবং ছাত্র শিক্ষকের মিলিত আলোচনার ক্ষেত্র সেমিনারের গুণাগুণ প্রভৃতি দেখে অভিভূত হয়ে পড়েন।

এই ধরনের এক বা দু'বছরের একাগ্র সাধনার পর পাওয়া যায় সর্বোচ্চ মাষ্টারস ডিগ্রী। পি, এচ, ডি'র জন্যে নির্ধারিত ন্যূনতম সময়কাল হল তিন বছর, তবে অধিকাংশ ছাত্রই এই ব্যাপারের অন্যতম প্রয়োজন প্রবন্ধ রচনায় আরও কয়েক বছর নেয়। চিকিৎসা বিষয়ক ডক্টরদের লেকচার শোনা আর লেবরেটারীতে কাজ করার পর কয়েক বছর অন্তরীণ থাকতে হয় গবেষণাকেন্দ্রের বাসিন্দা হিসেবে।

মার্কিন শিক্ষাপদ্ধতিতে হাইস্কুল থেকে কলেজ এবং তারপর কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট স্কুলে প্রবেশের ব্যবস্থাটাকে আকস্মিক পরিবর্তনের পর্যায়ে ফেলে রাখার কারণটা বেশ কৌতুহলজনক। প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিক্ষাপদ্ধতি যেন মনে করে যে ছাত্রের মাত্রারিক্ত অতিভোজন হয়ে গেছে, তাই উল্টো দিকে মুখ ফেরায়—প্রথম ক্ষেত্রে অকস্মাৎ পরিবারের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলে দিয়ে সামাজিক স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আকস্মাৎ চিন্তাজগতে বিচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে থাকে সাঁতার কেটে পার হও কিংবা ডুবে মর আর বাঁচ কিংবা মর'র চ্যালেঞ্জ, ডারউইন থেকে স্পেনসারের মতবাদ।

গ্রাজুয়েট স্কুলের ভুলত্রুটির মধ্যে রয়েছে যান্ত্রিক গবেষণার মধ্যে অকালে অত্যধিক স্পেশালিজেশন, যান্ত্রিক কার্যকলাপে পূর্ণ অবান্তর থীসিস, এন্তার গ্রন্থ-বিবরণী এবং অন্তর্দৃষ্টির অভাব। পি. এইচ. ডি এখন আগামী দিনের কলেজশিক্ষকের প্রয়োজনীয় প্রবেশপত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, অথচ পি. এইচ. ডি. ডিগ্রীর সঙ্গে শিক্ষকতার কোন সম্পর্কই নেই ; অধ্যাপনার ইচ্ছা নয়, ছাত্রদের অধিক গবেষণা করতেই উদ্বুদ্ধ করে এই শিক্ষা। তাই এই শিক্ষাপদ্ধতি সত্ত্বেও শিক্ষক তৈরী হয়, তার জন্যে নয়।

লোকপ্রিয় শিক্ষা

প্রেসিডেন্টস কমিশন অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য আরও বৃহত্তর ভূমিকার কথা ভাবেন—যাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জনগণের ক্ষমতানুযায়ী শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যম হিসেবে ধরা হয়।

ইতিমধ্যেই বৃহত্তর রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেছে। টেলিভিসন, ডাক এবং সম্প্রসারিত ক্লাসেব মাধ্যমে পাঠ্যসূচী অনুযায়ী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে। এ পথে তারা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পৌছতে পেরেছে। এ ছাড়া ফোরাম, আলোচনাচক্র এবং ছাত্রগোষ্ঠী গঠন করে শিক্ষাগ্রহণে জনসাধারণকে উৎসাহিত করেছে। প্রায় আট লক্ষ ছাত্র ভর্তি হয়েছে শিক্ষায়তনের বাইরের ক্লাসগুলোর জন্যে; চিঠিপত্র আর অ-বানিজ্যিক টেলিভিসন কোর্সের ফলে মোট ছাত্র সংখ্যা তিন কোটিতে গিয়ে পোঁছেছে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাদান আন্দোলন সারা দেশে ফলেফুলে ছেয়ে গেছে। ১৮২৬ সালে জোসিয়া হলব্রুক ম্যাসাচুসেটস-এ লাইসিয়াম আন্দোলন সুরু করার পর থেকেই অবিচ্ছিন্ন ব্যবস্থা হিসেবে শিক্ষাদর্শ দেশের সংস্কৃতিতে দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে। ১৮৭৪ সালে এল সটাকা (Chautauqua.) আন্দোলন যার, ফলে ১৯০৪ সালের মধ্যে দেশের সর্বত্র ভ্রাম্যমান দল পাঠান সম্ভব হয়। রাতারাতি কোন খালি জায়গায় তাঁবু পড়েছে এবং গরমকালে সপ্তাহখানেকের জন্য মনোমত কোন সহর বক্তৃতা, গান, পড়া এবং ঘুড়ে বেড়ানোর কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

এখন প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাকেন্দ্র স্থানীয় পাবলিক স্কুলই—রাত্রে যার দ্বার মুক্ত জনসাধারণের জন্যে। 'সান্ধ্য ক্লাসে তিরিশ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক ভর্তি হয় এবং হয় সেখানে গীটার বাজনা থেকে অঙ্ক, এবং ধাতু নিয়ে কাজ থেকে স্পেন দেশের ভাষা— সব-কিছুই শেখান হয়।

হরেক রকমের সংস্থা বিশেষ কার্যসূচী গ্রহণ করে—ওয়াই.এম.সি. এ, ওয়াই. ডবলু. সি.এ, ইউনিয়ন ও কৃষক গোষ্ঠী অথবা বড় বড় বই পড়া ও আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ সম্পর্কে আলোচনার জন্যে গঠিত সংস্থা। কৃষি দপ্তরের এক্সটেনসন সার্ভিস এর মাধ্যমে সত্তর লক্ষের মত গ্রাম্য মানুষ ছাপান কাগজপত্র ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখতে পায়, সভায় উপস্থিত হয় অথবা ফোর এইচ, (হ্যাণ্ড, হার্ট, হোম, হেলথ—অর্থাৎ হাত, হৃদয়, গৃহ ও স্বাস্থ্য) ক্লাবের সদস্য হয়, যা গ্রামের ছেলেমেয়েদের আনন্দ দেয়, আবার উন্নত ধরণের কৃষিজীবনের পথও দেখায়।

গ্রামাঞ্চলে ভ্রাম্যমান পুস্তকালয়ও যায়—মোটরগাড়ীর উপরে অবস্থিত এই সব গ্রন্থাগারে সর্বাধুনিক বই-পত্র, প্রাচীন কাব্য প্রভৃতি থাকে, যা থেকে চাষীরা শিখতে পারে।

সাত হাজার পাবলিক লাইব্রেরীর প্রত্যেকটি এক একটি শিক্ষাসংস্থা। কারণ বাড়ীতে পড়বার জন্য এখান থেকে বই ধার দেওয়া কিংবা পাঠক-পাঠিকা-দের মনের চাহিদা মেটানোর পথই বাৎলে দেওয়া হয় না, এখান থেকে বই সম্পর্কে আলোচনা, ছেলেদের জন্যে গল্প বলা, আলোচনা চক্র, কনসার্ট রেকর্ড করার ব্যবস্থা ও ঋণ দেওয়া হয়, সিনেমার ব্যবস্থা করা হয়, পড়বার মত বইয়ের তালিকা দেওয়া হয় ; ক্লাব ও প্রদর্শনীর চেয়ারম্যানদের কার্যসূচী প্রণয়নে সাহায্য করা হয়। অন্ধদের ব্রেইলি পদ্ধতিতে পুস্তক সরবরাহ করা হয়, সভাকক্ষগুলিতে সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয় এবং স্থানীয় ইতিহাস, বংশ বিবরণী ও ললিতকলা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত বইয়ের বিরাট সংগ্রহ থাকে।

বহিরাগতের আগমন সুরুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষা আন্দোলন সুরু হয় এবং তখন থেকেই তার একটি মূল অংশ হল আমেরিকীকরণ কার্যক্রম, নতুন বাসিন্দাদের নাগরিকত্ব অর্জনের উপযোগী করাই যার উদ্দেশ্য। পাবলিক স্কুলের সায়ংকালীন ক্লাসগুলোতে ইংরেজী, আমেরিকার ইতিহাস, ভূগোল এবং শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই ক্লাসগুলো বাধ্যতামূলক না হলেও অনেকে এর ভিতর দিয়েই স্কুলে পড়বার আস্বাদ পেয়েছে এবং গণতন্ত্র এবং সব কিছু জানবার অধিকার উভয়ই সমার্থবোধক করে তুলেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুরোপুরি গণতন্ত্রসম্মত করতে গিয়ে সব চেয়ে বড় যে ব্যর্থতার মুখোমুখী হতে হয়েছে, সে হল বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা সম্পর্কিত সুযোগের অসমানতা। কোন কোন জায়গায় অন্য রাজ্যের তুলনায় ভাল স্কুল আছে—বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলের নিগ্রোদের স্কুল সম্পর্কে একথা বলা চলে। ১৯৫৪ এবং ১৯৫৫ সালের সুপ্রীম কোর্টের রায় ঘোষিত হবার পূর্ব পর্যন্ত দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গদের জন্যে পৃথক স্কুল ছিল। এ ব্যবস্থা এখন আর আইনসিদ্ধ নয়। কিন্তু এর বিলোপসাধনের পূর্বে দীর্ঘ এবং পীড়াদায়ক সমঝোতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

শিক্ষা এবং স্বাধীন দুনিয়া

সাম্প্রতিককালের একটি অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ ব্যাপার হল আন্তর্জাতিক শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্ভব, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই দেখা যাচ্ছে। সাগরপারের

প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার ছাত্র এবং আরও পনর হাজার বিশেষজ্ঞ এখন মার্কিন মুল্লুকে অধ্যয়ন করছে আর দশ হাজারের মত আমেরিকান অন্যত্র পড়ছে। ফুলব্রাইট আইন, স্মিথ-মানড্‌ট্‌ আইন, শিক্ষা বিনিময় আইন প্রভৃতি বিশ্বের বৃহত্তম শিক্ষা বিনিময় কার্যক্রমের পিছনে ফেডারেল সরকারের সম্পদকে নিয়োগ করেছে। স্বেচ্ছাসংগঠন ইন্‌স্টিটিউড অব ইনটারন্যাশান্যাল এডুকেশন, আমেরিকা ও সাগরপারের ছেলেদের এই ব্যাপারে সাহায্য করে থাকে। প্রায়শঃই কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয় যে বৃত্তির ব্যবস্থা করে, তাতে পড়াশোনার ব্যয় নির্বাহ হয়ে যায়।

এই সংস্কৃতির বিনিময়সূচীতে শুধুমাত্র কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক নয়, হাইস্কুলের ছেলেরা, শ্রমিক, শিল্প ও খামারের প্রতিনিধি এবং কারিগরী বিশেষজ্ঞরাও অংশ নিচ্ছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর শিক্ষক, নেতা ও বিশেজ্ঞদের জন্যে যে বিশেষ কার্যসূচী গ্রহণ করে, আট হাজারের মত শিক্ষার্থী তার আওতায় পড়ে। ভিন্ন দেশের পাবলিক স্কুলে শিক্ষকতা করবার কার্যসূচীতে পড়েন তিন হাজারের মত ব্যক্তি। আবার ভিন্ন দেশের শিক্ষকরাও আসেন মার্কিন সমাজে বসবাস আর শিক্ষকতা করতে। শিক্ষাদপ্তর এই আন্তর্জাতিক বিনিময় ব্যবস্থাকে সাহায্য এবং বিদেশের শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করে।

কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখনই সাগরপারের ছাত্রছাত্রী থাকে (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এখন থাকে) আশে-পাশের সমাজ তাদের উপস্থিতির সুযোগ নেয় এবং তাদের দেশ সম্পর্কে আরও জানতে পারে। মহাদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত অনেক সহর এখন এইভাবে পররাষ্ট্রের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। সাগরপারের ছাত্র-ছাত্রীরাও এখানে তাদের আর একটি স্বদেশতুল্য দেশের সন্ধান পেয়েছে।

'ইনটেলেকচুয়াল' কথাটায় আমেরিকানরা চিরকালই লজ্জা পায়। তাঁর সঙ্কীর্ণ সমাজ সম্পার্কিত চিন্তাধারাকে রূপ দিতে গিয়ে মার্কিস এই শব্দটা প্রয়োগ করেছিলেন। সমাজ অর্থে তিনি শ্রেণীসংঘর্ষ বুঝেছিলেন। এই ভাবধারায় একটি শ্রেণীর শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত করা হয়, যা মার্কিন ভাবধারা কোন দিনই মেনে নেবে না। তা হলেও আজকাল, আগের তুলনায় অনেক বেশী চিন্তাশীল মানুষকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়। গভর্ণমেণ্টে আজ চিন্তাশীল ব্যক্তি, অর্থনীতি-বিদ, পরিসংখ্যানবিদ এবং সমাজবিজ্ঞানীরা যে রাজনীতিবিজ্ঞানের পত্তন

করছেন, তা আগেকার অনুমান আর ঈশ্বরের দোহাই দেওয়া পদ্ধতির স্থান দখল করছে। ফলাফলে আকৃষ্ট হয়ে আমেরিকার বিরাট মধ্যবিত্তশ্রেণী, যার আওতায় অধিকাংশ আমেরিকানই পড়ে, এখন শিক্ষা ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিকে সৎ-জীবন যাপনের পক্ষে অপরিহার্য হিসাবে দেখছেন। জ্ঞানই শক্তি। এই শক্তি এখন যেহেতু মানবসমাজকে ধ্বংস করবার শেষ ক্ষমতা অর্জন করেছে, সেইহেতু যে জ্ঞান একে বাঁচাতে পারে, তাকে আয়ত্তে আনার প্রয়োজন আরও অধিক জ্ঞান চর্চ্চার স্পৃহাকে জাগিয়ে তুলে।

আমেরিকানদের চিরদিনের স্বপ্ন হল সীমাহীন আকাশ। কারিগরী বিদ্যা এখন এই দুনিয়ার দ্বার খুলে দিয়েছে। জীবদ্দশাতেই এই স্বপ্ন রূপায়িত হওয়া সম্ভব দেখে কিছুটা বিস্মিত হয়ে আমেরিকানরা প্রারম্ভিক কাজটা খুব সতর্কতার সঙ্গে করছে। শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক এবং শিল্পীর দিকে তাকাচ্ছে নির্দেশের জন্যে। স্কুলগুলিতে বন্যার মতো ছেলের দল আসছে, যা তার ভিত্তিমূলকেই হালকা করে দেবে বলে আশঙ্কা হচ্ছে। তবে এই ব্যবস্থার ফলে গোটা সমাজ যে শিক্ষা-অভিজ্ঞতা অর্জন করছে, তা থেকে কোনদিনই আর পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।

রাজনীতি

ভাবধারা নয়, আমেরিকার রাজনীতি এবং দল বিভিন্ন স্বার্থের উপর ভিত্তি করে চলে। উদারনৈতিক অথবা রক্ষণশীল হিসেবে এখানকার প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির শ্রেণীবিন্যাস করা বিভ্রান্তিকর : এক একটা দল হয়তো ও দুটোই, কিংবা কোনটাই নয়। এতদিনের চলতি চিন্তাধারার মাপকাটিতে এরা আদৌ দল নয়। এদের বরং বিভিন্ন স্বার্থের কোয়ালিশন বলা যেতে পারে যা নিয়ত বিভক্ত এবং মিলিত হচ্ছে। শিল্পকে শ্রমের বিরোধী শক্তি ভাবাও ঠিক হবে না। কারণ শিল্প ও শ্রমিক দুনিয়াও বহু উপদলের মিলনে গঠিত। কয়েকটা বড় ব্যবসার সঙ্গে কয়েকটা ছোট ব্যবসার বিরোধ আছে। এমন ব্যবসা আছে যা অল্পস্বল্প কর ধার্য হলে লাভবান হয়, আবার এমনও আছে যারা অধিক কর ধার্য হোক, তাই চায়। ব্যবসায়ী আর শ্রমিকেরা অধিক কর্মসংস্থান আর উৎপাদন ব্যাপারে একমত, কিন্তু শ্রম-আইন সম্পর্কে তাদের মতৈক্য নেই।

ফলে দেখা দিয়েছে অত্যন্ত জটিল সংগঠন, সংঘর্ষ এবং বিরোধ থেকেই যার উৎপত্তি। এই নিয়ত বিরোধ আমাদের শক্তসামর্থ আর কর্মঠ করে তোলে— শক্তি প্রদর্শন, দাপাদাপি, কিছুটা ধাপ্পা দেখানো এবং আপোষ করা, দেরী করা, চিৎকার করা এবং প্রথমাবস্থায় যা চাই, আমাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ চাহিদা সেখানে নিক্ষিপ্ত হলে, বিরাট ত্যাগস্বীকারের ছলনা করবার ক্ষমতা দেয়। স্যামুয়েল লুবেল ঠিকই বলেছিলেন, ঐক্যের জন্য যে লড়াই, সেই হল গণতন্ত্রের শক্তি।" অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, এই ব্যবস্থায় সুযোগ-সুবিধের পরিধি নিয়ত সম্প্রসারিত হয় নিয়ত ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার উপর।

রাজনৈতিক নেতার কাজ হল এই সকল বিরোধী দাবীর বিচার করা এবং এমন একটা আপোষ করিয়ে দেওয়া যাতে সকলে খুশী হবে এবং কেউ অন্যায় সুবিধা পাবে না। বিদেশী পর্য্যবেক্ষক আমাদের রাজনৈতিক জীবনে চিন্তা-ধারার অভাব আছে মনে করেন। এর কারণ তিনি রাজনীতিতে ভাবধারা-ভিত্তিক ব্যবস্থা দেখতে অভ্যস্ত—সেই রুদ্ধদ্বার অবস্থা যাতে ধরে নেওয়া হয় যে অতীতে মীমাংসিত এবং সেইহেতু ধরাবাধা রীতিতে সমস্যার সম্মুখীন হওয়া;

যায়। মার্কিন ভাবধারা মনে করে কোন সমস্যার সঙ্গেই কোন সমস্যার মিল নেই এবং পৃথকভাবে প্রতিটির সম্মুখীন হওয়া দরকার, তবে প্রতিটির মধ্যেই সমাধানের বীজ নিহিত থাকে এবং সতর্কতার সঙ্গে এগুলো দেখাশোনা করলে তা থেকে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাবেই।

মার্কিন রাজনৈতিক পদ্ধতির বাহ্য আদর্শহীনতার পিছনে কতকগুলি মৌলিক সিদ্ধান্ত রয়েছে, যা সকলেই স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করেন :

১। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার জনগণের জন্য; জনগণের দ্বারা চালিত জনগণের সরকার। এর ক্ষমতা এসেছে জনগণের থেকে এবং নিহিত আছেও সেখানে, তাই এ ক্ষমতা তাঁরা মাঝে মাঝে বিভিন্ন নেতার উপর ন্যস্ত করতে পারে, নির্বাচন আর তাঁদের সংশোধন ক্ষমতা অনুসারে আইন পালটে।

২। এই অধিকারের ভিত্তিমূল কোন অপরিবর্তনীয় পবিত্র পাণ্ডিত্য নয়, মানুষের যুক্তি যা কোন বিশেষ আদর্শ বা 'ইজম'-এর উপর নির্ভর না করেই নতুন নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। আমেরিকানরা "প্রচ্ছন্ন সমাজবাদের" অভিযোগ করলেও ক্ষেত্রবিশেষের চাহিদানুযায়ী "সমাজ-"বাদী অথবা "ধনতান্ত্রিক" কিংবা "সমবায়বাদী" এমন কি "স্বৈরাচারী" ব্যবস্থাও গ্রহণ করে।

৩। সাধারণ ক্ষেত্রে জনসাধারণের নৈতিক বিচারবোধই সবচেয়ে নির্ভর-যোগ্য পন্থা। সাম্প্রতিককালে এই আদর্শবাদী প্রত্যয় সাধারণ মানুষের মতামত দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। প্রায়শঃই দেখা গেছে সাধারণ মানুষের মতামত কংগ্রেসে তাদের প্রতিনিধিদের তুলনায় প্রগতিশীল।

৪। গভর্ণমেন্ট অথবা সরকার একটি প্রয়োজনীয় অশুভ (নেসেসারি ইভল্)। এ সব সময়েই নিজেকে সম্প্রসারিত করতে প্রয়াস পাচ্ছে। সব সময়ে একে প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যত অধিক কাজ আমরা নিজেরা স্বেচ্ছায় অথবা স্থানীয়ভাবে করতে পারব, গভর্ণমেন্টের বিপজ্জনক ক্ষমতা তত কম হবে। টম পেইনের মত আমরা বিশ্বাস করি যে মানুষের পুণ্য থেকে সমাজ আর তার পাপ থেকে গভর্ণমেন্ট উদ্ভূত হয়েছে। স্বেচ্ছামূলক এবং স্থানীয় প্রয়াসের উপর জোর দিলে যা রাজনৈতিক হতে পারত, তাকে সামাজিক স্তরে রাখা সম্ভব হবে।

৫। অনুরূপ সাদৃশ্য আমাদের সন্তুষ্ট করে। সবশেষের বিদ্রোহ থেকে আমরা নতুন সাদৃশী খুঁজে বার করি। সরকারের যে সকল কাজ আমরা এখন

অবধারিত বলে ধরে নিয়েছি, তার প্রতিটিকেই প্রায় কোন না কোন সময়ে প্রগতিশীল হিসেবে দেখা হয়েছে। যেমন শিশু-শ্রম আইন, আয় আনুপাতিক কর, ট্রাষ্টবিরোধী আইন, বেকার-ভাতা। থিওডোর রুজভেল্ট মনে করেছিলেন গাড়ীর চালকদের দৈনিক কাজের সময় বার ঘণ্টা করে ধার্য করা একটি প্রগতিশীল সমাজবাদী প্রস্তাব। কোন রকম রাজনৈতিক মতবাদ আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে না; তাই বর্ত্তমানের চাহিদা মেটাতে পারে এমন যে কোন কর্মসূচীই আমরা গ্রহণ করতে পারি ; যাতে শিল্প, শ্রমিক, খামারের আয়, কাজের ঘণ্টা, বেতন, মুদ্রাস্ফীতি অথবা আন্তর্জাতিক সমঝোতা যাই ই নিয়ন্ত্রিত হোক না কেন।

৬। সনদের প্রতিশ্রুতি এবং সংবিধানের পূর্ণতা প্রাপ্তির আওতায় আমেরিকানরা জন্ম থেকেই সমান, তাই কখনও শ্রেণীসংঘর্ষের আবর্তে পড়তে হয়নি তাকে। এখানকার দর্শনে শ্রেণী বিভাগের কড়াকড়ির কোন স্বীকৃতি নেই এবং যেখানে আছে সেখানে বিশেষ অধিকারের কথা স্বীকার করলেও হুমকীর নয়, চ্যালেঞ্জ হিসেবেই তাকে দেখা হয়। ধনীদের সৌধগুলি ভেঙ্গে চুরমার করে কি হবে, একদিন সকলেই যখন সেখানে উঠতে পারবে? তাই সামাজিক সংস্কার সাধিত হয়। এ সংস্কার শক্তিমানকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার জন্য নয়, সে-সংস্কার সকলকে ভোগ করার অধিকার দেবার জন্য। সামাজিক বিপ্লবের স্থলে আমরা মেনে নিয়েছি বিবর্ত্তন—এ সৌখীনতা সম্ভব হয়েছে আমাদের মানব ও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং চরিত্রের কিছু প্রীতিপদ লক্ষণ, স্বেচ্ছাসংগঠন ও শক্তির থেকে যাকে ভিত্তি করে সমাজ প্রগতির প্রতিটি ধাপ পূর্ববর্ত্তী ধাপের উপর রচিত করেছে, সবকিছু কেটে-ছেঁটে নতুন করে সুরু করবার প্রয়োজন হয়নি।

তাই সংঘর্ষ আর সংঘাত সত্বেও আমাদের রাজনৈতিক জীবনের পটভূমিতে রয়েছে সৌহার্দ্যের অনুভূতি। গভর্ণর সহরে এসে যে ভাষণ দেন, তাতে তিনি বলেন, "আমরা চাই আমার আপনার মত সাধারণ মানুষের মতামত নিয়ে সব কিছু হোক।" এ তাঁর মনের কথাও বটে। আর হবেই বা না কেন? বিদেশে জন্মেছেন, দেশে এসেছেন বহিরাগতের পুত্র হিসেবে, তারপর অর্থ-নৈতিক এবং পরে রাজনৈতিক সোপান ধরেই তো তিনি উপরে উঠেছেন।

সংঘর্ষের সময়ও আমাদের দেশে বিরোধী পক্ষগুলির মধ্যে মৌলিক মতৈক্য থাকে। সবাই স্বীকার করেন যে, আমরা সবাই সমান, প্রশ্ন শুধু কিভাবে

সমান। মার্কস্-এর শ্রেণীসংঘর্ষ মতবাদ ভ্রম-বাতুলতা ও ভ্রান্তি-মাত্র, তা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট। আমরা বুঝে উঠতে পারি না যুক্তিবাদী মানুষ কি করে এই দুঃস্বপ্নকে সামাজিক ব্যবস্থার প্রামাণ্য বর্ণনা হিসেবে গ্রহণ করে। আমাদের নিজস্ব সমাধান—সকল মানুষের সমানাধিকারকে মেনে নেওয়া এবং এই সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়ত সংগ্রাম ও পুনর্বিন্যাস—অন্যের পক্ষে পুরোপুরি গ্রহণীয় কেন হবে না, তাও আমাদের পক্ষে বোঝা কষ্টকর।

৭। কর্তৃত্ব যেহেতু বিপজ্জনক, তাই তাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করাই শ্রেয়ঃ; বিভক্ত করা যেতে পারে সরকারের স্থানীয়, আঞ্চলিক, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অফিসার স্বেচ্ছামূলক সংগঠন ও রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে। যেখানেই সম্ভব কাজ স্বেচ্ছামূলক এবং বেতনহীন হওয়া উচিত। সরকারের ভিতরেও ক্ষমতা খতিয়ে দেখা এবং ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে আরও বিভক্ত হয়।

লিঙ্কনই সম্ভবত সরকার সম্পর্কে মার্কিন মনোভাব সবচেয়ে ভাল করে সংক্ষেপে বলতে পেরেছিলেন: সরকারের উচিত কর্তব্য হল, কোন সমাজের এমন সব কাজ করে দেওয়া যা তাদের প্রয়োজন অথচ নিজেরা করতে পারে না কিংবা পৃথকভাবে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা যে কাজ ততটা ভাল করে করতে পারেন না, সেটা করতে সাহায্য করা।

রাজনৈতিক দল

সংবিধানে রাজনৈতিক দল সম্পর্কে কোনরূপ উল্লেখ না থাকায়, দলগুলোকেই নিজেদের আইন নিজেদের প্রণয়ন করতে হয়েছে রাজ্যসমূহ কর্তৃক রচিতআইন-কানুনের দিকে দৃষ্টি রেখে (জাতীয় নির্বাচন সম্পর্কিত ফেডারেল আইন অবশ্য রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রভাবিত করে, তবে ততটা অধিক মাত্রায় নয়)। এভাবে যে পদ্ধতি গড়ে উঠেছে তা তেমন ধরাবাঁধা কিছু নয়। যেমন ধরুন, পার্টির সদস্য কে? ভোটারদের শতকরা সত্তরজনই কোন না কোন পার্টির রেজিষ্টার্ড সদস্য হলেও, অধিকাংশই প্রাথমিক কমিটি আর নির্বাচনে ভোট দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু করেন না। আর সম্ভবতঃ, স্থানীয় কোন পদ পূরণের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের সময় নির্বাচনী সভায় যোগদান করেন অথবা প্রেসিডেন্টের নির্বাচনী অভিযান নামে পরিচিত রাজনৈতিক প্ররোচনায়, কোন সমাবেশে হাজির থাকেন।

সরকারের কেন্দ্রসমূহের ন্যায় পার্টিগুলোও নীচে থেকে উপরে (উপর থেকে নীচে নয়) গঠিত। প্রতিটি পার্টির স্থানীয় শাখা নিজেকে সংগঠিত, কমিটির পরিধি স্থির এবং স্থানীয় কোন পদপূরণের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন, তাঁদের মনোনীত করার কাজের দায়িত্ব নেন।

প্রতিটি স্তরেই উপরের ফতোয়ার তোয়াক্কা না করেই পার্টি খুশীমত নিজের ঘর সাজাতে পারেন। প্রতিটি রাজ্যপার্টির নিজস্ব নিয়মকানুন আছে। গভর্ণর, কংগ্রেসের সদস্যপদ ও অন্যান্য পদের জন্য নিজেদের প্রার্থী তাঁরাই নির্বাচিত করেন। জাতীয় কমিটির রাজ্যকমিটিসমূহের উপর কোন রকমের খবরদারী করবার ক্ষমতা নেই। আর প্রেসিডেন্ট যাঁদের নির্বাচিত দেখতে চান তাঁদের কংগ্রেসে দলের প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করতে পারেন না। ১৯৩৮ সালে রুজভেল্টের 'পার্জ' করার প্রয়াস থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। প্রেসিডেন্টের নীতির যাঁরা বিরোধী তাঁরা তাঁর দলের প্রার্থী হিসেবেই মনোনীত হতে পারেন এবং তাঁরা নির্বাচিত হনও।

পার্টি থেকে বহিস্কৃত হবার মত কোন কারণ এদেশে নেই। বহিস্কার নয়, স্থান দেওয়াই আমেরিকান পার্টির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি দল হরেক রকম স্বার্থের কোয়ালিশন, নির্বাচনে জিতবার জন্যেই এই মিলন—বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভকে সর্বোত্তম পুরস্কার হিসেবে ধরা হয়। প্রতিটি বৃহৎ পার্টিকে প্রতিটি শ্রেণীর ভোটারদের কিছু অংশের নিকট আবেদন জানাতে হয় —শ্রমিক, চাষী, ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্ট, নিগ্রো, অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় উত্তর-দক্ষিণ, মধ্য-পশ্চিম, দূর-পশ্চিম, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবি, ধনী, দরিদ্র, উদার-নৈতিক, রক্ষণশীল, আন্তর্জাতিক মনোভাবাপন্ন এবং জাতীয় মনোভাবাপন্ন সবাইকেই।

প্রতিটি পার্টিকেই যুদ্ধ থেকে দূরে থাকবার প্রতিজ্ঞা করতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধজয়ের জন্যও প্রস্তুত থাকতে হয়; ভোটারদের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে দেবার কথা বলতে হয়, আবার তাঁদের ট্যাক্সের বহর কমানোর প্রতিশ্রুতিও দিতে হয়; অর্থনীতিকে ধুমধাড়াক্কার মধ্যে রাখতে হবে, আবার মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ করতে হবে; খামারের আয় ঠিক ঠিক রাখতে হবে অথচ খাদ্যের দাম বাড়ালে চলবে না; দেশে কমিউনিজম্ এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ খেঁতলে দিতে হবে, আবার ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সংহত করতে হবে—এবং অন্যান্য দলের চেয়ে এসব কাজ ভাল করে করতে হবে।

কোন দলকে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের প্রবক্তা বললে ভুল হবে যদিচ স্বল্প আয়ের ভোটারদের ঝোঁক ডেমোক্রেটিক পার্টির দিকেই। সংগঠিত শ্রমিক শক্তি যদি নিজেরা কোন দলকে সমর্থন করতে চাইলে দেখা গেছে, অন্য কোন অর্থ-নৈতিক গোষ্ঠীর চেয়ে শ্রমিকরা অধিক মাত্রায় দলগত ভোট দেওয়ার পক্ষপাতী নয়। তাই শ্রমিকরা তাদের ভোটের জন্য উভয় দলের রেষারেষি দেখে নিজেদে মূল্য বুঝতে পেরেছে।

ভোটারদের ধারণা ডেমোক্রেটরা অধিক মাত্রায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও অধিক ব্যয়ের পক্ষপাতী আর রিপাবলিকানরা অপেক্ষাকৃত কম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং কম ব্যয় চান, যদিচ সাম্প্রতিক বাজেটগুলো এই সহজ ব্যবধানটুকুও অনু-মোদন করবে না। মন্দার ভয় থাকলে তাই ডেমোক্রেটদের সুবিধে হয় আর সময়টা ভাল গেলে রিপাবলিকানদের অনুকূলে যায়—তা সে ভোটার শ্রমিক কি ব্যবসায়ী, চাষী বা চাকুরীজীবি, যাই হোন কেন। রিপাবলিকানদের প্রবণতা সম্পদ সৃষ্টির উপর প্রাধান্য দেওয়ার দিকে, ডেমোক্রেটরা জোর দেন তার বণ্টনের উপর। অথচ জাতীয় নির্বাচনে জয়লাভ করতে হলে প্রতিটি দলকেই মধ্য এবং স্বল্প আয়ের ভোটারদের বেশী সংখ্যক ভোট পেতে হয়। তাই নীতিতে যতটা নয়, খুটিনাটি নিয়েই তার চেয়ে অধিক বিরোধ দেখা দেয়। উভয় দলই 'নিউ ডীল' ধরণের আইন প্রণয়নের পক্ষ সমর্থন করেন। সব দলেই এখন উদারনৈতিক গোষ্ঠীর প্রাধান্য।

আদর্শের অভাবই আমেরিকার দলগুলোতে স্থায়িত্ব এনে দেয়, এবং এজন্যেই দক্ষিণাঞ্চলের রক্ষণশীল ডেমোক্রেটরা উত্তরাঞ্চলে উদারনৈতিকদের সঙ্গে একই দলে থাকতে পারে এবং কংগ্রেসের নির্বাচনের সময়, নিজের দলের সকলের সঙ্গে ভোট না দিয়ে, কোন কোন বিষয়ে রক্ষণশীল রিপাবলিকদের সঙ্গে দিতে পারে। মার্কিন পদ্ধতিটি নিজস্ব বৈচিত্রের মধ্যে মিল করিয়ে দেওয়া ; আদর্শবাদগুলি মধ্যযুগের প্রাসাদ অথবা ম্যাগিনট লাইনের মত। বিশিষ্টপদ নিয়ে লড়াই হয়। মার্কিনপার্টি ব্যবস্থা ধরাবাধা কিছু নয় ; বরং সদাপরিবর্তনশীল, চতুঃপার্শ্ববর্তী সমাজের পরিবর্তনে প্রভাবিত। এ মানুষের আশা-আকাঙ্খার ছবি, দুনিয়া কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে কোন দার্শনিকের স্বপ্ন নয়।

মার্কিন রাজনীতিতে প্রগতিশীল বাম অথবা দক্ষিণ বলে কিছু নেই কেন? কারণ কোন পক্ষের চরম দিকের পক্ষে কোন ভোট পড়ে না, পড়লেও

সামান্যই, কারণ সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকে বলা চলে আমেরিকা শ্রেণীসংঘর্ষের বিলোপসাধন ঘটাতে অথবা তারউপর কোন গুরুত্ব না দিতে বলে, কারণ এখানকার অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে অধিক মানুষের মধ্যে সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত করিতে চায়।

প্রেসিডেন্ট-দলীয় সংস্থা

একদা যে জাতীয় কনভেনশন অনেক দূরের আর রহস্যময় ছিল, এখন টেলিভিশনের দৌলতে, তা প্রতিটি ঘরে পৌঁছে গেছে এবং এর প্রতিক্রিয়া পরিবার এবং কনভেনশন দুইয়ের উপরেই দেখা যাচ্ছে। রাজনীতি যখন বৈঠকখানায় প্রবেশ করে, প্রতিটি ভোটার যখন কার্যতঃ প্রার্থী নির্বাচন মুহূর্তে উপস্থিত থাকে, তখন জনগণের আগ্রহ রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধার উপর প্রভাব বিস্তার করবেই এবং রাজনৈতিক পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান থেকে সজ্ঞান ভোট প্রদান আসবেই।

যে সার্কাসকে আমরা কনভেনশন বলি সে একটা বিচিত্র ঘটনা। এখানে আধুনিক যন্ত্রপাতি আর আদিকালের আদিবাসীলড়াই, নৃত্য, কৌতুকবহ কমরেডিপনা আর তিক্ত আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ, জাকজমকপূর্ণ ভাষণ আর সেই সঙ্গে সুচতুর কলা-কৌশল, বিরক্তির মরুভূমি আর প্রবল উত্তেজনার মরুদ্যান—সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। কনভেনশন কক্ষের এই হৈ হৈ আর হৈ চৈ-এর কোন যুক্তি থাকতে পারে কি?

সর্বশেষ রিপাবলিকান কনভেনশন ১,৩২৩ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করে, ডেমোক্রেটরা করে ২,৭৪৪। এ ছাড়া নিরপেক্ষ সদস্যের সংখ্যাও কম নয়। এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরস্পরের নিকট অপরিচিত; বুঝতে পারেন যে পরিচিত হওয়াটা প্রয়োজনীয়। তাই তাঁরা বেকুবের মতো অনেক কিছুই করে বসেন। ছোট ছেলেদের মত একে অপরকে দেখিয়ে দেখিয়ে মজার মজার সব কাণ্ড করে। এঁরা বিশ্রী টুপি পরেন, নয়তো বড় বড় ব্যাজ পরিধান করেন, মজার মজার সব যন্ত্রের সাহায্যে অদ্ভুত সব শব্দ বার করেন, বড় বড় 'ব্যানার' বহন করেন, যাতে তাঁদের প্রার্থীর নাম অথবা মুখচ্ছবি থাকে, রাস্তায় মিছিল করেন, চিৎকার করেন। আশা থাকে এতে ঐক্যের ভাব সৃষ্টি হবে এবং অন্যান্য অপরিচিত লোকদের তাঁদের কাছে টেনে নেবে। কারণ এই ঐক্যের অভাব এবং তার প্রয়োজনীয়তাই এঁদের সবচেয়ে মৌলিক আবেদন, হৃদয়াবেগের স্মরণাপন্ন হতে হয়।

আর এই প্রক্রিয়া থেকে উদ্দেশ্য সফল হয়ও—প্রার্থীর অনুকূলে গণসমর্থন পাওয়া যায় যার কাজই হল দলকে ঐক্যবদ্ধ রেখে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া। ধূমপানের ধোঁয়াভর্তি যে ঘরগুলোতে রাজনৈতিক মেলামেশা চলে, সেগুলো বাদ দিলেও কনভেনশন জনগণের ইচ্ছাকে বানচাল করে দিতে পারে না। কনভেনশনকে নির্বাচনে জিততে হলে এমন কোন প্রার্থীকে মনোনীত করতে হবে, যাকে জনসাধারণ পছন্দ করে। সাধারণতঃ জনবহুল কোন রাজ্য থেকেই প্রার্থী মনোনীত হন, কারণ তা হলে সুরুতেই জয়ের সম্ভাবনা থাকে। প্রায়শঃই দেখা গেছে, তিনি হয়ত সে-রাজ্যের গভর্ণর ছিলেন, যেখানে জাতীয় সরকারকে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, সেই রকমের ছোটখাট অনেক কিছুর সঙ্গেই তাঁর পরিচয় ঘটেছে। এতাবৎ কালের সকল প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মাত্রেই উত্তর ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত প্রোটেস্ট্যান্ট। কিন্তু ক্যাথলিক অথবা পূর্ব কিংবা দক্ষিণ ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত প্রার্থীরাও গভর্ণর হতে সুরু করেছেন এবং শেষ অবধি 'হোয়াইট হাউসে'-ও পৌঁছবেন।

প্রেসিডেন্ট পদটি যেমন বৃহত্তম পুরস্কার, তেমনই কনভেনশনের জৌলুস আর চাকচিক্যও পার্টির প্রেসিডেন্ট পদ-প্রার্থী মনোনয়নকে কেন্দ্র করে। তাঁর সহযোগী, ভাইসপ্রেসিডেন্ট সাধারণতঃ মনোনীত হন সাত তাড়াতাড়িতে যখন সবাই ক্লান্ত এবং বাড়ী যাবার জন্যে ব্যস্ত। তখনও অবশ্য সকলের দৃষ্টি থাকে দলকে ঐক্যবদ্ধ করবার দিকে। প্রেসিডেন্ট উদারনৈতিক হলে ভাইস-প্রেসিডেন্ট রক্ষণশীল হতে পারেন, কিংবা সেই দলের প্রিয়পাত্র হতে পারেন। এর বিস্ময়কর ফল শুধু দলের ঐক্যেই নয়, এর মধ্যে পরাজিত গোষ্ঠীকে একটা খেলোয়ারসুলভ সুযোগও দেওয়া হয় শাসনভার নিয়ন্ত্রণের, যদি হঠাৎ প্রেসিডেন্ট কোন কারণে নিজের পদে অধিষ্ঠিত থাকবার কালে মৃত্যু বরণ করেন।

কনভেনশনে পার্টির প্রস্তাবকমিটি রচিত পার্টির সরকারী কার্যসূচীও গৃহীত হয়। এই ব্যাপারেও পার্টির ভিতরের বিভিন্ন গোষ্ঠীর অনিশ্চিত লড়াই চলে, ফলে কার্যসূচীটি এমন ভাবে স্থির হয় যে কোন পক্ষই নিজকে অপমানিত মনে করেন না।

এখন পরীক্ষিত রাষ্ট্রনেতা, সূক্ষ্মবুদ্ধি রাজনৈতিজ্ঞ এবং পার্টির ঐক্যসাধকই পার্টির প্রেসিডেন্ট পদপার্থী হন। তাঁর মধ্যে আস্থা যেমন থাকবে, তেমন থাকবে বিনয়: তিনি ভদ্র নম্র হবেন, তেমনই নিজের মর্যাদা বজায় রেখে চলবেন;

আন্তরিকতা থাকবে, আবার চতুরও হতে হবে ; প্রয়োজনীয় খবরাখবর রাখবেন অথচ অতিরিক্ত মাত্রায় বুদ্ধিপ্রধান হলেও চলবে না ; সহানুভূতিসম্পন্ন হবেন, কিন্তু গলে গেলে চলবে না ; বিশ্বের সবচেয়ে সেরা পদাধিকারীর কাছে যেমন, দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গেও সেই রকমের সহজ সরল ব্যবহার করতে হবে।

নির্বাচন ও নির্বাচনী অভিযান

প্রেসিডেন্টের নির্বাচন এমন একটি রাজনৈতিক সুযোগ, যাতে সকল আমেরিকান অংশ নেয়। এই সময় জাতীয় সমস্যাগুলি প্রাধান্য পায় এবং নতুন কোয়ালিশনের উদ্ভব হয়, যার নতুন ভাবধারার মধ্যে নিয়ত আন্দোলন ও সমঝোতার মধ্যে আরও চার বৎসর দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখবার প্রতিশ্রুতি থাকে। এখানকার নির্বাচনী প্রথায় যে প্রার্থীর রাজ্যের অধিকাংশ ভোট পান, তাঁর নামে রাজ্যের সব ভোট যুক্ত হয় ; ফলে বড় রাজ্যগুলো নির্বাচনী লড়াইয়ের মুখ্য ময়দানে পরিণত হয়। তাই ৫৩১টি নির্বাচক (ইলেকটোরাল) ভোটের অধিক সংখ্যক পেতে হলে, প্রার্থীকে বড় বড় সহরের প্রতি আবেদন জানাতে হয় (কংগ্রেসের প্রতিটি সিনেটর ও প্রতিনিধি অথবা রিপ্রেসেনটেটিভ একটি করে ভোট পান—যার ফলে নিউইয়র্ক-এর হয় ৪৬টি আর নেভাদের ৩টি ভোট)।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী বছরে আরও অনেক প্রার্থী হয়ত একই সময়ে অন্যান্য পদের জন্য নির্বাচনী অভিযান চালান। তাই সকল স্তরে পার্টিগুলোকে ব্যস্ত থাকতে হয়, প্রার্থীরা নিজেরাই ভোটের জন্যে গ্রামাঞ্চলে ঝটিকা সফর করে বেড়ান—বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে কলিং বেল টেপেন, বাচ্চাদের চুমু খান, স্কুলের উদ্বোধনী দিবসে, ক্লাবে, সভায়, সমাবেশে বক্তৃতা করেন।

যাঁকে ভোট দিতে হবে সবাই তাঁকে দেখতে চায়। দোটানায় পড়লে, যাঁর সঙ্গে 'হ্যাণ্ডসেক' হয় ভোটটি তাঁর পক্ষেই প্রদত্ত হয়। পরস্পরের মধ্যে যে কথাবার্তা হয় তার প্রভাবও যথেষ্ট। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ভোটারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকা।

উত্তরের (দক্ষিণের নয়) পুরাতন ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত প্রোটেস্ট্যান্টরা রিপাবলিকানদের আর ক্যাথলিক ও সাম্প্রতিককালের বহিরাগতদের বংশধরের ডেমোক্রাট প্রার্থীকেই সাধারণতঃ ভোট দেয়। নিগ্রোদের ঐতিহ্য রিপাবলিকান

ধর্মী, কিন্তু রুজভেল্ট কার্যসূচীর ফলে তারাও ডেমোক্র্যাটিক পার্টির দিকে ঝুঁকেছে, আবার আইজেনহাওয়ারের অধীনে ব্যক্তিস্বাধীনতার ক্ষেত্রে লাভবান হওয়ায় রিপাবলিকান দলকে নির্বাচিত হতে সাহায্য করেছে। দল দুটোর সদস্য সংখ্যা প্রায় সমান-সমান ভাবে বিভক্ত এবং স্বতন্ত্র অথবা পরিবর্তনশীল ভোটের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক বলে নির্বাচনী ফলাফল নিগ্রোদের হাতে এসে যেতেও পারে।

বহিরাগতদের সন্তানেরা ধীরে ধীরে সিঁড়ি ধরে উপরে ওঠে। বস্তি অঞ্চল থেকে সহরের উপকণ্ঠে উঠে যায়, ব্যবসায়ী অথবা চাকুরীজীবি হয় এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়। আরও, আরও দরিদ্র হবার মার্ক্সীয় নীতি অগ্রাহ্য করে তারা ভাল ভাল বাড়ীতে উঠে যায়, অধিক উপার্জ্জন করে, ছেলেমেয়েদের আরও শিক্ষিত করে তোলে। ধীরে ধীরে তারা সহরের, তারপর রাজ্যের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে। রুজভেল্টের অধীনে তারা বড় বড় ফেডারেল পদ-গুলোও দখল করে।

ঐতিহ্যের দিক দিয়ে ডেমোক্রেট দক্ষিণাঞ্চলে রিপাবলিকান ভোটও দেখা যাচ্ছে, যার ফলে পরে হয়ত দেশের বাকী অংশের সমান পর্যায়ে এসে যাবে দক্ষিণাঞ্চলটি। খামারগুলোর (পশ্চিম ও উত্তর) এতদিনের রিপাবলিকান ঐতিহ্য ত্যাগ করেছে 'নিউ ডীল'-এর সময়ে। এখন এখানকার ভোটও অনিশ্চিত এবং দ্বিধাবিভক্ত। যদিচ এক দলের বিরুদ্ধে অন্য দলকে দাঁড় করিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখতে চেষ্টা করছে।

শ্রমিকরা এখনও ডেমোক্রেটদের নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু এত ভাল আছে যে তারাও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মাঝপথের নীতি অনুসরণ করছে। এমন কি নেতারা অন্য পথে চালিত করতে চাইলেও তারা অনেকেই রিপাবলিকানদের ভোট দেয়। সমৃদ্ধিই এদের মধ্যে রাজনৈতিক সতর্কতা এনে দিয়েছে, এমনকি নিজেদের ক্ষেত্রেও—সেখানেও ইউনিয়ন অত্যধিক শক্তিশালী হবে, এমন আশঙ্কাও আছে। শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান বেতন যে শ্রমিক মালিকদের ব্যবধানের পরিধিকে সংকীর্ণতর করে দিচ্ছে, তার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য সর্বত্র পাওয়া যাবে। সমৃদ্ধিশালী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত জনসংখ্যার আধিক্য নিয়তই বেড়েই চলেছে। আধুনিক রাজপথের ন্যায় মধ্যভাগের মত গোটা রাস্তাটাই এখন একই রকমের উৎকৃষ্ট ধরণের এবং গর্ত-টর্ত আর নেই বললেই চলে—শুধু মাঝে মাঝে নরম জায়গাগুলো এড়িয়ে চললেই হল।

তা হলে কাকে ভোট দেবে তা স্থির করা হয় কি ভাবে?

অংশতঃ ঐতিহ্য অনুযায়ী স্থির হয়—বাবা আগে কোন পক্ষে ভোট দিয়েছেন, কোন সামাজিক অথবা সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত হওয়া সম্পর্কে ভোটদাতার ব্যক্তিগত ধারণা থেকে। ভোটদাতার বন্ধু ও প্রতিবেশীরা কি বলেন এবং কখনও বা প্রার্থী কি বলেন অথবা করেন তা থেকে। আর নির্ধারিত হয় ভোটদাতার আয় এবং নির্বাচন-প্রার্থীর কার্যক্রম থেকে, সে-আয় বিপদাপন্ন হবে অথবা বর্ধিত হবে তার উপর। অথবা ভোটদাতা কোথায় বাস করেন—সহর কিংবা পল্লী অঞ্চল, বস্তি, কিংবা সহরতলী—তার উপর। নেতা সম্পর্কে ভোটদাতার ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে—নির্বাচন প্রার্থীর আবেদনের উপর; নির্বাচন প্রার্থীর অধিকার খতম করতে চান অথবা স্থিতাবস্থা জিয়িয়ে রাখতে চান, তিনি আদর্শ পিতা অথবা ঘৃণ্য উপরওয়ালা; নির্বাচন প্রার্থীর কার্যক্রমের কোন বিশেষ অংশ সম্পর্কে ভোটদাতার আগ্রহ—যেমন বনসম্পদ সংরক্ষণ, নাগরিক অধিকার, কমিউনিজম বিরোধীতা; বড় ব্যবসায়ী, বড় শ্রমিক উচ্চহারের কর, দপ্তরে অক্ষমতা অথবা অকর্মণ্যতার বিরুদ্ধে ভোটদাতার প্রতিবাদ জানানোর সংকল্প থেকেও ভোট প্রার্থী নির্বাচন করে।

তবে শেষ পর্য্যন্ত, সম্ভবতঃ, টেলিভিশনে সকল প্রার্থীদের দেখতে দেখতে আর খবরের কাগজ এবং সাময়িক পত্র-পত্রিকায় তাঁদের বক্তৃতা পড়তে পড়তে অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়েন। ভোটদাতা সেই অবস্থাতেই ভাবতে ভাবতে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে যান এবং রিপাবলিকান—কিংবা ডেমোক্রেটকে ভোট দেন—যা বারবার তিনি করেছেন। তাঁর যেন ধারণা হয় এই তাঁর দল।

এই দুটো রাজনৈতিক দল আমাদের ইতিহাস, সাম্প্রদায়িক উৎস, ধর্মবিশ্বাস, পেশা, ও ভূগোলেরদান এবং আমাদের অতিশয় মূল্যবান সমাজ ব্যবস্থার পতাকাবাহী যার বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথার এখানে পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই। সম্ভবতঃ চার বৎসর অন্তর এই জেদাজেদী আর প্রতিদ্বন্দ্বীতার সবচেয়ে বড় মূল্য হল এই যে এ নতুন করে মনে করিয়ে দেয় যে বিভিন্ন বিভাগ, পেশা, সাম্প্রদায়িক পার্থক্য আমাদের বিভক্ত করলেও, মৌলিক ব্যাপারে আমরা ঐক্যবদ্ধ। এই প্রতিদ্বন্দ্বীতার মান আমাদের জানিয়ে দেয় যে, যুক্তি দর্শানোর এবং কোন মত মেনে না নেবার পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের আছে। এর ব্যাপকতা নতুন করে আমাদের বিরাটত্ব আর বৈচিত্রের কথা আমাদের জানিয়ে দেয়। এর উষ্ণতা আমাদের সংঘর্ষশক্তি এবং বিদেশী ভাবধারার মোকাবেলা ও তাকে পরাজিত করার ভাবধারার কথাই বলে। এক দল অন্যের বিরুদ্ধে এই ভেবেই

যেন লড়াই করে যে, তারা শত্রু, রিপাবলিকের অস্তিত্বই বিপদাপন্ন করে তুলেছে। এভাবেই আমরা এ সম্পর্কে নিশ্চিত হই যে, প্রয়োজন হলে আমাদের নির্বাচিত জীবন-যাপন পদ্ধতিকে বিপদমুক্ত করবার জন্যে আমরা লড়তে পারি।

কিন্তু নির্বাচনী অভিযান শেষ হলে এবং জয়-পরাজয় নিরূপনের উপযোগী ভোট গণনা হয়ে গেলে, বিজিতপ্রার্থী জাতির সম্মুখে হাজির হন বিজয়ীর প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। বিজয়ীপ্রার্থী আর দুর্ধর্ষ আক্রমণ-কারী থাকেন না, হঠাৎ আদর্শের রক্ষাকারীতে পরিণত হন। এ যেন সুন্দরী রাজকন্যার (মেজরিটির) চুম্বনে মধ্যযুগীয় কোন দানবের উজ্জল রাজপুত্রের পরিণত হওয়া।

১৯৫৬ সালে অ্যাডলাই ষ্টিভেনসন বলেন, "আমাদের যা পৃথক করে, তার তুলনায় যা ঐক্যবদ্ধ করে তা গভীরতর।" আজ আমরা রিপাবলিকান অথবা ডেমোক্রেট নই, শুধু আমেরিকান। এইভাবেই যুদ্ধ শেষে আমরা বিরোধ ভুলে যাই, ক্ষত সেরে নিই, জঞ্জাল পরিস্কার করি এবং নতুন করে কাজে মেতে উঠি।

রাজ্য ও সংবিধান

চৌদ্দটি রাজ্য (ভেরমণ্ট এবং ফেডারেশনের প্রথম তেরটি সদস্য রাজ্য) ফেডারেল সরকার গঠিত হবার আগেই ছিল। ইউনিয়নে যোগদানের আগে ভেরমণ্ট; টেক্সাস আর ক্যালিফোর্ণিয়া স্বাধীন রিপাবলিক ছিল। আদি মূল তেরটি রাজ্যের সংবিধান স্বাক্ষরিত হবার আগেকার একশত আশী বছরের ইতিহাস রয়েছে; তখন প্রাদেশিক বিধান সভায় তাঁরা নিজেদের কাজ নিজেরাই পরিচালনা করেছেন, কখনও বা রাজপ্রতিনিধি গভর্ণরের সঙ্গে তুমুল বিরোধ বেধেছে, ব্রিটেন থেকে নামমাত্র হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। তখন তাঁরা গভর্ণমেন্ট চালানোর বিদ্যেটা আয়ত্ত করেন বেশ ভালভাবেই বলতে হবে, যদি আমরা জেফারসন, প্যাট্রিক হেনরী, জন অ্যাডামস এবং ম্যাডিসনের মতো মানুষ দিয়ে বিচার করি।

রাজ্যগুলোই ফেডারেল সরকারের জন্মদাতা : ফেডারেল সরকার বলতে গেলে তাদেরই সন্তান। যে মা-বাবার চোখের সামনে বাড়ন্ত সন্তান, কি করে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হয় না জেনে নিজের উপরেই আঘাত হানতে দেখে, নিজের সন্তান সম্বন্ধে ভীত এবং কিছুটা বিরক্ত হতে দেখা যায়; তাঁদেরই মত

রাজ্যসমূহ ফেডারেল সরকার সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। তুলনায় বড় এবং শক্তিশালী সন্তানের বোধ হয় জন্মদাতার প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা নেই। উপ-ঢৌকন দিয়ে ভরে দিলেও সে চায়, তাঁরা যেন তার কথামতোই চলেন।

রাজ্য সরকারগুলোর গুরুত্ব অনেকটা কমে গেছে একদিকে শক্তিশালী ফেডারেল সরকার আর অন্যদিকে ক্রমবর্দ্ধমান সহরের জন্যে। রাজ্যসমূহের আগেকার সে গুরুত্ব আর নেই। তবুও ফেডারেল সরকারকে দেওয়া হয়নি এমন সব ক্ষমতা তার আজও আছে। সংবিধানে তা উল্লিখিতও হয়েছে। রাষ্ট্র নয়, রাজ্যই নাগরিককে ভোটাধিকার দেয়। রাজ্যই হল সেই উৎস, যেখান থেকে সংবিধানে বর্ণিত সরকারী ক্ষমতা প্রবাহিত হয়।

নাগরিকের মধ্যে যে অনেক আনুগত্যের প্রয়োজন, তার মধ্যে একটি হল রাজ্যের প্রতি আনুগত্য। আনুগত্যের অনুভূতি খাঁটি এবং প্রবল হতে পারে জন্ম, পারিবারিক ঐতিহ্য, মেনে নেওয়ার ইচ্ছে-অনিচ্ছে অথবা রাজ্যের নিজস্ব ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার জন্যে।

অনেক রাজ্যে বিরাট বৈচিত্র থাকলেও—যেমন উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত গ্রামীণ নিউ ইয়র্ক রাজ্য ও নিউ ইয়র্ক সহর, মাঝখানে পাহাড় দিয়ে ভাগ করা ওয়াশিংটন ও অরিগণ, যার ফলে পশ্চিমাঞ্চল শিল্পপ্রধান আর পূর্বাঞ্চল কৃষি প্রধান --প্রতিটি অংশ মনের আবেগ আর সংস্কৃতির আকর্ষণে আবদ্ধ যা বিভিন্ন জাতি, পেশা আর দেশাচারের বৈচিত্রপূর্ণ সুরের মধ্যেও ঐক্যতান সৃষ্টি করে।

রাজ্যবিধান সভাগুলির অধিবেশন বসে সাধারণতঃ দুই বছর অন্তর, কয়েক মাসের জন্যে। তাই প্রতিনিধি হিসেবে যাঁরা আসেন, তাঁরা অন্যত্র কাজ করেন এবং যা পান তাতে শুধু ব্যয় নির্বাহই হতে পারে। এর ফলে দুর্নীতি উৎসাহ পায়। বিধানসভার কোন সদস্য কোন শিল্পের পক্ষে ব্যয়বহুল বিল শুধুমাত্র রচনা করলেই, তা প্রত্যাহারের জন্যে ঘুষ পেতে পারেন। কিন্তু রাজ্য-সমূহের রাজধানীর সংবাদ সংগ্রহ এবং সকল আয় ডাইরেক্টর অব ইন্টারন্যাল রেভিনিউর কাছে রিপোর্ট করার প্রয়োজন অথবা আসামী হিসেবে অভিযুক্ত হবার আশঙ্কা সকলকে দুর্নীতিপরায়ণতার প্রলোভন থেকে সাবধান করে দেয়।

স্কুলের মান নির্ধারণ, রাস্তা নির্মান, আদালতসমূহের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রথার প্রচলন, কারাগৃহ, সংস্কারকেন্দ্র অথবা রিফরমেটরিজ, অন্ধদের দায়িত্ব গ্রহণ, মানসিক বিকারগ্রস্ত এবং অপর যারা নিজেদের দায়িত্ব গ্রহণে অসমর্থ তাদের জন্য সংগঠন, বেকার জীবনেএবং বার্ধক্যে সাহায্য ব্যবস্থা, কর্মসংরক্ষণকেন্দ্র চালানো,

রাজ্যের পুলিশ এবং রাজপথে পাহারার ব্যবস্থা, রাজ্যে গভর্ণমেণ্ট সংরক্ষিত পার্ক, বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারের দেখাশোনা, টুরিষ্ট ও নতুন নতুন শিল্পকে রাজ্যে আকৃষ্ট করা, বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় সাধারণের প্রয়োজনীয় শক্তির মূল্যমান নিয়ন্ত্রণ ও তাদের পরিচালন ব্যবস্থা ও অন্যান্য অনেক কাজে রাজ্য সরকারসমূহের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। নিউ ইয়র্কের মত বড় রাজ্যের বেশী ব্যয় বরাদ্দ থাকে এবং পররাষ্ট্রনীতি ব্যতীত, প্রতিটি ব্যাপারেই বহু স্বাধীন রাষ্ট্রের চেয়ে নাগরিকদের অধিক সাহায্য করে।

ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট করে এবং বাকী ক্ষমতা রাজ্য অথবা জনগণের হাতে তুলে দিয়ে সংবিধান যে সূত্র বের করেছে কেউই তাকে সংশোধন করার উপর তেমন গুরুত্ব দেয় না। কারণ সংবিধান অপরিবর্ত্তনীয় হলেও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাকে কিছুটা প্রয়োজনীয় আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। সংবিধান স্রষ্টাদের ফেডারেল সরকারকে কি কি কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না, তথাপি রেলরাস্তা নিয়ন্ত্রণ থেকে বাস্তব ক্ষেত্রে সার্বজনীন পেনসন পরিকল্পনার মত অনেক কাজই এক ছত্রচ্ছায়ায় এসে জমা হয়েছে।

আমেরিকনদের বিশ্বাস এই যে, সংবিধান প্রতিষ্ঠাতা পিতারা ভবিষ্যতের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে যা-কিছু করণীয় করে গেছেন আর সংবিধান, যথার্থভাবে অর্থাৎ নমনীয় ভাবে—ব্যাখ্যাত হলে এবং সময়ে সময়ে আংশিক পরিবর্ত্তিত হলে, সব সময়েই আমাদের চাহিদা মিটবে। আর একটার জন্যে এটাকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব পাগলামি এবং চলতি হাওয়ার পরিপন্থী হিসেবে পরিগণিত হবে। একে আমরা রাজনীতি অভিজ্ঞতার শেষ কথা হিসেবেই মনে করি।

সংবিধানকে এত শ্রদ্ধা করি কেন ?

এটি সুনির্দিষ্ট লিখিত দলিল—যে কেউ পড়তে পারে। এ নমনীয়—নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার শক্তি আছে। বৈচিত্রপূর্ণ জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যস্থাপনায় এর ক্ষমতা ইন্দ্রজালের মতই। এতে কাজ চলে, ১৭০ বছরের পরীক্ষা এটাই প্রমাণ করেছে। বিশেষ অধিকারের সমর্থক রক্ষণশীল ব্যক্তি সংবিধানের কাছে আবেদন জানান, ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপের জন্য অভিযুক্ত কমিউনিষ্ট এই সংবিধানেরই নামাবলী গায়ে দেন ; স্কুলের ছেলে সংবিধানকে জানে স্বাধীনতার উৎস হিসেবে, বহিরাগতরা একে অধিকার সনদ বলে মনে করেন, এর মাধ্যমেই তাঁরা নাগরিকের সুখ-সুবিধা অর্জনের কথা ভাবেন। উত্তেজনা আর উলটপালট ভরা দুনিয়ায় এই সংবিধান আমাদের পায়ের

তলায় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে শক্তি যোগাচ্ছে। ফ্যাসিজম অথবা কমিউনিজম্-এর মাধ্যমে বর্ত্তমান বিশ্ব যে সব অবিচ্ছেদ্য অধিকার থেকে জনসাধারণকে বঞ্চিত করবার চেষ্টা করছে, সংবিধান সেগুলিরই গ্যারিন্টি স্বরূপ। সংবিধান সরকারের তিনটি দপ্তরের কাজ খতিয়ে দেখে এবং ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা করে, স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা রক্ষার পুরাতন সমস্যার সমাধান করেছে। ঠিক এই রকমই করেছে বিচারবিভাগের পুনর্বিবেচনার অধিকার, যা বিচারকদের চলতি আইন নয়, সংবিধানের উপর ভিত্তি করে মতামত স্থির করার কর্তৃত্ব দিয়েছে।

রাজনৈতিক যন্ত্র হিসেবে সংবিধানের বিশেষ গুণ হল এই যে, এতে সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে ফেডারেল সরকারকে সরাসরি কর্তৃত্বাধিকার দিয়েছে, যা রাজ্যের অধিকারের সমান্তরাল হলেও তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। আর সুপ্রীম কোর্টে সকল বিরোধের সালিশ ও নিষ্পত্তির মুখপাত্র স্থাপিত হয়েছে।

আদালত ও ব্যক্তি স্বাধীনতা

মার্কিন রাষ্ট্রব্যবস্থার বিশেষ গুণ এই যে, এখানে রাজ্য আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে ফেডারেল কোর্ট আছে সংবিধান আর ফেডারেল আইন-কানুন থেকে উদ্ভূত মামলার বিচারের জন্যে। সকল নাগরিকই এই দুই শ্রেণীর আদালতের অধীন এবং তাদের সাহায্য নিতে পারেন।

ফেডারেল পর্য্যায়ে রয়েছে সুপ্রীম কোর্ট (একজন প্রধান বিচারপতি এবং আটজন সহযোগী বিচারপতি। এঁরা ওয়াশিংটনে বসেন), দশটা আপীল আদালত (সারকিট কোর্টস অব আপীল) এবং একশ'র মত জেলা আদালত। দুই রাজ্যের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে অথবা কোন রাজ্যের নাগরিক ভিন্ন রাজ্যের নাগরিকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করতে চাইলে, ফেডারেল আদালতের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। আদালতগুলির একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল ফেডারেল আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ এবং আইন অথবা প্রশাসন সংবিধানপ্রদত্ত ক্ষমতা অতিক্রম করেছে কি না তা স্থির করা।

সম্ভবতঃ সুপ্রীম কোর্টের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হল পরিবর্তনশীল যুগের দিকে লক্ষ্য রেখে সংবিধানকে নমনীয় হিসেবে দেখা ও সেইমত ব্যাখ্যা করা। এই পথেই যে দলিলের উপর আমাদের উল্লেখজনকভাবে দৃঢ়বদ্ধ সরকারের ভিত্তি তাকে শ্রদ্ধা দেখিয়ে যেতে পারে এবং সেই সঙ্গে তাকে চলতি হাওয়ার সঙ্গে দুলতে দিতে পারে নোঙর বাঁধা অবস্থায়। বর্তমান শতাব্দীর সিদ্ধান্তের ঝোঁক দেখা

গিয়েছে সরকারের সামাজিক দায়িত্ব ও মানুষের অধিকার সম্পর্কে নিয়ত সম্প্রসারণশীল ধারণার দিকে।

এর সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন একটি সাম্প্রতিক বিচারের রায়, যাতে স্কুল ও যাত্রীবাহী যানে নিগ্রো ও শেতাঙ্গদের পৃথকীকরণ ব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটেছে।

১৯৫৪ সালে সুপ্রীম কোর্ট স্থির করেন, "জনশিক্ষার ক্ষেত্রে 'পৃথক কিন্তু এক' মতবাদের কোন স্থান নেই। শিক্ষার জন্য পৃথক সুবিধাদানের ব্যবস্থার মধ্যেই রয়েছে অসাম্য।" বিরোধের ক্ষেত্রসমূহের দুর্নাম অধিক প্রচারিত হলেও, শত শত স্কুল নির্ঝঞ্ঝাটে একত্রিত হয়েছে। এই একত্রিত হওয়া ব্যাপারে কয়েকটি রাজ্য-আইন কৌশলের আশ্রয় নিলেও, একীকরণের কাজ এগিয়ে চলেছে।

সাম্প্রতিক দুই বছরের এক সার্ভেতে দেখা যায় যে, হাজারের অধিক ক্ষেত্রে জীবনের সকল পর্য্যায়ের বর্ণ বৈষম্য দূরীভূত হয়েছে। দক্ষিণাঞ্চলের যিনি এই সার্ভে চালান, রিপোর্টের উপসংহারে তিনি বলেছেন, "দক্ষিণে পৃথকীকরণের ফলে অসাম্য আর কিছু নেই...অসাম্য অ-পৃথকীকরণ সম্ভব নয়—এই ধারণাকে সার্ভে রিপোর্টের তথ্যসমূহ সমর্থন করে না।"

পৃথকীকরণ নেই এমন স্থান এবং বিভাগের দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ঘর-বাড়ী, জনস্বাস্থ্য, বে-সরকারী উদ্যোগ, যান-পরিবহন এবং স্থান সঙ্কুলান ব্যবস্থা। এর অন্তর্গত ছিল ১৬৪টি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় যাঁদের দ্বার নিগ্রোদের জন্যে উন্মুক্ত হয়েছে এবং বহু নিগ্রো উচ্চপদে নির্বাচিত অথবা নিযুক্ত হয়েছেন।

জিম ক্রো—বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের আবিষ্কার অনেকে ধরে নিলেও, এটা পুরাতন সংগঠন নয় এবং এখন শেষ হতে চলেছে। দক্ষিণের উদারমনা বাসিন্দারা জানে যে, প্রত্যেকের অনিষ্ট না করে এমন একটা ব্যবস্থা জীয়িয়ে রাখা যায় না।

একমাত্র লাওসিয়ানাতেই নিগ্রোদের ভোট ১৯৪৮ সালে ১,৬৭২ পেরিয়ে ১৯৫২ সালে ১০৮,৭২৪-এ পৌঁছায়। এমন বৃদ্ধি অন্যত্রও ঘটেছে।

সম্ভবতঃ কালের সবচেয়ে আশ্চর্য্যজনক পরিবর্ত্তন হল এই যে, গ্রাণ্ড ড্রাগন ফ্লোরিডা কু ক্লুক্স ক্লান নিগ্রোর সদস্য হতে পারে বলে ঘোষণা করেছে!

অবশেষে দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, ব্যাধি এবং সুযোগের অভাবের শনিচক্রকে আক্রমণ করা হচ্ছে। নিগ্রোরা এই শয়তানী চক্রের জন্যেই নীচে থেকে গেছে। অনেক শ্বেতাঙ্গ সোজাসুজি বিশ্বাস করেন যে, নিগ্রোদের অনগ্রসরতার মূলে কোন জৈব কারণ আছে, সুযোগ এবং তার জঘন্য জীবনপদ্ধতি এর জন্যে দায়ী নয়

যদিও ব্যাধি এবং অপরাধ ও পথেই আসে। অনেক হতভাগ্য শেতাঙ্গদের নিজের প্যাচ চাপিয়ে দেবার জন্যে নিগ্রোর স্কন্ধের প্রয়োজন ছিল, নিজের হীন অবস্থাতেই হয়ত এতে তিনি সান্ত্বনা পেতেন। রাজনীতিবিদেরা এই মনোভাবের সুযোগ নিয়ে ভোট সংগ্রহে উৎসুক ছিলেন। আদালত এবং পুলিশও প্রায়শঃই নিগ্রোদের ভয় দেখিয়েছে, বণিক তাদের বঞ্চিত করেছে এবং সংবাদপত্র তার শোচনীয় জীবনযাপনপদ্ধতি ও যে পরিমাণ অন্যায় আর অবিচার তাকে হজম করতে হয়, তার কোন উল্লেখই করে নি।

তবুও লিঞ্চিং-এর বিরুদ্ধে সংবাদপত্র স্পষ্ট ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছে। (এই বর্বর পদ্ধতিটি সীমান্তের পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত হয় এবং শেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ উভয়ের উপরই প্রযুক্ত হয়েছে)। ১৯৫১ সাল থেকে এই প্রথাটির অবলুপ্তি ঘটেছে মনে হয়, যদিও ভয় দেখান অথবা নির্দয় ব্যবহারের অন্যান্য পদ্ধতি এখনও উঠে যায় নি।

ব্যক্তি স্বাধীনতার আর একটা দিক হল তথাকথিত আনুগত্যের কার্যসূচী যা সাম্রাজ্যবাদী, স্বৈরাচারী কমিউনিজম-এর বিশ্বব্যাপী হুমকীতে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। ধ্বংসাত্মক-কার্যকলাপ-নিয়ন্ত্রণ বোর্ডকে অজস্র ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যার অপপ্রয়োগ হলে সরকারী চাকুরেদের চাকরী যেতে পারে এবং অন্যত্র চাকরী পাবার সম্ভাবনাও দূর হয়। এ আইন স্বেচ্ছা-সংগঠনের বিরুদ্ধেই হুমকী দিচ্ছে, কারণ এতে জনসাধারণকে পরে তদন্ত হতে পারে, এমন সংস্থায় যোগ-দান করতে উৎসাহিত করে নি। এই পদ্ধতি পাঁচ বছর কাজ করার পর ধ্বংসবাদী সংগঠন সম্পর্কে চল্লিশ হাজার পৃষ্ঠার সাক্ষ্য সংগ্রহ করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই করা হয় নি। আমাদের নিরাপত্তা যদি সত্যই বিঘ্নিত হয়ে থাকে, এই ব্যবস্থা তার হদিশ পায় নি এবং চেষ্টার অভাব তার কারণ নয়।

আভ্যন্তরীন লালফৌজের আতঙ্ক এখন আর নেই। অধিকাংশ নাগরিকই এখন বুঝতে পেরেছেন আমরা ঐক্যবদ্ধ জাতি। বিপজ্জনক কমিউনিষ্টদের সংখ্যা খুব কম হলেও আমাদের তৎপর থাকা এবং আমাদের শক্তির ভিত্তিস্বরূপ ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং বিশ্বের নৈতিক নেতৃত্ব রক্ষা করে চলা উচিত। বিদেশে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এই আমাদের হাতিয়ার। এই অধিকারসমূহ রক্ষার জন্যে আমেরিকানরা আবার স্বেচ্ছাসংগঠনের স্মরণাপন্ন হয়েছে। এই ব্যাপারে সবচেয়ে সুপরিচিত সংস্থা হল সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন, যা নিজস্বমত প্রকাশের স্বাধীনতায় অবিশ্বাসীদের এই অধিকার দানের বিরোধীদের বিরুদ্ধে, যারা

সংখ্যালঘুদের চাকরী বা ভোট দিতে চান না তাদের বিরুদ্ধে অথবা যারা শ্রমিকদের সংগঠনকে মেনে নিতে চান না তাঁদের বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রাম করছেন। 'লিগাল এড সোসাইটিজ' মামলা চালানোর অর্থ যোগাতে পারে না এমন ব্যক্তিদের বিনামূল্যে কৌঁসুলী সংগ্রহ করে দেন এবং এই আশ্বাস দেন যে, পেশাগত পরামর্শের অভাবে কেউ মামলায় হারবে না।

মার্কিন গণতন্ত্রের পার্শ্বচিত্র

তা হলে যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সরকারের বৈশিষ্ট কোথায় ?

প্রথমতঃ, এখানে জোর দেওয়া হয়েছে দেশের লোক দেশ শাসন করবে এবং স্থানীয় লোক শাসন ব্যাপারে অংশ নেবে—এর উপরে। জনগণের হাতে শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকা এক হিসেবে খুব যুক্তিযুক্ত মনে হলেও, আন্তর্জাতিক সঙ্কটমুহূর্তে এ বিপদ ডেকে আনে কারণ, তখন স্থানীয় সমস্যা আন্তর্জাতিক প্রয়োজনকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, সরকারী ব্যবস্থার চালক ও পরিচালক হিসেবে স্বেচ্ছা-সংগঠন-সমূহের বিশেষ গুরুত্ব। এরা আইন প্রণয়ন ও আইন প্রণেতার উপর প্রভাব খাটান, সরকারী বিভাগসমূহের যোগাযোগ সাধন করেন এবং এমন অনেক কাজ করেন যা অন্য দেশে সরকারকেই করতে হয়। যে অঞ্চলে বহু রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে এবং যেখানে বহু সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে সরকারী শাসন বিভাগের আওতায় প্রেরিত হয়, স্বেচ্ছা সংগঠনসমূহ সেখানে আমলাতন্ত্র এবং সরকারী শক্তির বিরুদ্ধে ভারসাম্য রক্ষা করেন। সমস্যার জটিলতা আর বিরাট পরিধির জন্য সরকারের পক্ষে জনগণ থেকে পৃথক হয়ে যাবার আশঙ্কাও আর ততটা থাকে না।

তৃতীয়, সরকার ও তার কাজকর্মের নিয়ত এবং, এমন কি, কঠোর সমালোচনা। সংবাদপত্র, বিশিষ্ট ব্যক্তি, রাস্তার মোড়ের সমালোচক, কংগ্রেসের সদস্য, স্বেচ্ছাসংগঠন এবং অবশ্যই সাগরপারের বিদেশীরা জড়িত থাকেন এই ব্যাপারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই সর্বপ্রথম প্রাপ্ত বয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকার মেনে নেয় (ক্রীতদাস ব্যতীত), সর্বপ্রথম সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকার করে, সর্বপ্রথম চার্চ ও রাজ্য ক্ষমতাধিকারকে পৃথক করে, সর্বপ্রথম কঠোর শাস্তিদান ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটায়, প্রথম কারাগার সংস্কার সম্পাদন করে এবং অবৈতনিক গ্রন্থাগারের ও জনসাধারণের শিক্ষার প্রবর্তন করে।

চতুর্থ, স্থায়ীভাবেই মার্কিন সরকার জনগণের সরকার, কোন বিশেষ শ্রেণীর সরকার নয়। দ্য তকেভেলি ঠিকই বলেছিলেন, এতে সমাজ কম উন্নত হলেও ন্যায়ের পথ ধরে চলে।

পঞ্চম, এ এমন এক সরকার যা জনগণের আশা আকাঙ্খাকে রূপায়িত করবার দক্ষতার উপর দাঁড়িয়ে আছে। গতির দিক দিয়ে জবুথবু ও মন্থরগতি হতে পারে, কারণ জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনেক পৃথক আর পরস্পর-বিরোধী ইচ্ছার সংমিশ্রণে রচিত—তবুও শেষ পর্যন্ত জনগণের ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। বিরাট সর্বাত্মক পরিকল্পনা নয়, ধীরে ধীরে, তৎপরতার সঙ্গে, প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ হয় এখানে। বড় বড় পরিকল্পনা সম্পর্কে (যা সব সময়েই স্বৈরাচারী অথবা একনায়কত্ববাদী শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট,) আমেরিকানরা, বলাবাহুল্য সব সময়েই সন্দিগ্ধ।

এবং ষষ্ঠতঃ, এ সরকার ব্যবসা ও বানিজ্য-ভিত্তিক। প্রায়শঃই এমনভাবে বলা হয়ে থাকে যাতে মনে হয় এমন অক্ষমতা বুঝি আর কোথাও নেই। কিন্তু উল্লেখযোগ্য সকল সভ্যতাই শক্ত, অর্থ-নৈতিক ভিত্তির (একমাত্র লুণ্ঠন ছাড়া) উপর রচিত হয়েছে। একনায়ত্ববাদী শাসনব্যবস্থা কোন না কোন ধরণের লুণ্ঠনরীতির উপর গড়ে উঠেছে। সেখানে দাস শ্রমিক আছে, অধিকৃত দেশের গোটা শিল্প ব্যবস্থাকে নেড়া করে নিজ দেশে নিয়ে আসা হয়, নয়তো যে দল অথবা শ্রেণীকে শিল্পে নিয়োগ করতে চায়, তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পত্তিকে একটা অধিকার হিসেবে দেখে এবং তাকে রক্ষা করতে চায়; অধিক আয় অথবা অধিক লাভের উপর অধিক ট্যাক্স চাপালেও, মূলধনের যে বনিয়াদ থেকে মুনাফা আসে তাকে গণতন্ত্র খতম করে ফেলে না। কারণ অর্থকে গণতন্ত্র অন্যায় বস্তু হিসেবে নয়, শক্তির উৎস হিসেবেই দেখে, যা থেকে আসে সব সুযোগ-সুবিধা। একমাত্র ধনী এবং উৎপাদক দেশেই নাগরিদের সেই সব অধিকার দিতে পারে, যা গণতান্ত্রিক আদর্শে স্বীকৃত হয়েছে।

তাই যুক্তরাষ্ট্রে রাজনীতি আর অর্থনীতি মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। সরকারী নিয়ন্ত্রণ অথবা ট্যাক্স চাপাতে গেলে প্রতিটি বৃহৎ অর্থ-নৈতিক শিল্প তাদের হত্যা করা হচ্ছে বলে চিৎকার করে অথচ সকলেই সবসময়ে সরকারের সাহায্য ও সমর্থন চেয়ে থাকে।

তাহলে এধরণের অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার কর্মপদ্ধতি কি?

প্রাচুর্যের মধ্যে

আমরা বৈপ্লবিক যুগে বাস করি। দূর থেকে আমাদের এই যুগটাকে যখন দেখা যাবে, তখন মনে হতে পারে আমাদের প্রথম বিপ্লবের ফলে এ সময়ে উৎপাদন আর উপভোগ নতুন পর্য্যায়ে পৌঁছয় এবং রাজনৈতিক গণতন্ত্রের আশ্বাসের ন্যায় অর্থ-নৈতিক গণতন্ত্রও, পুরোপুরি উপলব্ধি করা না গেলেও, দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে।

নিজের জনসংখ্যার মাত্র সাতভাগ নিয়েই যুক্তরাষ্ট্র দুনিয়ার সকল পণ্য আর প্রয়োজনের চল্লিশ ভাগ মেটাচ্ছে। এখনকার জাতীয় উৎপাদনের অঙ্ককে জন-সংখ্যার অঙ্ক দিয়ে ভাগ করলে দেখা যাবে, ফলাফল ইউরোপের সর্বাধিক উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রের দ্বিগুণ। ইন্দোনেশিয়ার দশগুণ। ১৮৯০ সালের তুলনায় ১৯৪০ সালের মোট জাতীয় উৎপাদন পাঁচগুণ বৃদ্ধি পায়। উৎপাদনের এই ক্রমবর্ধমান হার অব্যাহতই আছে, যার ফলে অধিক হারে পণ্য পাওয়া যাচ্ছে এবং চাহিদা মিটছে। ক্রয়ের জন্যে যেমন প্রয়োজন তেমন আয়ও বাড়ছে। শ্রমিক পিছু উৎপাদনের হার গত আশী বছরে শতকরা দুইভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৮২০ থেকে ১৯৩০-এ আমাদের দেশের উৎপন্ন বিদ্যুতের মাথা পিছু পরিমাণ শতকরা চল্লিশ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ১৯১০ সালে মোট শ্রমজীবিদের মধ্যে শ্রমিকরা ছিল শতকরা ২১ জন; ১৯৪০ সালে শতকরা ১১ জন মাত্র। উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ নিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে, অথচ তার জন্যে মানুষের যে মেহনতের প্রয়োজন হত, তার পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে।

যুদ্ধের পর থেকেই দেশের উৎপাদন ক্ষমতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মূল-ধনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৩৩ বিলিয়ন ডলার। ইস্পাত শিল্প এবং বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদকেরা নতুন চাহিদা মেটানোর জন্যে তাদের কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত করে চলেছেন। কৃষিতেও উৎপাদনের হার অদ্ভুতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৮২০ সালে আমাদের কাজের লোকের শতকরা ৭২ ভাগ ব্যাপৃত থাকত দেশের খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের কাজে। ১৯৫০ সালে খামারের কাজে লেগে আছে শত-করা ১১ ভাগ, যারা নিজেরাই শুধু খাচ্ছেন তা নয়, দেশকেও খাওয়াচ্ছেন।

কারিগরী বিপ্লব ম্যালথুসের নিষ্ঠুর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে প্রমাণিত করেছে জমি, শ্রমিক আর মূলধনের উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করে এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণের সহজ সরল

আর কার্য্যকর ব্যবস্থা উদ্ভাবন করে। ইতিহাসে এই প্রথম অনশন আর ব্যাধিকে জয় করবার ক্ষমতা মানুষের হাতে এসে গেছে। যে কোন দেশের অর্থ-নীতি নির্ভর করে তিনটি মূল বিষয়ের উপর—প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রম আর মূলধন। ধরে নেওয়া হয়েছে যে যুক্তরাষ্ট্রের সমৃদ্ধির কারণ তার সম্পদ; অথচ জনসংখ্যার আনুমানিক হার দিয়ে তুলনা করলে আমাদের সম্পদ, সোভিয়েত রাশিয়া, অথবা অধীন রাষ্ট্রসমূহসহ পশ্চিম-ইউরোপের চেয়ে কিছু বেশী নয়। আর আমাদের এই প্রাকৃতিক সম্পদ সেই ত্রিংশ দশকের তুলনায় (যখন আমরা স্বল্প উৎপাদন আর সত্যিকারের অভাবের ভয়ঙ্কর অসুবিধার মধ্যে ছিলাম) কিছু বেড়ে যায়নি।

এখনকার উৎপাদনের মান তাই, শুধু জাতীয় সম্পদ থাকলেই উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। সম্পদের দিক দিয়ে সবচেয়ে গরীব নিউ-ইংলণ্ড দেশের সবচেয়ে ধনী-অংশে পরিণত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে তার শিল্পকে উন্নত করে, অথচ দক্ষিণাঞ্চল অত্যন্ত সম্পদশালী হলেও দাস শ্রমিক দিয়ে কাঁচা মাল উৎপাদন করতে থাকে এবং গরীবই থেকে যায়। স্পেনের অধিবাসীরা সারা দুনিয়ায় ঘুরলেও সজীব, উৎপাদক অর্থনীতির পত্তন করতে পারে নি। মূল্যবান সম্পদের মতই মানুষের প্রয়াস একটা জোরদার শক্তি। টেকোনাইটের ন্যায় নিকৃষ্ট ধাতুর ব্যবহার থেকেই বোঝা যায়, মানুষের চিন্তাশক্তি কি করে সম্পদ "সৃষ্টি" করতে পারে।

বিদেশীদের আগমন শ্রমের চাহিদা মেটালেও শ্রমিকের অভাব ছিলই। অভাব ছিল মূলধনেরও। বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়েছে ওসব। শ্রমিকের অভাব এবং তাদের অত্যাধিক বেতনের হার থেকে অধিক শিল্পকরণ ও অধিক যন্ত্রকরণ উৎসাহিত হয়। লাভের টাকা নিয়োজিত হয়েছে আরও অধিক উৎপাদক যন্ত্রাদিতে। উদ্ভাবনীশক্তির ফলে নতুন নতুন কার্য্যকর যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। এখন মূলধন বৃদ্ধি নির্দ্ধারিত শ্রম ঘণ্টা হ্রাসের সঙ্গে সমান তালে চলেছে।

এ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট হল বৃদ্ধি। উৎপাদন, প্রকরণ, পদ্ধতি, শ্রমিক-পিছু উৎপাদন এবং ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতার বৃদ্ধির উপরই এই ব্যবহার ভিত্তি।

প্রাচুর্যের অর্থনীতি

ইউরোপের মতোই যুক্তরাষ্ট্রের যাত্রা সুরু হয়েছিল ধীরে সুস্থে, কিন্তু বিশ্বের বাকী অংশকে সে পেছনে ফেলে দিয়েছে। এর একটা কারণ এই যে তার

রাজনৈতিক প্রবণতা ছিল প্রাচুর্য্যের দিকে, অভাবকে জীয়িয়ে রাখবার দিকে নয়। এখানকার নাগরিকেরা সাগ্রহে, এমন কি বেপরোয়াভাবে সম্পদকে কাজে লাগিয়েছে। সে-ও কোন বিশেষ শ্রেনীর জন্যে নয়, (যদিচ শিল্পপতিদের যুগে অসাম্য এবং বিশেষ অধিকারের প্রাচুর্যই ছিল) সর্কলের জন্য।

শিল্পের নিরবিচ্ছন্ন উৎপাদন কয়েকটি ধারণার উপর দাঁড়িয়েছিল : হাজার হাজার পৃথক ব্যবসায়ী সংগঠন এবং বাজারের পরিবর্ত্তনশীল চাহিদার উপর উৎপাদনের দায়িত্ব অর্পিত থাকলেও, অর্থনীতির গতি প্রকৃতির উপর লক্ষ্য রাখবার দায়িত্ব সরকারের এবং প্রয়োজনের সময় তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে অথবা নির্দ্দিষ্ট পথে চালিয়ে যেতে হবে ; সরকারের ট্যাক্স ধার্য্যের অধিকার থাকলেও ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা তার এক্তিয়ারের বাইরে ; ব্যক্তি এবং সংগঠনের, যে কোন কাজের অথবা পণ্যদ্রব্যের জন্যে চুক্তিবদ্ধ হবার স্বাধীনতা আছে ; অর্থনীতির প্রধান ক্ষেত্রগুলিকে (শ্রমিক, কৃষি, সংগঠন বা কর্পোরেশন) অটুট রাখবার জন্যে তাদের মধ্যে খেলোয়াড় সুলভ ভারসাম্য রাখতেই হবে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বোধ হয় এই যে, আমেরিকানরা চিরকালই ঐশ্বর্য্যকে গতিশীল মনে করেছে, তাকে মূল্য দিয়েছে অধিক ঐশ্বর্য্য উৎপাদনের মাধ্যম হিসেবে। জমিয়ে রাখার কথা ভাবেনি। অভিজ্ঞতা থেকে তারা এইটুকু শিখেছে যে, পরস্পরের মধ্যে লড়াই-এর বদলে সহযোগীতা থাকলে শিল্পপতি আর শ্রমিক-গোষ্ঠী প্রকৃতি থেকে অধিক ঐশ্বর্য্য আহরণ করতে পারে। এই জন্যেই আমরা আইন করি—একচেটিয়া ব্যবসায় (মনোপলি) উৎসাহ না দেবার জন্যে (শেরম্যান অ্যাক্ট) অথবা ভয়াবহ ভাবে মূল্য কমার বিরুদ্ধে (কমোডিটি ক্রেডিট কর্পো-রেশন), শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হতে উৎসাহিত করে (ওয়াগনার অ্যাক্ট) অথবা অবস্থা বুঝে শ্রমিক সংগঠনের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে (ট্যাফ্ট হার্টলে আইন)। টেনেসি ভ্যালি অথরিটি গঠন করে আমরা পোষ্ট অফিসগুলো পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করি সরকারের উপর—অপর দিকে লক্ষ লক্ষ একর জমি বে-সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর ছেড়ে দিই পশ্চিমাঞ্চলের রেললাইন বসানোর জন্যে। একচেটিয়া ব্যবসায়ের বিরোধী আমরা টেলিফোন আর টেলিগ্রাম ব্যবস্থাকে বে-সরকারী সংগঠনের নিয়ন্ত্রণাধীনে গড়ে উঠতে দিয়েছি, কিন্তু জনস্বার্থেই সে সব নিয়ন্ত্রিত হয়। একইভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় রেল আর বিমান পথে যাতায়াত ব্যবস্থা।

মার্কিন অর্থনীতিকে যে কোন রকমে সেকেলে অ্যাডাম স্মিথ আর রিকার্ডোর নতুন সংস্করণ আখ্যা দেওয়াটাই সৌখীনতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ফেডারিক লিউইস অ্যালেন-এর মতে এই অর্থনীতি সোশ্যালিজমকে অতিক্রম করে এমন ব্যবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে যা ব্যক্তিগত প্রয়াসের সঙ্গে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন ক'রে যেভাবে আমাদের কাছে এসেছে তা অন্য দুই ব্যবস্থার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ধন নয়, বণ্টন ব্যবস্থার সমাজীকরণ করেছি আমরা বেতন বৃদ্ধি আর অধিক আয়ের উপর অধিক কর চাপিয়ে। আমাদের সোশ্যালিজম সোনালী ডিমের জন্মদাত্রী হাঁস হত্যা ও তার মাংস ভক্ষণ নয়, তাকে দিয়ে আরও সোনালী ডিম পাড়িয়ে নেওয়া।

ব্যবসা পরিচালনার মার্কিন পদ্ধতি যে নতুন নীতি উদ্ভাবন করছে তা হল প্রতিযোগীতামূলক সহযোগীতা। এই ক্ষেত্রের প্রস্তুতকারকেরা নিজেদের মধ্যে মূল্যবান চিন্তাধারা, বাণিজ্যের গোপন তথ্য, আবিস্কার, উদ্ভাবন প্রভৃতি বিনিময় করেন। তারপর বাইরে ক্রেতাদের নিয়ে তাঁদের মধ্যে চলে প্রতিযোগীতা। এই পদ্ধতির ফলে অবশ্য আমাদের অনেক ছোটখাট স্বাধীন উৎপাদককে শিল্পক্ষেত্র থেকে নিজেদের সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে।

এই রকমের কতকগুলো সুবিধার কথা আমরা ধরেই নিয়েছি, যার অবর্তমানে অর্থনীতি সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না; আইন-অনুগত নাগরিক এবং আইন প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক সরকারের অস্তিত্ব, যার উপর নির্ভর করে চুক্তি অনুযায়ী কাজ করা যেতে পারে; অথবা শক্তভাবে প্রোথিত অর্থ ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা যা অর্থ বিনিময় এবং স্বল্প ঋণ গ্রহণ ব্যবস্থাকে সহজতর করে দিয়েছে; শ্রমিকদের উপর নির্ভরশীলতা, যার ফলে এ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় সে তারা প্রতিদিন সকালে আসবে এবং রাত্রের কাজের শেষ ঘণ্টা না পড়া অবধি থেকে যাবে। এগুলো এমন সব জিনিষ নয় যা দুনিয়ার সর্বত্র আছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

এলি হুইটনে'র পরস্পর-বিনিময়যোগ্য কলকব্জা অথবা পার্ট'স উদ্ভাবনের সময় থেকেই গণ-উৎপাদনের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করা হলেও, হেনরী ফোর্ডকেই সাধারণতঃ প্রথম গণ-উৎপাদন বৃত্তকে পুরোপুরি কার্যকরী করার কৃতিত্ব দেওয়া হয়ে থাকে: স্বল্প দামের পণ্য যা লক্ষ লোকে কিনতে চাইবে, নির্মানকারী শ্রমিকদের অধিক বেতনও যেখানে গণ-উৎপাদনের ফলস্বরূপ এবং গণ-ক্রয়ের একটি উৎস। স্বল্পমূল্য, ক্রমবর্ধমান উৎপাদন এবং অধিক বেতনের ফলে অধিক মুনাফালাভ এবং বাজারের ক্রয় ক্ষমতার সম্প্রসারণ—এই হল প্রাচুর্য্যের বৃত্ত।

এমন কার্যসূচীর অনিবার্য পরিণতি হল, বড় বড় সব কর্পোরেশন, যার ফলে মূল্য নয়, উৎপাদনই প্রতিযোগীতার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। ফোর্ড, শেভ্রলেট-আর প্লিমাথ-এর মূল্যের ব্যবধান নামমাত্রই। ক্রেতা গাড়ীর যান্ত্রিক গুণাগুণ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব অথবা গাড়ীর গঠন আর রং সম্পর্কে স্ত্রীর মনোভাব অনুযায়ীই নিজের পছন্দ-অপছন্দ স্থির করেন। বড় বড় কর্পোরেশন নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগীতা করে—অ্যালুমিনিয়ম ষ্টেনলেস ষ্টীল শিল্পের বিরুদ্ধে, মূল্য হ্রাস না পেলে, জেনারেল মোটরস ইস্পাত উৎপাদন হাতে নেওয়ার হুমকী দেখান, বড় বড় চেন ষ্টোরগুলো নিজেদের প্রয়োজনীয়, ঠাণ্ডা আহার্য বস্তুগুলো উৎপাদন করবার হুমকী দেখায়।

এর পরিণতি কি একচেটিয়া ব্যবসায় ?

ইতিহাস তা বলে না। একচেটে ব্যবসায়ের মনোভাবই যুক্তরাষ্ট্রে নীতি-বিরুদ্ধ। একদা ইউ, এস, ষ্টীল ও ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল থেকে যে বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, অনেক দিন হল তা কেটে গেছে। এখন কেউই আর—এমন কি বড় বড় কর্পোরেশনগুলোও—সম্ভব হলেও একচেটে ব্যবসায় চাইবে না। কারণ প্রতিযোগীতা তাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। একচেটে ব্যবসায় অনিবার্যভাবে সরকার-নিয়ন্ত্রিত হবে এবং তারা জানে যে নূতনত্ববিহীন একই পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত (রেজিমেণ্টেড) অর্থনীতি নিজস্ব উদ্যোগে পরিচালিত এমন ৯,৮০০,০০০টি কেন্দ্রপুষ্ট অর্থনীতির সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না।

মোটরগাড়ী, ইস্পাত, তৈল, প্রভৃতি প্রধান শিল্পসমূহ চার থেকে আটটা বড় বড় কর্পোরেশনের প্রভুত্বাধীন হলেও, অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট অনেক সংস্থার পক্ষেও এই সব শিল্পে উন্নতি করবার সুযোগ আছে। চারটে বড় বড় ইস্পাত কোম্পানী নিজেদের ব্যবসায়ের তিনভাগের একভাগের মত আশীটা ছোটখাট প্রতিযোগী সংস্থার হাতে ছেড়ে দিয়েছে। পেট্রোলিয়ম শিল্পের পঞ্চ প্রধান ব্যবসায়ী ব্যবসায়ের পাঁচভাগের তিন ভাগ নিজেরা দেখাশোনা করেন, বাকীটার দায়িত্ব পড়ে অপর পাঁচশত ছোট ছোট সংস্থার উপর।

জন কেনেথ গ্যালব্রেথ যাকে সমকারী (countervailing) ক্ষমতা বলেছেন, তা কাজ করে বলেই বড় বড় শিল্পপতিরা বাজারকে গ্রাস করতে পারে না। চেন ষ্টোরস্-এর মত বৃহৎ বণ্টনকারী সংস্থাগুলোর রয়েছে, উৎপাদকদের দ্রব্য মূল্য সীমার ভিতর রাখতে বাধ্য করার সমকারী ক্ষমতা। বড় বড় শিল্প আর বড় বড় ইউনিয়ন পাশাপাশি ভাব রেখে চলেছে, ইউনিয়নগুলোর শ্রমিকদের

হয়ে দর কষাকষি করার ক্ষমতা আছে, যা না থাকলে শ্রমিকরা মালিকের কৃপাপ্রার্থী হতে বাধ্য হত।

বড় কর্পোরেশনগুলো সংগঠন হিসেবে মার্কিন জীবনের ভিত্তিস্বরূপ। এ নিয়ে কেউই সন্দেহ প্রকাশ করেন নি, যদিচ সমালোচকদের অনেকেই ওসবের তোয়াক্কা রাখেন নি। অথচ পরিমাণ আর বৈচিত্রের দিক দিয়ে স্বল্পমূল্যে পণ্য-সরবরাহের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় এরা দিয়েছে। শ্রেষ্ঠ পণ্য উৎপাদন এবং উৎপাদন ক্ষমতাবৃদ্ধি সম্পর্কে নিয়ত গবেষণা চালানোর অনেক সুবিধা আছে এই সংগঠন-গুলোর। অধিকাংশ ক্ষেত্রের ছোটখাট সংস্থার তুলনায় শ্রমিকদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক আর তাদের অধিক সুবিধা দেবার ব্যাপারে এরাই অগ্রণী হয়েছে।

আমাদের সমাজের অনেক কিছুর মত মার্কিন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও বর্ণনা করা সম্ভব নয়, কারণ এ-ও নানাধর্মী, পরীক্ষামূলক আর প্রয়োগিক (Pragmatic)। আমরা বে-সরকারী উদ্যোগের জন্যে চিৎকার করলেও, সকলেই কোন না কোন ধরণের নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী—ঋণ, একচেটে ব্যবসা, শিল্পভিত্তিক ইউনিয়ন অথবা খাদ্য শস্যের মূল্য। সকল বিরোধী স্বার্থ আর দাবীর মধ্যে সরকারকেই মধ্যস্থতা করতে হবে—যখন যেমন সুবিধা, তেমন ব্যবস্থা করতে হবে। সকলের পক্ষে উপযোগী অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা ও বিভিন্ন শক্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা লক্ষ্য হলেও, সকলেই অধিক পরিমাণে ভোগ্য বস্তু লাভের জন্য দক্ষ উৎপাদন ক্ষমতার পক্ষপাতী।

উৎপাদন

শুল্ক ব্যবস্থা দ্বারা সুরক্ষিত, মুক্ত আভ্যন্তরীণ বাজার এবং অন্যান্য উৎপাদন অঞ্চল থেকে পরিবহনের ব্যয় থেকেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লাভবান হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে কোনরূপ শুল্ক ধার্য করা হয় নাই। দ্রুত সুগঠিত পরিবহন ব্যবস্থার ফলে উৎপাদকদের পক্ষে শুল্ক-বাধাবিহীন সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদা মেটাবার জন্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এভাবেই প্রতিটি কাজে বিশেষ পারদর্শিতা সম্ভব হয়েছে এবং জনগণ কিনতে পারে এমন স্তরে পণ্যমূল্য নেমে এসেছে।

সত্যের চেয়ে আবেগের উপর অধিক জোর দিয়ে আমেরিকানরা সর্বদা স্বাধীন বাজারের কথা ঘোষণা করলেও, তারা সীমা নির্ধারণের উপরও সর্বদাই জোর দিয়েছে, যাতে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর দাবীর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষিত হয়।

বিদেশী প্রতিযোগীতার মুখে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হবে এমন শিল্পোজাত দ্রব্যের উপর আমদানী শুল্ক ব্যবস্থার প্রবর্তন, সমাজবীমা এবং শ্রমিকদের রক্ষাকবচ স্বরূপ ন্যূনতম বেতন আইন, চাষীদের জন্য সাবসিডি, ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষার্থে বিশুদ্ধ খাদ্য ও ওষুধ আইন, মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধকল্পে ঋণ নিয়ন্ত্রণ, সকলের উপকারে লাগে অথবা সকলকে রক্ষা করে এমন ব্যাপক ফেডারেল কার্যসূচীর অর্থচাহিদা মেটানোর জন্যে ক্রমিক হারে কর নির্ধারণ, ইউনিয়নের কর্মীর স্বার্থ রক্ষার্থে-সামূহিক দর কষাকষি, সাধারণের জিনিষপত্র ও রেলের ভাড়া নিয়ন্ত্রণ, বায়ুতরঙ্গ ও বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ, বিনিয়োগকারীর স্বার্থ রক্ষার্থে নিয়োজিত মূলধন নিয়ন্ত্রণ—জনমত যে সব জিনিষের উপর জোর দিয়েছে অথবা বাজার ও শিল্প নিয়ন্ত্রণের জন্য উচিত বলে সরকারকে জানিয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটি হল এইগুলো। অনেক দিক দিয়েই এই নিয়ন্ত্রণ আমাদের অর্থনীতিকে জোরদার করেছে। তবুও প্রশ্ন থেকেই যায়; আমেরিকান পদ্ধতি এত অধিক উৎপাদনের ব্যবস্থা করল কি করে?

তাওনে ও অন্যান্যেরা দেখিয়েছেন যে, প্রোটেস্ট্যান্ট নীতিবোধ,মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করতে আর অধিক উৎপাদনকে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ হিসেবে মূল্য দিতে উৎসাহিত করেছে। দ্য তকেভিলি ঠিকই দেখিয়েছেন যে, সুযোগ-সুবিধার সাম্য এবং শ্রেণীবিভাগের অনুপস্থিতি মানুষকে এখানে শিল্প-বাণিজ্যের মধ্যে যেতে উৎসাহিত করেছে। গ্রেট বৃটেনের বন্ধন থেকে মুক্তি আমেরিকান উৎপাদনকারীদের আর এক দফা বড় রকমের উৎসাহ যুগিয়েছে। পশ্চিমমুখো সম্প্রসারণ এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা থেকে জন্ম নিয়েছে ক্রমবর্ধমান চাহিদা।

দক্ষতা শিল্পের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। ষ্টপওয়াচ হাতে নিয়ে বিশেষজ্ঞরা ভীড় জমিয়েছেন পরিকল্পনার চারধারে। শ্রমিকদের শারীরিক শ্রমের বদল ঘূর্ণায়মান বেল্ট প্রবর্তিত হয়েছে, প্রতিটি শ্রমিকের কাজ কমতে কমতে কয়েকটি যান্ত্রিক চালনায় পর্য্যবসিত হয়েছে। ওঁরা অনেকদূর এগিয়েছিলেন, এখন হাওয়াটা অন্যদিকে বইছে, যাতে মানুষ অনেক কাজ করে বুঝতে পারে যে সে কিছু করল। তবুও তাঁরা প্রমাণ করেছেন, অনেক পরিশ্রমই অনর্থক অপচয় করা হয়েছে কাজের স্থান, গতি আর পদ্ধতির বিশ্রী ব্যবস্থার জন্যে।

উৎপন্ন পণ্যের আকার আর পরিমাণ নির্দিষ্ট হওয়ায় কোটি কোটি টাকা বেঁচে গেছে। চল্লিশ ধরণের হাসপাতাল বেড এক বা দুই ধরণে এসে দাঁড়িয়েছে। মোটরগাড়ী নির্মাতারা মাত্র কয়েকটি ধরণের বডি, ফ্রেম আর ইঞ্জিন তৈরীর

মূল ব্যবস্থাটা শিখে ফেলেছেন যা সমগ্র মোটরশিল্পে সামান্য অদল বদল করে ব্যবহৃত হতে পারত।

উৎপাদন মূল্যের হিসাব, পরিসংখ্যান বিষয়ক গবেষণা, চাকরী বিশ্লেষণ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, ব্যবসায় সম্পর্কে পূর্বাভাষদান, তালিকা নিয়ন্ত্রণ, উন্নত ধরণের গুদাম এবং পণ্য পাচারের উন্নত পরিবহন—প্রতিটি ব্যবস্থারই আরও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা থাকে।

আমেরিকান প্রস্তুতকারীরা স্বল্প উৎপাদন ব্যয়ের সঙ্গে বেতনবাবদ অধিক ব্যয়কে—কর্মদক্ষতার নিশ্চিত প্রতীক—একত্রিত করবার কৌশল আয়ত্তে এনেছে। পরীক্ষার আর একটা বিষয় হল, বেঞ্চে বসে কাজ করে এমন প্রতি চার জন কর্মীর জন্যে সোভিয়েত দেশে লাগে একজন ডেস্ক কর্মী (যাঁরা চেয়ারে বসে কাজ করেন), অথচ মাকিন মুল্লুকে প্রতি সাতজন কর্মীর জন্য একজন ডেস্ক কর্মীই যথেষ্ট।

সেকেলে ধরণের কর্মদক্ষতা কর্মীদের দ্রুত কাজ করতে শিখিয়েছে আর নতুন ধরণে খুশী আর আরামে কাজ করতে করতে সে শিখেছে কি করে উৎপন্ন পণ্যের উৎকর্ষ সাধন করতে হয়। অভিজ্ঞ সঙ্গীতগোষ্ঠীর সাহায্যে দেশের সর্বত্র, অফিস আর কারখানাগুলোতে সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে এমন কি, কাজের মুহূর্ত্ত অনুযায়ী সুর নির্বাচিত হয়েছে। তাই শ্রমিকদের মনে উত্তেজনা আর একঘেয়েমী চলে গিয়েছে, কাজে ছেদ পড়ছে কম, দুর্ঘটনার সংখ্যাও কমে গেছে। মালিক পক্ষ ব্যালেন্সসীটে এর ফলাফল দেখতে পেয়েছেন। একটা সঙ্গীত কার্যক্রমেরই শ্রমিক শ্রোতার সংখ্যা পাঁচ কোটির মত।

ইতিমধ্যে শিল্প গবেষণায় ফী বছরে ২.৬ বিলিয়ন ডলার ব্যয়িত হচ্ছে, যার ফলে উৎপাদনের নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবিত হচ্ছে। জেনারেল মোটরস্-এর একটা স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন শাখা আছে, যা থেকে প্রতি ঘণ্টায় দু'হাজার অটো-মোবাইল পিষ্টন বার হয়। একটা কোম্পানীর চৌদ্দটা বড় রকমের গ্লাস ব্লোইং মেসিন দেশের ইলেকট্রিক বাতির বালব চাহিদার শতকরা নব্বুই ভাগ মেটাচ্ছে। ইলেকট্রিক টিউবের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচও এরাই উৎপন্ন করছে। প্রতিটি মেসিনের একজন করে অপারেটর দরকার হলেও, কাঁচ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা চল্লিশ বছর আগেকার তুলনায় অর্ধেক।

গবেষণার ফলে দেখা দিচ্ছে শত শত উপাদান—বস্ত্র (ফেব্রিক), পরিষ্কারক (ডিটারজেন্ট), ওষুধ—যা মাঠ আর বনের "প্রাকৃতিক" সম্পদের উপর মানুষের

আগেকার নির্ভরতাকে বৈপ্লবিক রূপ দিচ্ছে। এখনকার নিয়ত বহমান রাসায়ন কারখানাগুলোকে অতীতের কোন এক দিনের বিজ্ঞান বিষয়ক স্বপ্নের মূর্তরূপ বলে মনে হবে। এই সব থেকে উৎপাদিত পণ্যের যে স্রোত বইছে তার বুঝি আদি অন্ত নেই ; সার, নকল রবার, ছাপার কালি এবং বহু নতুন জিনিষের ক্ষেত্র দখলকারী প্লাষ্টিক শিল্পের কাঁচা মাল ইত্যাদি।

রসায়ন এবং পদার্থ বিশেষজ্ঞগণ ইতিমধ্যেই বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন ; এখন মনে হয় জীব-বিশেষজ্ঞদের সহযোগীতায় রসায়ন ও পদার্থ বিশেষজ্ঞরা আর এক শ্রেণীর নতুন পণ্য আর শিল্পের প্রবর্তন করতে পারেন—সম্ভবতঃ আলো, হাওয়া আর জল থেকে তাঁরা খাদ্যও তৈরী করবেন, যা প্রকৃতি নিজেও করে থাকেন।

নতুন নতুন উদ্ভাবন, অফিসের কাজেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করছে। একটা পাবলিক সার্ভিস কোম্পানীর, যার গ্রাহক সংখ্যা কুড়ি লক্ষের মতো, তার একটা ইলেকট্রোনিক কমপিউটিং ব্যবস্থা আছে যাতে কাজ করে ২১০ জন কর্মচারী। আগে পুরো একটি সপ্তাহ ধরে কাজ করে পাঁচশ কেরাণী যা করতেন, এঁরা তা দু'দিনে করতে পারেন। আর একটা মেসিনে পাঞ্চ করা কার্ড চাপালে, সম্ভাব্য সকল অভিযোগ অথবা প্রশ্নের প্রামাণ্য জবাব পাওয়া যাবে।

কারখানার যন্ত্রগুলো এখন কাঁচামাল টেনে নিতে পারে। জটিল উৎপাদন ব্যবস্থা চালু হলে তার উপর লক্ষ্য রাখা, ভুল সংশোধন করা, কাজ বন্ধ করা এবং সুরু করা, তৈরী পণ্যের দেখাশোনা করা, বাজে মাল বাতিল করা, তৈরী মালের সংখ্যা গণনা করা এবং উৎপাদন ব্যবস্থার যে কোন বিষয় ইলেকট্রোনিক মস্তিকে পৌঁছে দিলে, তাকে "মনে রাখা"—এ রকম অনেক কাজই যন্ত্রের দ্বারা করা হয়।

স্বয়ংক্রিয়তা—নিয়ত স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন ব্যবস্থা—ইতিমধ্যেই বহু শিল্পে বিপ্লব ঘটিয়েছে অথবা প্রচণ্ড পরিবর্তন এনেছে, তবুও স্বয়ংক্রিয়তার যুগ সবে সুরু হচ্ছে মাত্র। ইতিমধ্যেই এর ফলে ইলেক্‌ট্রিসিটির মূল্য ১৯৩৯-এর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, যদিচ অন্যান্য ব্যাপারে জীবন ধারণের মান শতকরা তিরানব্বই ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

পর্যবেক্ষকদের মধ্যে যাঁরা স্বয়ংক্রিয়তার ফল বিস্ময়জনক হয়েছে বলেই মনে করেন, তাঁরা শুধু ডিকটেটিং মেসিন আর টাইপিং পুল-এর ফলে ষ্টেনোগ্রাফারদের এবং ক্যালকুলেটিং মেসিনে বুককীপারদের চাকুরীচ্যুতি এবং গ্লাস ব্লোয়ার আর ক্যাবিনেট মেকার্সদের অপসারণটুকুই দেখেন। অন্যেরা ইঞ্জিনীয়ার

আর টেকনিসিয়ানদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা, মেরুদণ্ডহীন শ্রমিক আর ব্যাধি-বিস্তারক পেশার অবলুপ্তি, কাজের ঘণ্টার স্বল্পতা এবং অধিক অবসর থেকে কৃষ্টির মান উন্নয়নের সম্ভবনার দিকে দৃষ্টি দেন।

কর্পোরেশন

এই সজীব অর্থনীতির দায়িত্বশীল কেন্দ্র হল কর্পোরেশন। কর্পোরেশন শব্দটার মধ্যে, এমন কি আমেরিকানদের কানেও অমঙ্গলের অস্পষ্ট ধ্বনি আছে। কারণ সেদিনের কথা আমি ভুলি নি যখন অনিয়ন্ত্রিত এবং লোভী কর্পোরেশন থেকে একচেটে ব্যবসা জন্ম লাভ করেছে। একদিকে অনেক অর্থ, আর অন্যদিকে অনেক দারিদ্র্য পুঞ্জীভূত হয়েছে, কলঙ্কময় আর্থিক লেনদেন আর রাজনৈতিক দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে।

কিন্তু সেদিন কি আর আছে! এখনকার কর্পোরেশনে নিজের খ্যাতি বজায় রাখবার জন্যে স্নায়ব উদ্বেগ দেখা যাবে। জনসাধারণের আনুকূল্যের জন্যে তারা পাবলিক রিলেশান অফিসারদের সাহায্য নিচ্ছে অনেক বেতনের বিনিময়ে। কারখানায় দর্শকদের সাদরে গ্রহণ করছে, ষ্টকহোল্ডার অথবা স্কুলের ছেলে-দের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে সমান বিনয়ে এবং কর্মীদের নগরজীবনে অংশ গ্রহণে উৎসাহিত করছে।

কর্মচারী নিয়োগকারীদের সংস্থানসমূহ, কর্পোরেশনগুলো ধরেই, অপেক্ষাকৃত ছোটখাট ধরণের। এদের শতকরা নব্বই ভাগের কর্মচারী সংখ্যা একত্রিশ জনেরও কম। অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধিশালী সংস্থাসমূহের শতকরা পাঁচভাগের কর্মচারী সংখ্যা, মোট কর্মচারীর শতকরা সত্তর ভাগ। শিল্প জগতে কুড়িলক্ষ ব্যক্তির নিজস্ব আর অংশীদারী ব্যবসা আছে, এবং পাঁচ লক্ষের মতো কর্পোরেশন আছে। এই কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে শ' দুই এর হাতে রয়েছে ব্যবসায়ের অধিক মূলধন। মনে হয় মার্জার এবং ইন্টারলকিং ডাইরেক্টর ও ইন্টারলকিং শেয়ারহোল্ডিং প্রথার জন্যে বড়রা আরও বড় হচ্ছে।

এই সব সংগঠন, স্কুল, চার্চ প্রভৃতির মতই সামাজিক সংগঠন। জীবনযাপন-পদ্ধতি ও ধরণধারণের উপর এদের প্রভাব কম নয়। প্রকৃত পক্ষে স্কুলে যা পড়ান হয় অথবা এমন কি, চার্চে যে ধর্মোপদেশ দেওয়া হয়, সেখানেও তাদের প্রভাব পড়ে নানা দিক থেকে। কারণ ব্যবসায়ী, বিশেষ করে বড় বড় কর্পোরেশনের মনোভাব সমাজে পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে।

এই সব বড় বড় কর্পোরেশনগুলোকে কারা নিয়ন্ত্রণ করে, কারা এদের মালিক এবং কারা এতে লাভবান হন ?

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মালিকানা ব্যাপকভাবে ব্যাপ্ত। কর্মচারীর সংখ্যা থেকে শেয়ার হোল্ডারদের সংখ্যা অধিক হওয়াটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। ডুপণ্ট-এর কর্মচারী সংখ্যা ৮৯,০০০ আর ষ্টকহোল্ডারের সংখ্যা ১৬৬,০০০; জেনারেল মোটরস—৫১৪,০০০ আর ৬৫৬,০০০ [এবং বিদেশে আরও ৮৮,০০০ কর্মচারী]; জেনারেল ইলেক্‌ট্রিক—২১০,০০০ আর ২৯৬,০০০। আশী থেকে নব্বুই লক্ষ আমেরিকান শেয়ার কেনে এবং এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষ, আগেকার দিনের সেই "ক্যাপিটেলিষ্ট"দের চিত্রের সঙ্গে তাদের কোন মিল নেই।

বড় কর্পোরেশনের মালিকেরা তাই দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছেন এবং কোম্পানীকে চালানোর তাদের কোন ক্ষমতা নেই। নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার মালিক সর্বোচ্চ পরিচালন ব্যবস্থাপকেরা আর বোর্ড অব ডাইরেক্টারস্‌রা। তবুও শেয়ার হোল্ডাররা বাৎসরিক সভাগুলোতে বিপদ ঘটাতে পারে, এবং ঘটিয়ে থাকে বলেই পদস্থ কর্মচারীদের শেয়ার হোল্ডারদের স্বার্থ সম্পর্কে সজাগ থাকতে হয়। নিয়ত সম্প্রসারণশীল অর্থ-নৈতিক গণতন্ত্রের যুগে ম্যানেজাররা জানেন যে, সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁদের দায়িত্বশীল মনোভাব হওয়া চাই, নইলে সরকার বাধা দেবেন। তাই তাঁদের দায়িত্ব পঞ্চবিধ। তাঁদের কাছে ষ্টকহোল্ডাররা আশা করে উচিত ডিভিডেণ্ড, শ্রমিকেরা ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদনের হার সম্মত বেতন, জনসাধারণ ভাল মাল অথবা কম মূল্যে ভোগ্য দ্রব্যাদি কিংবা দুইই এবং সরকার চান মুনাফার কিছু অংশ যা জনসাধারণের কাজে ব্যয় করা যেতে পারে।

কেউ কোনরূপ পরিকল্পনা না করা সত্ত্বেও ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এই রকম—বড় বড় সংগঠনগুলো যেমন অর্থ-নৈতিক, ঠিক তেমনই রাজনৈতিক আর সামাজিক সংগঠনে পরিণত হয়েছে। কর্পোরেশনগুলো যত দিন যাচ্ছে, সরকারের মতোই ভাবছে আর কাজ করছে। আকার, অবয়ব, সমন্বয় সাধনের সমস্যা এবং সমাজে সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে এরা এক একটা ক্ষুদে গভর্ণমেণ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই বড়ত্বে কেউ খুশী হন, আবার কেউ ভয় পান। দেশের প্রখ্যাতনামা জনসেবক ডেভিড লিলিয়েনথাল মনে করেন বড়ত্বকে অনিষ্টকর মনে করা ভুল। আর কর্পোরেশনগুলোর শ্রীবৃদ্ধি অনিবার্য্য, কারণ এর ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, ক্রেতারা উন্নত আর নানান ধরণের পণ্য পান এবং এই বড়র দল নিজেদের

ভিতরকার প্রতিদ্বন্দ্বীতা এবং বড় শ্রমিক আর গভর্ণমেন্ট শক্তির নিয়ন্ত্রণের ফলে কখনই অধিক বাড় বাড়তে পারে না। সি, রাইট মিলস্ কিন্তু মনে করেন কর্পোরেশনগুলো সমাজের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে এবং শোষণ নয়, বিজ্ঞাপন এবং কি করতে হবে সে সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে, সমাজের উপর তাদের অভিমত চাপিয়ে দেয়। অপরদিকে ইউনিয়ন, চার্চ এবং অন্য দলের সমকারী প্রভাবের দিকে আদৌ তাঁর দৃষ্টি পড়ে নি।

নৈরাশ্যবাদীরা কদাচ আজকের বড় ব্যবসার সঙ্গে তার উনবিংশ শতাব্দীর লুণ্ঠনকারী এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন অগ্রজ নিয়ে মাথা ঘামালেও, তারা জোর দিয়েই বলেন যে, এই বড়র দল ছোট ব্যবসার সর্বনাশ সাধন করছে নয়তো অন্যায়ভাবে বিরাট অর্থ-নৈতিক ক্ষমতার চাপে তাদের উপর অন্যায়ভাবে প্রভাব ঘটাচ্ছে।

এখনও দেশের অর্থ-নীতিতে লক্ষ লক্ষ ছোট ব্যবসায়ের জন্য প্রচুর স্থান পড়ে আছে। ছোটখাট অথবা মাঝারি ধরনের সহরের জীবনযাপনপদ্ধতির বৈশিষ্ট এখনও পেশাদার মানুষ, ব্যবসায়ী, সহায়ক বাণিজ্য কর্মী এবং ছোটখাট প্রস্তুত কারকদের কর্মপ্রয়াস, যারা তাদের স্ত্রীদের নিয়ে সমাজের স্বাস্থ্য আর কল্যাণমূলক কাজের জন্য অবসর সময় দিয়ে থাকেন। এদের নেতৃত্ব দান চলছেই, কিন্তু বড় বড় ব্যবসায় সংগঠন, সহরে যার শাখা আছে, তাদের ম্যানেজাররা আসে, আবার চলে যায়। সমাজে বড় ব্যবসায়ীদের সম্মান আর তাঁদের কিনবার অভ্যাস এদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, কিন্তু ওঁরা আবার স্থানীয় সুধীসমাজের মর্জির উপর নির্ভরশীল। এই দুই শক্তিই কাজ করে।

"সকল দিক থেকে জনস্বার্থের অনুকূলে কাজ না করলে কোন ব্যবসার উন্নতি হতে পারে না।" ডুপন্ট-এর ক্রফোর্ড গ্রীণওয়াল্ট এ কথা বলেছেন। "ব্যবসা যত বাড়তে থাকে এবং নীতিনির্দ্ধারণের ক্ষমতা যতই নিয়ত বর্দ্ধমান জনসংখ্যার উপর ছেড়ে দিতে হয়, ব্যবসায়ী আচরণেও সেই জনস্বার্থ প্রতিবিম্বিত হয়, যা হয়ত কোন বিশেষ ক্ষেত্র অথবা স্থানের সঙ্গে শুধু জড়িত থাকে।"

হয়তো কোন সংগঠনকে প্রায়শঃই ট্রাষ্ট বিরোধী আইনের আওতায় পড়তে হয়েছে রসায়ন শিল্পের উপর তার আধিপত্যের জন্য, তাহলেও বাস্তব ক্ষেত্রে সেই সংস্থা প্রতিযোগীদের ব্যবসায়ে নামতে উৎসাহিতই করেছে। তারপর সেই সংগঠনই মেসিনপত্তর বসিয়েছে এবং প্রয়োজনীয় কারিগরী সাহায্য দিয়েছেন প্রতিযোগীদের কারবার যাতে সুরু হয় সেজন্য। একচেটিয়া কারবার থেকে এ অনেক দূরে।

বড় বড় কর্পোরেশনের বেশী ঝোঁক অবশ্য দেখা গেছে নতুন নতুন রীতি সংযোজন অথবা ছোটখাট কারখানার সঙ্গে মিলনের মাধ্যমে বিবিধ উৎপাদন ব্যবস্থার দিকে। জেনারেল ইলেক্ট্রিক ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎ দুনিয়ার কল্পনীয় সকল ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। তারপর এঁরা উৎপাদন করেছেন জেট ইঞ্জিন এবং এয়ার কণ্ডিশনের যন্ত্রপাতি এবং আনবিক শক্তির ক্ষেত্রেও প্রবেশ করেছেন। অল্প সময়ে অধিক মুনাফা নয়, ব্যবসা চালিয়ে যাবার নিশ্চিন্ত নিরাপত্তাই আজকের কর্পোরেশনের মনের কথা, যার লাভের পরিমাণ গড়ে শতকরা চার ভাগেরও কম।

মুনাফার উপর ফেডারেল ট্যাক্সের নজর থাকায় কর্পোরেশনগুলো উদারহস্তে লাভের কিছু অংশ সমাজকল্যাণে ব্যয় করছে। ভবিষ্যতের শিল্প কারিগররা আসবেন কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (যার অনেকগুলোই মুদ্রাস্ফীতির জন্য দারুণ অসুবিধাতে পড়েছে), একথা উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলেই শিল্পসমূহ উচ্চ শিক্ষাখাতে তাঁদের ব্যয়ের বহর বাড়িয়ে দিয়েছেন।

এই ধরণের দান যদি আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি-স্বার্থ হতে উদ্ভূত হয়, এ থেকে জনসাধারণের মনে রেখাপাত করবার প্রয়াসও পরিলক্ষিত হয়। তাঁরা হতে চান উদার, জনস্বার্থে নিয়োজিত সংগঠন যা উৎপাদন আর বেতনের ক্রমবৃদ্ধির স্রষ্টা এবং তার সমৃদ্ধির জন্যে দায়ী। জাতির সমৃদ্ধি এই উভয়ের স্ফীতির উপরই নির্ভর করে।

সম্ভবতঃ সবচেয়ে শিক্ষণীয় তুলনা পাওয়া যাবে হেনরী ফোর্ড আর তার দৌহিত্র হেনরী থেকে। ফোর্ড তাঁর বিরাট শিল্প, পরিবারের মধ্যেই আটক রেখেছিলেন, অধিক বেতন ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে চলছিল পদাবনতির এবং গুলীচালনার পালা, যার জন্যে তাঁর কারখানার শ্রমিকেরা তাঁদের কাম্য সর্বোচ্চ বেতনস্তরে পৌঁছতে পারে নি। তিনি সর্বদাই দেহরক্ষী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন এবং সংগঠনকে তিনি অটুট রাখতে প্রয়াস পেতেন ষড়যন্ত্র আর পারস্পরিক ঈর্ষার জাল বিস্তার করে। দ্বিতীয় হেনরী তাঁর ঠাকুর্দার শ্রমিকদের প্রতি নির্দয় আচরণের পরিবর্তে স্থাপন করলেন শান্তিপূর্ণ ঐক্যের রেকর্ড। রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ব্যবসায় আর জনসেবা মিলিত কার্যসূচী গ্রহণ করে। তাঁর ঠাকুর্দা ফোর্ড ফাউণ্ডেশনকে যে অর্থ দিয়ে গেছেন, তা থেকে তিনি সামাজিক গবেষণার ব্যাপক কার্যসূচী গ্রহণে তৎপর হয়েছেন।

অবশ্য প্রচুর প্রাচুর্য এবং প্রভাবের মধ্যে জন্ম নিলেও দ্বিতীয় হেনরী ফোর্ড একটি ব্যতিক্রম। নয় হাজার শিল্প নেতার চরিত্রচর্চা থেকে দেখা গেছে যে, যে তরুণের দক্ষতা ছাড়া দেবার মত আর কিছুই নেই, উচ্চপদে তাঁর রেকর্ড, তাঁর বাবা অথবা ঠাকুর্দার চেয়ে ভাল হয়। এবং বড় ব্যবসায়ে তাঁর সাফল্য-সম্ভাবনা সর্বাধিক। গত পঞ্চাশ বছরে পরিচালন গোষ্ঠীতে শ্রমিকসন্তানদের সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে কলেজ ডিগ্রী এখনও ব্যবসায় সাফল্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিশ্রুতি—এমন কি শিল্প মালিকের মেয়েকে বিয়ে করার চেয়েও!

মানুষ ব্যবসায়ে সফল হতে পারে কি করে? আবেগের দিক থেকে তাকে স্বকীয় হতে হবে। মাতা-পিতার উপর নির্ভরতা তাকে জয় করতে হবে। পরাজয়কে সে ভয় করবে, পরাজয় এড়িয়ে চলবার জন্যে কাজ করে যেতে হবে তাকে। উপরওয়ালাদের সঙ্গে তাকে মিলেমিশে এক হয়ে যেতে হবে। ব্যগ্রী হতে হবে, সাধারণের সঙ্গে কাজ করা উপভোগ করতে হবে, কর্মব্যস্ত থাকার ভাবটা পছন্দ করতে হবে। অন্যেরা কি করলে তার জন্যে কাজ করতে ভালবাসবে তা জানতে হবে এবং কি করে কোম্পানী, তার পণ্য ও নীতির দিকে, নিজের সৃজনী শক্তি প্রবাহিত করতে হয়, তা জানতে হবে। বুদ্ধিজীবী নয়, বুদ্ধিমান হতে হবে।

উল্লেখযোগ্য বণ্টন ব্যবস্থা

ক্যাপিটালিজম সম্পর্কে মার্কস যতগুলো ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তার সবগুলোরই উল্টো ফল ফলেছে। শ্রমিকদের জীবন ধারণের মান উন্নত হয়েছে, কাজের ঘণ্টা হ্রাস পেয়েছে এবং সমাজের বণ্টন ব্যবস্থার অসাম্য অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। মার্কস যা আশা করেছিলেন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলোর ক্ষেত্রেও তার উল্টোটাই ঘটছে : হয় সেগুলো ভেঙ্গে পড়ছে, নয়ত স্বেচ্ছায় গুটিয়ে ফেলা হচ্ছে। কৃষকরা শোষিত হচ্ছে না। তাদের সাবসিডি (আংশিক আর্থিক সাহায্য) দেওয়া হচ্ছে। কাজের ঘণ্টা কমে যে ক্ষতি হয়েছে, যন্ত্রের স্বল্প সময়ে অধিক উৎপাদন ক্ষমতা, মানুষের কর্মদক্ষতা ও কর্মনৈপুণ্য বেড়ে গিয়েছে বলে তা পূরণ হয়ে গেছে।

কাজের ঘণ্টা যেমন কমে যাচ্ছে, বেতন তেমনই বাড়ছে। সর্বক্ষণের কর্মচারী-দের বাৎসরিক বেতন পুরুষদের ক্ষেত্রে ৪,২০০ এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ২,৭০০ ডলারের বিস্ময়কর অঙ্কে গিয়ে পৌঁছেছে। জাতীয় আয়ের প্রাপ্য অংশটুকুর পরিমাণও বেড়েই চলেছে। ব্যক্তিপ্রতি ক্রয় ক্ষমতার পরিমাণ মানুষের কাজের ঘণ্টাপিছু উৎপাদনের ন্যায় বেড়েছে (বছরে শতকরা ২ ভাগ) এবং বণ্টন ব্যবস্থা আগের তুলনায় সমান হচ্ছে।

উৎপাদনের উচিত অংশ যাতে শ্রমিকেরা পায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে সরকার বেশ একটা আইন প্রণয়ন করেছেন যাতে শ্রমিকদের পক্ষে ইউনিয়নগুলো 'কলেকটিভ বারগেনিং' বা সামূহিক দর কষাকষি করতে পারে, নারী আর শিশুদের স্বার্থ রক্ষিত হয়, কাজের ঘণ্টা সীমায়িত হয় এবং সর্বনিম্ন বেতন ধার্য হয়, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী অথবা তার উপর নির্ভরশীলেরা পেনসন পায়, বেকারদের সাহায্য করা হয়, বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, নিরাপত্তা-মূলক ব্যবস্থা এবং কার্য্যকালে আহতদের ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি থাকে।

এই উন্নতির অনেকগুলোর মূলেই রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন। এক কোটি আশীলক্ষ নারী-পুরুষ, দেশের অ-কৃষি শ্রমিকদের এক-তৃতীয়াংশ, ইউনিয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। একদা মালিক পক্ষ ইউনিয়নের সঙ্গে যে তিক্ত লড়াইয়ে লিপ্ত থাকতেন, আজকাল তার স্থান দখল করেছে সমান

সংখ্যক শ্রমিক এবং মালিক প্রতিনিধিদের নিয়ে আলাপ আলোচনা, অত্যন্ত তিক্ততার মধ্যে হলেও যার মধ্যে প্রায়শঃই আন্তরিকতা থাকে। এই আলাপ-আলোচনা সমগ্র শিল্প সম্পর্কে হয়, প্রত্যেক কারখানার স্থানীয় সমস্যা নিয়ে।

১৯৫৫ সালে আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবর এবং কংগ্রেস অব ইন-ডাসট্রিয়াল অর্গানিজেশনস ঐক্যবদ্ধ হলে অধিকাংশ ইউনিয়ন এক নেতৃত্বাধীনে আসে। সব সময়েই শ্রমিকরা তাদের নিজস্ব শিল্পের জাতীয় ইউনিয়নে স্থানীয় শাখার সদস্য শ্রেণীভুক্ত হন, যেমন ইউনাইটেড অটোমোবাইল ওয়ার্কাস (অনেক পেশার শিল্প ইউনিয়ন) অথবা লিথোগ্রাফার্স (লিথোগ্রাফী সম্পর্কিত কয়েকটি শাখার কার্য্যরত শ্রমিকদের ইউনিয়ন)। দেশের চারিধারে ছড়িয়ে রয়েছে এই ধরনের স্থানীয় শাখা ইউনিয়ন। এক একটি শিল্প অথবা বাণিজ্যের স্থানীয় শাখাগুলো মিলিত হয় এক একটি জাতীয় অথবা 'ন্যাশান্যাল ইউনিয়নে' যারা ফেডারেল ইউনিয়নের অধীনে রাজ্যসমূহ অথবা রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলোর ন্যায় স্বয়ং-শাসিত এবং আত্ম-নির্ভরশীল—ফেডারেলিজম অথবা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রতি যে বিরূপতা তা শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়।

ইউনিয়নের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হল সামূহিক দরদস্তুর (কলেকটিভ বারগেনিং)। আলাপ-আলোচনার প্রধান বিষয়গুলো হল: (১) চুক্তির প্রকৃতি ও তার মেয়াদ, মেয়াদ পার হলে পুনরায় মেনে নেবার ব্যবস্থা এবং হর-তাল ও লক-আউট প্রতিরোধ; (২) ইউনিয়ন ও পরিচালকগোষ্ঠীর অধিকার, ইউ-নিয়নকে স্বীকৃতি দান এবং শ্রমিক নিয়োগে ইউনিয়নের ক্ষমতা ; (৩) বেতনের হারসহ ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা, পেনসন, স্বাস্থ্য তহবিল ও সবেতন ছুটির দিনসহ অতিরিক্ত সুবিধা, বেতন বৃদ্ধির হার, বেতনের হার, ক্ষতিপূরণ ; (৪) কার্য্য-ফল, বেতন ও প্রমোশন, লে-অফ ও পুনর্নিয়োগ ; (৫) কাজের সর্ত্ত যার মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষার ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা, কাজের গতি ও সময় সীমাও থাকে।

সাম্প্রতিককালের ইউনিয়নসমূহ সাধারণ্যে স্বীকৃতি লাভ করলেও, তারা মার্কিন জীবনযাত্রার অঙ্গ বিশেষে পরিণত হয়েছে—এমনকি মালিকপক্ষ গোপনে তাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে চাইলেও। অবশ্য এরকম আশঙ্কাও আছে যে শ্রমিকরা তাদের নবলব্ধ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গিয়ে এমন সব দাবীর উপর হয়ত জোর দেবে, যার ফলে দেখা দেবে বিপজ্জনক মুদ্রাস্ফীতি আর মালিকপক্ষ ইউনিয়নসমূহের ক্ষমতা স্বীকার করে ক্রমবর্দ্ধমান মজুরীর হারটা জনসাধারণের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন।

অনেক ইউনিয়নই সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন একথা জানিয়ে দিয়ে যে, ইউনিয়নের সদস্যদের কল্যাণের সঙ্গে মালিকপক্ষ আর জনসাধারণের কল্যাণও জড়িত রয়েছে। যেমন অ্যামালগেমেটেড ক্লোদিং ওয়ার্কাস ইউনিয়ন মালিক পক্ষকে কাজের গতি সংগঠনে, উৎপাদনের উচ্চে মানে পৌঁছতে, হাতের কাজের স্থলে মেসিন বসাতে, লেড-অফ কর্মীদের অন্যত্র বদলী করতে এবং মূলধনের জন্য ঋণ যোগাতে সহায়তাই করেন। ইন্‌টারন্যাশানাল লেডিজ গারমেন্ট ওয়ার্কাস ইউনিয়নের নিজস্ব ইঞ্জিনীয়ার আছেন, যাঁরা মালিক পক্ষকে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে সহায়তা করেন। সর্বাপেক্ষা সফল ইউনিয়ন জানে যে বেতন ও অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধির একমাত্র পথ হল উৎপাদন বৃদ্ধি। তাঁদের চিন্তা, তাই কি করে কর্মচারীরা বাড়তি উৎপাদনে তাঁদের অংশের মুনাফা পাবে। ওয়াল্‌টার রুথার প্রভৃতি নেতারা মনে করেন নিজেদের দাবী স্থির করার জন্যে শ্রমিকদের কোম্পানীর কাগজপত্র দেখার সুবিধা দেওয়া উচিত এবং সম্প্রসারণশীল অর্থনীতি থেকে শ্রমিকদের সামাজিক সুবিধাদানের ব্যাপারে তাদেরই অগ্রণী হতে হবে।

শ্রমিকরা এও দেখেছে যে সরকারের মাধ্যমে না গিয়ে সরাসরি মালিকপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করাই তাদের পক্ষে লাভজনক। রাজনৈতিক কর্ম-পরিষদ ও বন্ধুভাবাপন্ন কংগ্রেসীকে নির্বাচিত করার প্রচার অভিযান সত্ত্বেও ইউ-নিয়নগুলো মুখ্যতঃ বাস্তবধর্মী, রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন নয়।

এই ব্যবস্থা, শ্রমিকদের দিক থেকে, ভাল ভাবেই কার্যকরী হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে বড় বড় শিল্প ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিয়েছে (১৯৪১), স্বাস্থ্য ও কল্যাণ পরি-কল্পনা মেনে নিয়েছে (১৯৪৬), সামাজিক নিরাপত্তার উপর পেন্‌সন্ দিতে রাজী হয়েছে (১৯৪৯), বেতনের হার জীবনধারণের মানসম্মত হয়েছে (১৯৫০), ফেডারেল পরিকল্পনার পরিপূরক হিসেবে বেকারভাতাতে মত দিয়েছে। ইউ-নিয়ন একথাও স্বীকার করিয়ে নিয়েছে যে শ্রমিকদের কল্যাণ মালিকপক্ষের অন্যতম দায়িত্ব।

ইউনিয়নগুলো নিজেরাই ক্যাপিটালিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের নিরাপদ বিরাট তহবিলের দৌলতে যা বিনিয়োগ করা হয়েছে সরকারী বণ্ড অথবা অন্যান্য সিকিউরিটিতে। একমাত্র ইউনাইটেড অটোমোবাইল ওয়ার্কাস্‌-এর মূলধনই ৪০,০০০,০০০ ডলার। এ. এফ. এল. সি. আই. ও. র সদর দপ্তরের বাৎসরিক বাজেটই হল ৮,০০০,০০০ ডলার। ইউনিয়নসমূহ তাদের নেতাদের ভাল বেতনই দেয়। এ. এফ. এল. সি. আই. ও র সভাপতি জর্জ মেনি'র বেতন ৩৫,০০০

ডলার। কয়েকটি জাতীয় ইউনিয়নের প্রধানদের বেতন কিন্তু আরও বেশী। ইস্পাত কর্মীদের প্রেসিডেন্ট ডেভিড ম্যাক্‌ডোনাল্ড পান ৪০,০০০ ডলার করে।

ইউনিয়ন আন্দোলন সুরুতে সমর্থন লাভ করেছিল সুহৃদ সরকারের কাছ থেকে, তারপর নিজের শক্তি সুকৌশলে প্রয়োগ করে বড় হয়েছে। এখন ইউনিয়নের হাতে রয়েছে সমকারী ক্ষমতা যার ফলে শ্রমের ফল আরও সমানভাবে বণ্টিত হয়েছে আরও অধিক এলাকায় এবং অর্থনীতি সজীব ও গতিশীল থেকেছে।

আলাপ আলোচনার পথে ইউনিয়ন ও মালিকপক্ষ চুক্তিতে পৌঁছতে অসমর্থ হলে ফেডারেল মিডিয়েশন অ্যাণ্ড কনসিলিয়েশন সার্ভিসের সাহায্য চাওয়া যেতে পারে—অবশ্য উভয়ে যদি সম্মত হয়, তবেই। প্রতি বছর এই সংস্থা সহস্র বিরোধের নিষ্পত্তি করে, যা হয়ত শেষ পর্য্যন্ত ধর্মঘট ডেকে আনত। ন্যাশানাল লেবার রিলেসানস্ বোর্ড-এর সাহায্য চাওয়া যেতে পারে কালেকটিভ বারগেনিং বিষয়ক বিরোধ মেটাতে—যেমন অন্যায় আচরণের অভিযোগ অথবা কর্মচারীদের ভোটদান পদ্ধতির দেখাশোনা করা। ধর্মঘটের সংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়েছে আর যখন হয়—তখনকার পরিস্থিতির সঙ্গে ১৯৩০' দশকের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সঙ্গে কোন তুলনাই চলতে পারে না। ১৯৫৬ সালের ষ্টীল ষ্ট্রাইকের সময় শ্রমিকেরা সযত্নে ফারনেস্ পাহারা দিয়েছে ক্ষতি যাতে না হয় সেজন্য। কয়েকজন বন্ধুভাবাপন্ন ধর্মঘটী কোম্পানীর গেটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মেনটেনেন্সের কর্মচারীদের ভিতরে যাওয়ার ব্যবস্থা করবার জন্য, আর এক-দল মালিকপক্ষের থেকে ছুটির বেতন নিয়ে সপরিবারে ছুটি উপভোগ করতে বেরিয়ে পড়েন।

পেশাদার ম্যানেজারের দল যেমন সেকালের মালিক-ম্যানেজার শ্রেণীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন, ঠিক সেই রকম পেশাদার শ্রমিক নেতা যাঁদের মধ্যে আছেন আইনজীবি, অর্থনীতিবিদ, প্রচারবিদ এবং শিক্ষাজীবি, বহুলাংশে অশিক্ষাপ্রাপ্ত ইতরামীতে সুড়সুড়ি দেওয়া ইউনিয়ন'বস্‌দে'র স্থান অধিকার করেছেন। শ্রম আন্দোলনের পক্ষে প্রকাশিত হচ্ছে ছ'শত সংবাদপত্র ও সাময়িকী। ১৯৫০ সালে আন্তর্জাতিক মহিলা বস্ত্র নির্মাণকারী শ্রমিক ইউনিয়ন (ইনটারন্যাশানাল লেডিজ গারমেণ্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন) যাঁরা ইউনিয়নের কাজকে পেশা হিসেবে নিতে চান তাঁদের জন্যে সারাক্ষণের একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয় শ্রমিকদের জন্যে গ্রীষ্মকালীন শিক্ষাকেন্দ্র

(সামার স্কুল) চালান, তাতে অভিজ্ঞতা অর্জনের অনেক ব্যবস্থাই থাকে। শ্রমিকদের ইউনিয়নগুলো মালিকপক্ষের ন্যায় সমাজজীবনে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। তাঁরাও নাগরিক পরিষদে ঢুকছেন এবং অনিবার্য চাঁদা তোলার অভিযানে সাহায্য করছেন।

শ্রমিকদের এই বিরাট শক্তির ফলে কতকগুলো সমস্যাও দেখা দিয়েছে। বড় বড় শিল্পে যে কালেকটিভ বারগেনিং চলছে, দেশের অর্থনীতি,—দ্রব্য মূল্য, চাকুরী এবং নতুন যন্ত্র বসানো ব্যাপারে শিল্পের সিদ্ধান্তের উপর তার প্রভাব পড়বেই। ,আর ইউনিয়নগুলোর ক্ষমতা রয়েছে ধর্মঘটকে এমন সব ব্যাপারে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবার, যার মধ্যে সীমাধিকার সম্পর্কিত বিশেষ ব্যাপারে ভোট দান। ইউনিয়নগুলো সদস্যদের চড়া হারে ফী দেওয়াতে পারে এবং ক্ষমতাশীল চক্রান্তের নির্দেশ যারা অমান্য করবে তাদের চাকুরী ক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত করতে পারে।

কয়েকটি ক্ষেত্রে নেতাগিরি অথবা 'বস'ইজম্-এর মন্দ দিকটা এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কণ্ঠরোধ, জাতীয় কেলেঙ্কারীর পর্যায়ে উঠেছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে মিউজিসিয়ান অ্যাণ্ড দি টীমাস্টার্স ইউনিয়ন অথবা ইনটারন্যাশানাল লংশোরমেনস অ্যাসোসিয়েশনের (যা এ. এফ. এল.—সি. আই. ও. কর্তৃক বহিস্কৃত হয়, দুর্নীতি-পরায়ণদের বিতাড়িত করতে ব্যর্থ হলে শৃঙ্খলা রক্ষার অন্য উপায় না থাকায়) উল্লেখ করা যেতে পারে। বড় বড় সহরে গৃহ নির্মাণকারীদের সঙ্গে, যারা কাজ দেয়, সেই কনট্রাকটারদের যোগসাজস থেকে নির্মাণমূলক ব্যবসা একচেটে হয়ে গেছে, ইউনিয়নে নতুন সদস্য নেওয়ার উপর গণ্ডী টেনে দেওয়া হয়েছে, জোর করে কাজের গতি মন্দা করে দেওয়া হয়েছে, সীমিতকরণ আইন প্রণয়নের দাবী করা হয়েছে, উচ্চমূল্য জোর করে চাপিয়ে নির্মাণশিল্পকে অর্থনীতির বাকী অংশের পিছনে ফেলে রাখা হয়েছে। শ্রমিক ও দুর্নীতিপরায়ণদের একজোট হওয়া ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেছে।

তবুও আজকের শ্রমিক আন্দোলনটা সুস্পষ্টভাবে শ্রমিকদের চাকুরীর নিরাপত্তা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। আজকের দুনিয়ায় শ্রমিক, জীবিকার জন্যে তার চাকরীর উপর নির্ভরশীল এবং আঁকড়ে থাকবার মত তার আর কিছুই নেই। এই পরনির্ভরশীল শ্রমিকদের রক্ষাকর্তা ও মুখপাত্র হিসেবেই ইউনিয়নের আবির্ভাব ঘটেছে। তাহলেও শ্রমিকশক্তির এক তৃতীয়াংশেরও কম আজ সংগঠিত। দক্ষিণাঞ্চল, কেমিকেল শিল্প এবং অফিস কর্মচারীরা ইউনিয়নের আওতায় ততটা

সংগঠিত নয়, তবে ইউনিয়নগুলো এদের সংগঠিত করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সামাজিক সংগঠন হিসেবে শ্রমিকদের পূর্ণ বিকাশ লাভের একটি প্রমাণ হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বহির্বিশ্বে শ্রমিক আন্দোলনে উৎসাহদানে তাদের ভূমিকা। এ. এফ. এল,—সি. আই. ও. বহির্বিশ্বে সংযোগ রক্ষার জন্য বছরে আড়াই লক্ষ ডলার ব্যয় করে, ট্রেড ইউনিয়ন পত্রিকাসমূহের বৈদেশিক সংস্করণ প্রকাশ করে, ব্রাসেলস এ অবস্থিত ইউরোপের জন্য স্থায়ী ব্যুরোর ব্যয় নির্বাহ করে এবং দুনিয়ার সর্বত্র মুক্ত ইউনিয়ন ও শ্রমিকদের জীবনযাপনের উন্নত মানের জন্য যে আন্দোলন তাকে সমর্থন করে।

শেয়ার বা স্টকহোল্ডার

উৎপাদন ও সম্প্রসারণশীল অর্থনীতি যে শিল্পের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে, তার মালিক কারা?

কমিউনিষ্ট প্রচার সেই সেকেলে ওয়াল ষ্ট্রীট ক্যাপিটেলিষ্টদের বর্ণনা করে: সিল্কের টুপি আর বিশেষভাবে তৈরী কোট পরা ক্যাপিটালিষ্ট, গরীবদের পদদলিত করে চলেছে। পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক পদস্থ কর্মচারীর উপর একবার ভার পড়েছিল কয়েকজন রুশ পর্য্যবেক্ষকের দেখাশোনার। তিনি তাঁদের নিউ ইয়র্কের ফিফ্‌থ্‌ অ্যাভন্যুতে নিয়ে আসেন ইষ্টারের এক শনিবারে, চার্চগুলো যখন সবে তৈরী হচ্ছিল। কয়েকজন সুরুচিপূর্ণ পোষাক পরিহিত চার্চগামী তখন সিল্কের টুপি আর বিশেষ ধরনের তৈরী কোট পরে ঘোরাফেরা করছিল—সম্ভবতঃ বৎসরের এই একটি দিনেই তারা এই সেকেলে পোষাকটি পরিধান করে। রুশ ভদ্রলোকেরা ট্যাক্সির জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন:—

"দেখ, দেখ, ক্যাপিটালিষ্ট!"

প্রকৃতপক্ষে যাঁরা ক্যাপিটালিষ্ট, তাঁদের তারা দেখলেও চিনতে পারতেন না। ৮,৬০০,০০০ ষ্টকহোল্ডারের মধ্যে অর্দ্ধেকেরও বেশী মেয়ে। বিনিয়োগকারীদের শতকরা চৌত্রিশ জনই গৃহস্থবধূ এবং তাঁদের বেশীর ভাগের বয়েস আটচল্লিশ। পঁচিশ হাজার মানুষের বসতি ছোট সহরে তাঁদের বসবাস। পারিবারিক আয় ৭,৫০০ ডলারের কম। এই বিনিয়োগকারীদের মধ্যে দশ লক্ষের বাৎসরিক আয় ৩,০০০ ডলারের কম। প্রতি কুড়ি জন প্রাপ্ত বয়স্কের মধ্যে একজন এখনও ষ্টক বা শেয়ার কিনে থাকেন সরকারী কোন কর্পোরেশনের। পনর লক্ষ নাগরিক শেয়ার কিনেছেন বে-সরকারী সংগঠনের

এবং এক কোটি মানুষ তাদের জীবনবীমা অথবা পেনসন তহবিলের মাধ্যমে শেয়ারের পরোক্ষ মালিক।

বিনিয়োগ করা এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যে দালালরা জনসভায় বক্তৃতা করে মানুষকে নিরাপদ শেয়ার কেনার নীতি বুঝিয়ে দেবার জন্যে। ইনভেষ্টমেন্ট ক্লাব আত্মপ্রকাশ করছে, যাতে ছোটখাট ক্রেতারা তাদের তহবিল একত্রিত করে নিয়মিতভাবে শেয়ার কিনতে পারে। অন্যান্য পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে নিউ-ইয়র্ক ষ্টক-এক্সচেঞ্জ-এর মাসিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা (মানথ্‌লি ইনভেষ্টমেন্ট প্ল্যান), পারস্পরিক (মিউচুয়াল) তহবিল (এখানকার বিনিয়োজিত অর্থের পরিমাণ ১২ বিলিয়ান ডলার) যা ছোটখাট বিনিয়োগকারীকে নানান ধরণের এবং যে কোম্পানীগুলি তার কর্মচারীদের মালিকানাসত্ব দিতে ইচ্ছুক তার শেয়ার কিনতে সাহায্য করে। আমেরিকার টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ-এর আড়াই লক্ষ শ্রমিক-মালিক আছে আর সোকোনি মোবিল-এর শ্রমিকদের শতকরা আটাশী জন কোম্পানীর শেয়ার কিনেছেন।

ইউ, এস, ষ্টীল-এর বেনজামিন ফেয়ারলেস-এর ভাবনা ছিল 'শ্রমিকেরা কোম্পানীর মালিক হলে কি হবে?' এ রকম ঘটতে পারে মনে করে তিনি বলেছিলেন, "ভাবনা চিন্তার কিছু নেই, কাজ ছেড়ে কেউ যাবে না, কারণ, আর যাই হোক, মালিক কি করে ধর্মঘট করে?"

সাত তাড়াতাড়ি এরকম ঘটবার সম্ভাবনা না থাকলেও, একথা সত্যি যে গরীব মানুষের দল ধীরে ধীরে উৎপাদন যন্ত্রের শেয়ার কিনছেন, যদিও বড় বড় শেয়ারগুলো অপেক্ষাকৃত মুষ্টিমেয় কয়েক জনের হাতে রয়ে গেছে। সুপরিচিত শক্তিশালী কোম্পানীগুলো এখন ছোট বিনিয়োগকারীদের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন, শেয়ার বিভক্ত করে যাতে তার মূল্য আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, বিভিন্ন রঙে সুন্দর ভাবে ছেপে বার্ষিক বিবরণী এমনভাবে লিখছেন আর ছাপছেন যাতে সমস্যাগুলো সাধারণ মানুষের বোধগম্য হয়, সাধারণ সভাগুলোর আয়োজন এমন হচ্ছে যাকে বিরাট বনভোজন বলে মনে হয়, যেখানে বাৎসরিক ১৫০,০০০ ডলার বেতনের কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট যে কেউ-এর অভিযোগ ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করেন—কখনও অভিযোগকারীর ভূমিকায় দেখা যায় কোন শ্রমিককে, যিনি তাঁর 'বস-এর' কাছ থেকে সরাসরি কৈফিয়ৎ দাবী করে থাকেন।

শ্রমিক আর শেয়ারহোল্ডার এবং শেয়ারহোল্ডার আর ক্রেতার আগেকার সে দুস্তর ব্যবধান এখন ঘুচে যাচ্ছে। শেয়ারহোল্ডাররা এখন ডিভিডেণ্ড

চেকের সঙ্গে কোম্পানীর তৈরী পণ্যের একটি তালিকা ও বিবরণ পান এবং এই সব পণ্য ক্রয় করে ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে এদের পক্ষে সুপারিশ করে নিজের মুনাফা বৃদ্ধি করতে অনুরুদ্ধ হন। মালিকানা যেখানে এতটা পরিব্যাপ্ত, সেখানকার মালিকানাটা কোন ধরণের? শিল্প জাতীয়করণ না করে এবং সেই পথে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার একীকরণের দিকে না গিয়ে, মার্কিন পদ্ধতির প্রয়াস বহুর মধ্যে মালিকানাকে পরিব্যাপ্ত করবার দিকে, যাতে ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ হয়ে যায়।

সাম্প্রতিককালে শেয়ার বাজারের সুব্যবস্থার জন্যে স্বল্প বিনিয়োগকারীরা উৎসাহিত হয়েছেন। এর অন্য কারণ হল নিয়মিত মুনাফা ও ডিভিডেণ্ড, আর সম্ভবতঃ বিশেষ করে এই উপলব্ধির জন্যে যে গত কুড়ি বছরে অর্থের ক্রয় ক্ষমতা অর্ধেক হ্রাস পেলেও সাধারণ শেয়ারের মূল্য তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এইভাবে মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে বিনিয়োগ একটা প্রাচীরের মত দণ্ডায়মান থেকেছে। পার্ক অ্যাভেন্যুর পরিচারিকা যুদ্ধের সুরুতে যে ৪০০০ ডলার বিনিয়োগ করেছিলেন, পরে তা নিরাপদ ৪০,০০০ ডলারে পরিণত হয়। যে বুট পালিশওয়ালার একটি শেয়ারের উপর আস্থা তাকে ৮০,০০০ ডলারের শেয়ার কিনতে উৎসাহিত করেছিল, আজ সে বিরাট শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থার মালিক হবার দিকে পা বাড়াচ্ছে।

এই সব ছোট ছোট বিনিয়োগকারীদের অর্থ ওয়াল ষ্ট্রীটের চেহারা পালটে দিয়েছে। সেখানকার প্রভাবও হ্রাস পেয়েছে। বড় বড় শিল্প সংস্থাগুলোই এখন পরস্পরের অর্থ চাহিদা মেটায়, সেজন্যে আর ওয়াল ষ্ট্রীটের শরণাপন্ন হয় না। এজন্য হয় পুর্বেকার আয় পুনরায় বিনিয়োজিত হয় (এখন বিশ শতকের তুলনায় দ্বিগুণ, ৬০%) অথবা শেয়ারহোল্ডারদের ঋণপত্র অথবা ডিবেঞ্চার দেওয়া হয়। একমাত্র জেনারেল মোটরস-এর কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ হল ২,১৮৩,০০০,০০০ ডলারর—অপর দিকে মরগান বাড়ী (হাউস অব মরগান) দাবী করতে পারে ৬৬৭,০০০,০০০ ডলার।

আয় ও ব্যয়

এই বিনিয়োগ আর এই উৎপাদন অর্থহীন হয় যদি সব-কিছু ক্রয় অথবা উপভোগ করা না হয়। এই উর্বর অর্থনীতির অন্য দিকের আপাত অসম্ভব কথা হল এই যে, তাকে উৎপাদন নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হয়না, নিশ্চিত হতে হয় এই বিষয়ে যে পণ্য যত দ্রুত উৎপন্ন হবে, বিক্রীও হয়ে যাবে তত দ্রুত।

যেহেতু এই অর্থনীতির অর্থ এবং ঋণ সৃষ্টির যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে, সেইহেতু বহুলাংশে ব্যয়ের পরিমাণ আয়ের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল নয়। এই প্রতিফলিত অর্থনীতিতে যত অর্থ ব্যয়িত হবে, তত অর্থ অর্জিত হবে। কারণ ব্যয়ের বহর যদি উর্ধগতিতে থাকে, তা থেকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও হয়।

তাই ইনষ্টলমেণ্ট বা কিস্তিতে ক্রয়কে উৎসাহ দেওয়া হয়, যদিচ মনে হয় যে, ঋণের উপর ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের কর্তৃত্ব আর থাকে না। এই রকমের যথেচ্ছ ব্যয় সত্ত্বেও দেশের অর্ধেক পরিবারেরই কোন রকমের ইনষ্টলমেণ্ট ঋণ নেই এবং ১৯৫৬ সালে ক্রেতাসাধারণ ২০·৫ বিলিয়ন ডলার বাঁচিয়েছিল।

অধিক ক্রয়ে উৎসাহ দেবার জন্য সকল ব্যবস্থারই প্রয়োগ করা হয়। নতুন ধরণের জিনিষ নিয়ত বাজারে আসে এবং যেহেতু ক্রেতারা সর্বদা নতুন কিছু কিনতে চান, তাদের নতুন নতুন জিনিষ কেনার সুযোগ দেওয়া হয়। প্রতিভাবান কোন নক্সাকার অথবা নির্মাতা এমন কিছু যদি উৎপন্ন করেন, যা ক্রেতাদের পুরণো মাল ফেলে দিতে প্ররোচিত করে, তাহলে অনেক কিছুই বাতিল হয়ে যায়। তাই ব্যবহারোপযোগী রেফ্রিজারেটারও বাতিল করা হয়, যদি রঙীন দেয়াল কাগজের সঙ্গে মানানসই রঙীন অথবা ঘূর্ণায়মান শেল্‌ফ দেওয়া ঠাণ্ডা জল সরবরাহের ব্যবস্থাযুক্ত রেফ্রিজারেটর পাওয়া যায়।

প্রতিযোগীতার ফল প্রায়ঃশই আরও উন্নত ধরণের পণ্যের দিকে যায়। ১৯২২ সালে ইলেক্‌ট্রিক রেফ্রিজারেটরের মূল্য ছিল প্রতি ঘনফুট ৭৮ ডলার, ১৯৫৫ সালে সেটা দাঁড়ায় ৩৪ ডলারে। নতুন রেফ্রিজারেটর অনেক উন্নত ধরণের জিনিষও বটে। রেডিও'র মূল্য এখন এত কম যে, শতকরা মাত্র তিন চার জনের রেডিও নেই।

শ্রম-পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে যে ক্রেতার মূল্যসূচী সরবরাহ করা হয়, তাতে সাধারণ আয়ের পরিবারের জীবনযাত্রার ব্যয়ের তারতম্য দেখান হয়। এই সূচীতে অনেক নতুন জিনিষ সন্নিবেশিত হয়ে থাকে। ইতিমধ্যেই রেডিও, ইলেক্‌ট্রিক সেলাইকল এবং গৃহের উপযোগী অন্যান্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি স্থান পেয়েছে। ঠাণ্ডায় জমাট খাবার, ইলেক্‌ট্রিক টোষ্টার এবং টেলিভিশন সেটও এই তালিকায় এসে গেছে।

কম মূল্য, স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক পদ্ধতির ফলে, স্বল্প ব্যয়ে প্রস্তুত পণ্যে ভর্তি সুপার মার্কেট এবং বাড়ীতে বাড়ীতে পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে মার্কিন অর্থনীতিও

ব্যাপক সম্প্রসারণ লাভ করেছে। বিক্রয় এবং ক্রয় সম্পর্কে গবেষণার পথে জনগণের চাহিদা কি তা জানা গেছে এবং সেইমত পণ্য উৎপন্নও হয়েছে।

সম্প্রসারণশীল বাজার শ্রেণীবিভেদ ভেঙেচুরে দিয়েছে। সকলেই প্রায় তৈরী জামা-কাপড় পরিধান করেন। প্লাম্বার অথবা ষ্টীল ওয়ার্কারের পোষাক-আষাক ডাক্তার অথবা ক্রোড়পতির মতোই হয়ে থাকে। ধনী-গরীব সকলেই একই ব্রাণ্ডের সিগারেট সেবন করে, একই রেলের একই কামরায় আরোহণ করে, একই ধরণের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করে।

পুরাতন বে-সরকারী সংগঠনের অর্থনীতির ন্যায় আয়েও সমতা দেখা দিচ্ছে। ১৯৩৫ থেকে ১৯৫০-এ নীচের দিকের পাঁচটি সারির মার্কিন পরিবারসমূহের প্রকৃত আয়কর বাদ দিলে শতকরা বিয়াল্লিশ ভাগ বৃদ্ধি পায়, আর উপরের দিকের পাঁচটি সারির পরিবারগুলোর আয়ে সামান্য কিছু ঘাটতি দেখা যায়। কারুশিল্পে নিযুক্ত প্রতি পাঁচটি পরিবারের বাৎসরিক আয় ৭,০০০ ডলার যা পেশাদার ও কারিগরী শ্রেণীর ছয়টি পরিবারের মধ্যে একটির পক্ষেই সম্ভব। এভাবেই শ্রেণীরেখা মুছে যাচ্ছে। সম্পত্তির মালিকদের আয় হ্রাস পাচ্ছে আর শ্রমিকদের আয় বাড়ছে। সকল ধরণের বিশেষ কাজের সংখ্যা বাড়ছে আর সাধারণ শ্রমিকের সংখ্যা পূর্ববৎ থেকে যাচ্ছে অথবা কমছে।

তিন কোটি ষাট লক্ষ মানুষের জীবনবীমা আছে, তিন কোটির আছে সেভিংস অ্যাকাউন্ট, আর চার কোটির বসবাস নিজস্ব বাড়ীতে। কয়েক লক্ষ বেবী সিটার্স থেকে ১৯৫৬ সালে আয় হয় এক বিলিয়ন ডলার। নতুন বৈশিষ্ট অনেক জিনিষের প্রতীক—যেমন ছোট পরিবারের বাইরের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা, বৃদ্ধ আর শিশুদের নতুন কাজ যা এই প্রয়োজন থেকে মিটতে পারে, এ রকম প্রয়োজন এবং বেবী সিটার্স-এ যে ধরণের আমোদ প্রমোদ সম্ভব তার জন্য অর্থের সরবরাহ এবং সকল কাজ পেশা হিসেবে সুগঠিত হওয়া। হলিউডের বেবী সিটার্স গীল্ড-এর রেজিষ্টার্ড সিটার্স-এরসংখ্যা ৪,৮০০। সেখানে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে শিশু সদস্যদের পরীক্ষা করা হয়। ডেট্রইট-এ একটি প্রাথমিক স্কুল পঞ্চম শ্রেণীতে বেবী সিটিং সম্পর্কে পড়ান হয়। বাচ্চাদের কি করে বসতে হয় সে সম্পর্কে কেউ কোন শিক্ষা দেন নি, কিন্তু সন্দেহ নেই যে তাও হবে।

স্বয়ংক্রিয় কাপড় ধোয়া যন্ত্র, বায়ুর চাপে পরিস্কার করা যন্ত্র (অটোমেটিক ওয়াসার্স, ভ্যাকাম ক্লীনার্স), ঠাণ্ডায় জমাট (ফ্রজেন) খাদ্য, মেশানোর যন্ত্র (মিকসার) প্রভৃতি, দশ বছর আগে ভৃত্য রাখতেন, এমন মেয়েদের কাজই

শুধু হালকা করে দেয় নি, লক্ষ লক্ষ কুলবধূ যাঁদের সে সুবিধা ছিল না তাঁরাও উপকৃত হচ্ছেন। বিশেষ করে খামারের মেয়েরা একদা যাদের জল বহন অথবা পাম্প করতে হত, হাতে ধোয়া, ঘষা আর কাঁচার কাজ করতে হত এবং সবজী আর মাংস জমাট করার বদলে টিনে ভতি করতে হত, যান্ত্রিক গৃহ সরঞ্জাম তাকে অকারণ পরিশ্রম থেকে মুক্তি দিয়েছে।

খুচরো ব্যবসায়ী

যে অর্থনীতি নিজস্ব সজীবতার জন্যে উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় চায়, তা কখনই ক্রেতাদের জন্যে বসে থাকতে অথবা অপেক্ষা করতে পারে না। যে বিশ্রী বিজ্ঞাপন আমাদের অনেককে ও আমাদের দর্শকদের চক্ষুকে পীড়া দেয়, তা অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয় যদি অভাব ও সঞ্চয়ের কৃচ্ছ্রসাধন থেকে আমরা ব্যয়ের পথে সমৃদ্ধির দিকে যেতে চাই। বিজ্ঞাপন এবং মনস্তত্ববিদ, ভোট গ্রহণ ব্যবস্থা এবং মার্কেট সার্ভের সহায়তায় ক্রেতার কেনার ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলে, ভীতু অথবা উদাসীনকে আগ্রহান্বিত করে তোলে এবং মানুষকে ভোগ করতে শেখায়।

এরকম যুক্তি দেখান যেতে পারে, বিজ্ঞাপন বাবদ যে অর্থের অপচয় হয়, তা থেকে ভাল স্কুল, রাস্তা আর হাসপাতাল হতে পারত। এই সমালোচনা সম্পর্কে সচেতন অ্যাডভারটাইজিং কাউনসিল জাতীয় বিজ্ঞাপনের শক্তি ও সামর্থ যাতে সামাজিক প্রয়োজনে আসতে পারে তার ব্যবস্থা করেছেন। এর নীতি হল জাতিকে বিপদ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা ; (যেমন স্কুল কক্ষ ও শিক্ষকদের অভাব)। পরে স্বেচ্ছা সংগঠনগুলো চিরাচরিত মার্কিন পদ্ধতিতে স্থানীয়ভাবে তার সমাধান করতে পারে।

বিজ্ঞাপনের আপত্তিকর চিৎকারের আর একটা জবাব হল সাংগঠনিক দৃষ্টি-ভঙ্গী। ডু-পন্ট মার্কিন ইতিহাসকে ভিত্তি করে প্রচুর রেডিও ও টেলিভিশন নাটক উপস্থাপিত করেছিলেন। এতে কোন পণ্যের বিজ্ঞাপন নেই, শুধুমাত্র সংগঠনটিকে রসায়ন শাস্ত্রের মাধ্যমে উন্নত ধরণের জীবনযাপনের উপযোগী প্রস্তুতকারক হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়। টেক্সাস কোম্পানী অপেরার সময়ে প্রতি সপ্তাহে বিনা লাভে মেট্রোপলিটান অপেরার আয়োজন করেন।

বিজ্ঞাপন এখন সমাজের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অশ্লীল এবং সৌন্দর্যপিপাসু ও সমাজ সচেতনদের নিকট আপত্তিজনক থেকে অনেক রকমের

বিজ্ঞাপনই আছে। বিজ্ঞাপন সৃষ্টির মূলে যে শক্তিগুলি রয়েছে, তা থেকেই জন্ম নেয় তার অশালীন স্থূলত্ব। এই শক্তিগুলি হোল ক্রেতাদের অর্থের জন্য প্রতি-যোগীতা এবং বিরাট উৎপাদন ব্যবস্থাকে চালু রাখবার জন্যে বাজারকে নিয়ত সম্প্রসারণশীল করে তোলার স্নায়ব প্রয়াস।

এই চাহিদা থেকে উদ্ভূত ক্রেতার জন্য বিবেচক হবার নীতি, কখন কখন বৈদেশিক পর্য্যবেক্ষকদের বিস্মিত করে তোলে। বাড়ীতে পণ্য পৌঁছে দেবার সংস্থা অথবা বিভাগীয় বিপনি, সামান্য অথবা কোন প্রশ্ন না করেই মাল ফেরৎ নেয়। বিক্রেতাদের যে শিক্ষা দেওয়া হয় তার মধ্যে বিশেষ করে থাকে সৌহার্দ্দ, শালীনতা এবং ক্রেতাকে সাহায্য করবার আন্তরিক ইচ্ছা। প্রমিতকরণ (standardization) এবং ব্রাণ্ডের নাম করলেই ক্রেতা নির্ভর করতে পারেন এমন পণ্য হাজির করা হয়। কিস্তিতে কেনা, টেলিফোনে অর্ডার সরবরাহ, ঘরে ঘরে গিয়ে বিক্রয় ও পণ্য পৌঁছে দেবার ব্যবস্থার ফলে ক্রেতাদের অর্থব্যয়ের ইচ্ছা আরও সহজ হয়েছে। ক্রেতার অর্থব্যয়ের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে জাতির অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য।

সমস্যা

এই সমৃদ্ধিশালী অর্থনীতির মাঝে মাঝে মন্দা দেখা দেয়, কোন কোন সময় সন্দেহের উদ্রেকও করে। এই স্বাস্থ্য ও উন্নতি অটুট রাখা যায় কি করে? সত্যিই কোনদিন যদি বাৎসরিক ৪০ বিলিয়ান ডলারের উদ্ভট সামরিক ব্যয় ছেটে ফেলে দেওয়া সম্ভব হয়, তা হলে কি ঘটবে? যে সম্পদের অত্যধিক ব্যবহার হচ্ছে তার কি হবে? এখন হাতের কাছে অর্থ ও মুদ্রার দিক দিয়ে স্থায়িত্ব আনার যে ব্যবস্থা আছে, সত্যিকার গুরুতর মন্দা প্রতিরোধে তার প্রয়োগ করতে পারব কি? না কি সে ব্যবস্থা মন্দা প্রতিরোধে অসমর্থ হবে কিংবা ঠিক সময়ে প্রয়োগিত হবে না! এখন দারিদ্রের যে ভয়াবহ ক্ষেত্রগুলি রয়েছে তাদের মুছে ফেলার জন্যে আমাদের উৎপাদনের ফলাফলকে সম্প্রসারিত করে যেতে পারব কি? চাষীদের চাহিদা মেটানোর জন্যে আমরা কি করতে পারি? এখনকার মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা কি বিপজ্জনক সীমা অতিক্রম করবে? তাহলে কি করে নিয়ন্ত্রণ করব তাকে?

আমাদের অর্থনীতির সম্মুখে এখনও যে সমস্যাগুলো রয়েছে, এসব তার কয়েকটি মাত্র। বর্ত্তমানের সুস্পষ্ট বিপদ হল মুদ্রাস্ফীতি। পণ্যের চাহিদা যতক্ষণ

প্রবল, শিল্প এবং শ্রমিক ব্যয়বৃদ্ধির বোঝা ততক্ষণ সহজেই ক্রেতদের কাঁধে চাপিয়ে দিতে পারা যায়। মুদ্রাস্ফীতি এড়ানোর একমাত্র পথ হতে পারে সরকার কর্ত্তৃক মূল্য নিয়ন্ত্রণ।

অর্থনীতির স্থায়িত্বের জন্য এমন উৎসাহ যোগানো দরকার, যাতে মূলধনী মালের (capital goods) জন্য ব্যয়সূচীকে শিল্প অব্যাহত রাখে। আর বে-সরকারী ব্যাঙ্কের ঋণের ওঠানামা নিয়ন্ত্রণের প্রতিক্রিয়া যাতে ক্রেতাদের ব্যয়ের বহরের উপর সবচেয়ে কম অনুভূত হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। (সামনার স্লিকটার, দি আমেরিকান ইকনমি : ৮০ পৃষ্ঠা)

অর্থনীতির আর একটি সমস্যা হল গৃহ ব্যবস্থা। অনেক আমেরিকান এখনও সহর অথবা গ্রামের বস্তিতে বসবাস করেন। বস্তিগুলো মালিকদের পক্ষে লাভজনক এবং সংশোধনী ব্যবস্থাগুলো এত ব্যয়সাধ্য যে একমাত্র সরকারই সে কাজে হাত দিতে পারেন। অথবা এজন্যে স্বেচ্ছায় সংগৃহীত অর্থ একত্রিত করা যেতে পারে।

সহরগুলোর সহযোগীতায় ফেডারেল সরকার প্রায় ৭৫০টি সহরকেন্দ্রে বস্তি অপসারণ ও গৃহনির্মাণ কার্য্যসূচীতে হাত দিয়েছেন। শুধুমাত্র স্বল্প আয়ের পরিবারই এর আওতায় পড়েন। সাধারণ ঘরভাড়া মোট আয়ের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। পরিবারের লোকসংখ্যা বুঝে ঘর দেওয়া হয়, যাতে বস্তির মত আবার ভীড় না হয়। চিকাগোর তিনটি সর্ব পুরাতন পরিকল্পনার আদি প্রজা-দের পাঁচভাগের চার ভাগ ভাল নিজস্ব বাড়ীতে উঠে গেছেন। এভাবে গৃহ-নির্মাণ পরিকল্পনা পরিবারের জীবনধারণের মান উন্নত করে এবং ব্যক্তিগত মালিকানার পথ সুগম করে দেয়।

শিল্প-সৃষ্ট প্রাচুর্য্য শ্রমিকদের সমৃদ্ধিশালী করলেও, কৃষি যে প্রাচুর্য্য সৃষ্টি করেছে, আনুপাতিক হারে তাতে কৃষকের আয় হ্রাস পেয়েছে। শিল্পজাত পণ্য গ্রহণে আমাদের কোন সীমা মানতে হয় না, কিন্তু খাওয়ার একটা সীমা আছে। এমন কি অধিক প্রোটিন আর তাজা খাবার, খাওয়ার উন্নত ধরণের অভ্যাস এবং ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা, চাষীর যন্ত্র এবং বৈজ্ঞানিক চাষভিত্তিক অধিক-হারে উৎপন্ন পণ্য সমস্তটুকু নিঃশেষিত করতে পারে না।

বিদেশের ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহের কার্য্যসূচী ও স্কুল আর দেশের সংগঠনগুলো এবং গরীবকে বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে খাদ্য যোগান দিলেও, বাড়তি খাদ্যশস্য বাড়তিই থেকে যায়। কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) মূল্য সহায়ক

কার্য্যসূচী বাড়তি সমস্যাকে শুধু আরও ভয়াবহ করে তোলে। চাষীকে তার জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ রাখলে যে পুরস্কার দেওয়া হয়, তাতেও তাকে বাকী জমিতে আরও প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপাদনে উৎসাহিতই করা হয়।

উত্তরের বিরাট গম ভূমি থেকে মধ্য প্রান্তের শস্য আর শূকর অঞ্চল, তারপর দক্ষিণের তুলো আর তামাক, ক্যালিফোর্ণিয়ার সদ্য সেচপ্রাপ্ত উপত্যকা থেকে ভেরমন্ট ও নিউ হ্যাম্পাশায়ারের এবড়ো খেবড়ো তৃণাঞ্চল, টেকসাসের ৯২০,০০০ একর, কিং র্যানচ থেকে অ্যালবানিয়ার নতুন করে কাটা কিছু জমির উপরের ক্ষেতমজুর—আমেরিকান কৃষিকার্য এত হরেক রকমের যে, কোন বিশেষ কার্যসূচী থেকে তার চাহিদা মিটতে পারে না।

সমবায় সংগঠনের পথে চাষীরা নিজেদের সাহায্য করেছে। তাদের মোট চাহিদার শতকরা বার ভাগ পাইকারী দামে পেয়ে থাকে এবং উৎপন্ন মাল সবচেয়ে সুবিধাজনক সত্ত্বে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছে। গ্রীন্জ এবং ফার্ম ব্যুরোর ন্যায় বিরাট স্বেচ্ছা সংগঠনগুলো অন্যান্য যে সুবিধে দিয়েছে, তার মধ্যে আছে স্থানীয় ভাবে সামাজিক এবং শিক্ষা সম্পর্কিত কার্যসূচী এবং রাজ্যের রাজধানী-গুলোর উপর অধিক রাজনৈতিক ক্ষমতা। বহু ফেডারেল সাহায্য, যেমন ভূমি সংরক্ষণ, গ্রামাঞ্চল বিদ্যুতিকরণ, শস্যবীমা, সেচসূচী, কৃষি গবেষণা, ইস্তা-হার, সম্প্রসারণ ও ঋণ সাহায্য সংগঠনের এজেন্টদের পরিদর্শন ব্যবস্থা, আমাদের চাষীদের অন্য নাগরিকদের তুলনায় অধিক সুবিধা প্রাপ্তের পর্য্যায়ে তুলেছে।

তবুও অর্থনীতির বাকী সকলের সঙ্গে চাষীরা আর পাল্লা দিয়ে চলতে পারছে না। মূল্য সহায়ক কার্যসূচীতে প্রধানতঃ বড় বড় চাষী অথবা বৃহৎ এলাকার নিয়ন্ত্রক কর্পোরেশনগুলোরই সুবিধে হয়, যাদের আদৌ কোন সাহায্যের দরকার নেই। এই সাহায্যসূচী যাদের আদৌ স্পর্শ করে না তার মধ্যে রয়েছে পনর লক্ষ প্রায়-যাযাবর শ্রমিক, যারা শস্য নিয়ে উত্তরমুখে ধাবিত হয়, দিন মজুরের কাজ করে এবং বিশ্রী ঘর-বাড়ি, সেকেলে স্বাস্থ্যরক্ষা ও অপ্রচুর চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য হয়। যাযাবর বলে ভোটার হবার মত ঠিকানা তাদের নেই, সমাজজীবনের সুবিধা অথবা ছেলেমেয়েদের অবারিত শিক্ষা দেবার সুযোগ থেকেও তারা বঞ্চিত।

আইওয়া ষ্টেট কলেজের কৃষি অর্থনীতির অধ্যাপক জিওফ্রে শেফার্ড মনে করেন, "বাড়তি শস্য উৎপাদন বন্ধ করার পথই হল, খামারের আয়বৃদ্ধির উপায়

হিসেবে মূল্য সাহায্য দেওয়া।" *শেফার্ড বিশ্বাস করেন যে, খামারগুলোতে চড়া জন্মহারের ফলেই বছরে পাঁচলক্ষ চাষী বাড়তি হয়ে যায় এবং খামারের কম আয়ের জন্য এই-ই দায়ী। এমন কি সাধারণ গম অথবা ডেয়ারী চাষীর ভাল জমি থাকলেও সে বছরে ২০০০ ডলারের মত আয় আশা করতে পারে। এই আয়বৃদ্ধির পথ হল চাষীর সংখ্যা হ্রাস,—চাষ করা জমির আয়তন হ্রাস নয়—এবং তারপর মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধি। কিন্তু এই সহজ সরল জবাব যাঁরা চাষীদের ভোটসংখ্যা কম করার চাইতে বেশী করতে চান, তাঁদের খুশী করে না। খুশী করবে না তাঁদেরও, যাঁরা মনে করেন চাষবাস এমন ধরণের জীবনযাপনের পদ্ধতি যার দ্বার যে চাইবে তার জন্যই উন্মুক্ত থাকা দরকার। গ্রাম্যজীবনের প্রতি আবেগজনিত শ্রদ্ধা এবং তার শ্রেষ্ঠত্বের আস্থা অত্যন্ত শক্তিশালী উপাদান।

বৈদেশিক বাণিজ্য

পৃথিবীর মোট পণ্যের শতকরা চল্লিশ ভাগ উৎপন্ন করলেও, পৃথিবীর মোট বাণিজ্যের দশ ভাগের এক ভাগই মাত্র যুক্তরাষ্ট্রের অধীন। শুল্ক সুবিধা, উপঢৌকন এবং ঋণদানের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের উৎপাদন ও বাণিজ্যে তার অংশ দিতে প্রয়াস পেয়েছে। সাফল্যের সঙ্গে এই দেশ বিদেশে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে উৎসাহ যুগিয়েছে। আলাপ-আলোচনার পথে বহু পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করেছে এবং পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। বাণিজ্য চুক্তি কার্যসূচীর ফলে আমেরিকার শুল্ক আয়, যা গড়ে ১৯৩০-৩৩ সালে শতকরা তিপান্নভাগ ছিল, ১৯৫১ সালে শতকরা পনর ভাগ থেকেও কমে যায়। যে জাতি এতদিন উচ্চ শুল্ক হার নীতি অনুসরণ করে এসেছে, তার পক্ষে এ কম বদান্যতা নয়। বৈদেশিক আমদানীর ফলে যে সকল শিল্প অসুবিধায় পড়েছে, তারা নিয়ত তাদের প্রভাব খাটাচ্ছে এই কর্মসূচীকে সঙ্কুচিত করবার জন্যে। কংগ্রেসের যে সকল প্রতিনিধি বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগীতার ফলে চাকরী যেতে পারে এমন মেয়ে অথবা পুরুষের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদের উপর মার্কিন শিল্পকে রক্ষা করবার জন্য জোর চাপ পড়ছে।

যুক্তরাষ্ট্র দ্রুত তার তামা, দস্তা, শিশে, পেট্রোল ও অন্যান্য অপরিহার্য সম্পদ

---

*আমেরিকান অ্যাসেমব্লি, ইউনাইটেড ষ্টেটস এগ্রিকালচার, ৭৭ পৃষ্ঠা

ব্যবহার করে ফেলেছে। এ সবের অর্ধেকটা বিদেশ থেকে কিনতে হবে। এখানেও স্থানীয় স্বার্থ বাধা দিচ্ছে। যে খনি শ্রমিকদের কাজ থাকবে না, তাদের কি হবে? তাদের বেতনের উপর যে সমাজ নির্ভরশীল তাদেরই বা কি হবে?

যতদিন আমাদের বেতন, উৎপাদন এবং জনসাধারণের মান বিশ্বের সাধারণ স্তর অপেক্ষা উপরে থাকবে, ততদিন বিশ্বের অন্যান্য অংশের সঙ্গে আমাদের লেনদেনে আমরা বিব্রতই হব। এমন কি উদার মনোভাবও আমাদের চিন্তিত করে তোলে। বিদেশে, বলতে গেলে, এজন্য আমরা অপরাধী হয়েই আছি, আর স্বদেশে এমন ভাব দেখাতে হয় যে, কতকগুলো সাময়িক সুবিধা ছাড়া, আমরা দেওয়ার ব্যাপারে বেশ কড়া। তবুও, একথা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট যে, সমগ্র বিশ্বের উৎপাদন ব্যবস্থা উন্নত হলে আমরাও উপকৃত হব।

ব্যবসা ও সরকার

সমৃদ্ধিকে নিশ্চিত করবার জন্য অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সরকারের—এ ভাবধারা আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত নতুন। মধ্যস্থতার ভূমিকা এবং ব্যয় বাহুল্যের সঙ্গে অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকাই প্রধান। (ছোটখাট ব্যতীত) কর্পোরেশনগুলোর লাভের শতকরা আটত্রিশ ভাগ যায় সরকারের রাজকোষে। তারপর আবার তাঁদের আয় অনুসারে শেয়ারহোল্ডাররা সরকারকে ট্যাক্স দেন।

আমাদের জীবদ্দশায় যা দেখলাম তাকে শান্তিপূর্ণ বিপ্লব বলা যায়। এই সময়ে ক্যাপিটালিজমের সমাজীকরণ হয়েছে, তার প্রভূত উৎপাদন ক্ষমতা, পছন্দ-অপছন্দ আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বাধীনতা মেনে নেওয়া হয়েছে এবং সারবদ্ধ সাবষ্টেশনের মাধ্যমে যেমন বৈদ্যুতিক শক্তি বিতরিত হয়, এও সেইরকম বন্টিত হয়েছে, বিরাট অর্থ-নৈতিক গোষ্ঠী শ্রম, শিল্প ও কৃষির ভিতরে। ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মারগুলো (স্বেচ্ছা সংগঠন) গেছে ক্রেতাদের হাতে। দীর্ঘ দিনের প্রকাশ্য প্রতিরোধ ও পশ্চাদপসরণের পর ক্যাপিটালিজম সরকারের সঙ্গে রফা করে নিয়েছে বলতে হবে। ব্যবসায় ও সরকার এবং অর্থনীতি ও রাজনীতির মধ্যকার প্রাচীর ভেঙে ফেলা হয়েছে। এখন তাদের এমন সমাজ ব্যবস্থার অংশ হিসেবে দেখা যাবে, যার লক্ষ্য হল মানুষের কল্যাণ সাধন। সমাজীকৃত ধনতন্ত্রবাদ অথবা স্যোস্যালাইজড্ ক্যাপিটালিজম সুবিধার বহর বাড়িয়ে দিয়েছে এবং যে কোন

সোস্যালিষ্ট অথবা কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র অপেক্ষা ধনী-দারিদ্র্যের ব্যবধানকে সঙ্কীর্ণ করে দিয়েছে। সম্পত্তি-কর বিরাট পারিবারিক সম্পত্তির সম্ভাবনা দূর করে দিয়েছে।

আমাদের সমাজব্যবস্থা ত্রুটিহীন অবস্থা থেকে এখনও অনেক দূরে, তবে নিয়ত গতিশীল—এবং ঠিক পথে আমরা চলেছি। প্রাচুর্য এবং স্বাধীনতা, এই দুটোকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না। যুক্তরাষ্ট্রে এমন এক সমাজ ব্যবস্থার পথে এদের অর্জন করা হয়েছে, যেখানে ব্যক্তিবাদের সঙ্গে স্বেচ্ছাবাদ এবং কেন্দ্রীয়বাদ সমকারী শক্তিসমূহের নিয়ত উত্তেজনার মধ্যে মিলিত হয়েছে। এই পদ্ধতির ফলে মালিকানা বিক্ষিপ্ত ও ব্যাপক হয়েছে, উদ্যোগ ও সংকল্প ছড়িয়ে পড়েছে এবং প্রাচুর্যের বিতরণক্ষেত্র নিয়ত প্রসারিত হয়েছে।

নিশ্চিত প্রাচুর্য নিয়ে আমেরিকানরা অধিক হারে কেনাবেচার বাইরের মূল্যকে এবং বিষয়গত ঐশ্বর্য পুঞ্জীভূত করার সঙ্গে সম্পর্কহীন কার্যক্রমকে স্বীকার করছে। চিরদিনই আমাদের একটি বড় কথা হল স্বেচ্ছামূলক পৌর কার্যক্রম। এর উপরে এখন সমাজের অঙ্গ হিসেবে যা আমাদের নতুন আর শক্তিশালী করে তোলে তাকেও মূল্য দিচ্ছি।

পর্যাপ্ত জীবনের অত্যাবশ্যকীয় উপাদানের অভাব যাদের হতাশ করে তুলেছে, তাদের কাছে বিষয় মূল্যই সম্ভবতঃ সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দেবে। এমন অনেক ইংগিত পাওয়া গেছে যা থেকে বলা যায়, প্রাচুর্যের আভাস পেতেই অন্যান্য মূল্য-বোধ মনে জেগে ওঠে। মানুষের আচরণে মুনাফার মনোভাবকে অর্থনীতিবিদ সব সময়েই প্রাধান্য দিয়েছেন, কিন্তু এও সুস্পষ্ট যে অন্যান্য মনোভাবও আগের তুলনায় অধিকতর প্রভাব বিস্তার করছে।

পার্থিব প্রাচুর্যকে প্রায়শঃই জড়বাদের সঙ্গে ভুল করে এক করা হয়। পার্থিব প্রাচুর্যের চিহ্ন যুক্তরাষ্ট্রে সহজেই পাওয়া যাবে ; পর্যবেক্ষকদের কাছে যতটা বড় করে সেটা ধরা পড়ে, আমাদের কাছে ততটা নয়। আমরা বরং পছন্দ করি আমাদের উজ্জ্বল ছোটখাট যন্ত্রপাতি। কখনও বা বালকের মতো খুশী হয়ে উঠি এই সব নিয়ে, কখনও খুশী হই ওরা যে স্বাচ্ছন্দ্য দেবে সে কথা ভেবে। কিন্তু তাদের দূর মেয়াদী মূল্য আমাদের কাছে জড়বাদমুক্ত হবার হাতিয়ার হিসেবেই—তেমন যদি চাই, এ থেকে অ-পার্থিব কিছুও উৎপন্ন হতেও পারে।

ইতিমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, যা দুনিয়ার আর কোথায়ও এখন পর্যন্ত দেখা দেয় নি। শ্রেণীবিভেদ যখন প্রকৃত প্রস্তাবে মুছে যায় তখন সংস্কৃতির আকৃতি কেমন হয়? অধিকাংশ মানুষের অবসর আর

ব্যয় করবার মত অর্থ থাকলে তারা কোন পথে যাবে? যান্ত্রিক অর্থনীতিতে ব্যক্তির সন্তোষ আর নিরাশার অনুভূতিটা কি রকম হয়? পুরোপুরি অর্থনীতিক নয়, এমন সব সমস্যা সমাধানে উৎপাদনশীল অর্থনীতিকে কি করে কাজে লাগান যায়? পছন্দ অপছন্দ, সংবেদশীলতা এবং আদবকায়দার উপর তার প্রভাব কতটুকু আর কি ধরণের? ললিত ও লোককলার উপর তার প্রভাবই বা কতটুকু?

আর্ট

একটি গতিশীল এবং, বলতে গেলে, শ্রেণীহীন সমাজের উপযোগী কোন আর্ট আছে কি ?

দ্য তকেভিলির ধারণা ছিল, আছে। এমন সমাজের সাহিত্য অবশ্যই সহজে পাওয়া যাবে এবং দ্রুত পঠিত হবে। সে-সাহিত্যে চিত্রিত হবে গভীর আবেগ। ষ্টাইল হবে তীক্ষ্ণ এবং হালকা। সাহিত্যের বিষয় হবে আশা করা যায় না এমন কিছু, আর নতুন কিছু, যাতে আনন্দ দেবার চেয়ে চমকে দেওয়া যায় বেশী করে, রসানুভূতিকে চমৎকৃত করার চেয়ে অতি-আবেগকে (প্যাসন) চঞ্চল করে তোলে।

দ্য তকেভিলির মন্তব্য গণসাহিত্য সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রযোজ্য হলেও শিক্ষা এবং প্রাচুর্যের ফলে নানান ধরণের যে পাঠকগোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে, তাদের কথা এ মন্তব্যে নেই। তবুও সুস্পষ্ট ভাষায় বাণিজ্যিক সভ্যতায় আর্টের বিপদের কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন।

তাঁর দূর দৃষ্টিতে এটা ধরা পড়েনি যে, এমন সময় আসবে যখন মানুষ পরিশ্রম করা থেকে মুক্তি পাবে এবং তার মধ্যে রসানুভূতি দেখা দেবে—ইচ্ছে করলে এক ঘণ্টার মধ্যেই সে শিল্পী হতে পারবে। সাধারণ মানুষের বিশেষ জ্ঞানলাভ কি বিস্ময়কর পর্যায়ে উঠবে, তাও তিনি দেখতে পান নি। এখন এরাই বছরে ১০০,০০০,০০০ ডলারের ক্লাসিকাল রেকর্ড কেনে। এঁরা গানের শুধু সমঝদারই নয়, একজন শিল্পীর সঙ্গে আর একজনকে তুলনাও করে।

আমেরিকানরা তাঁদের বৈষয়িক উন্নতি সম্পর্কে বিরক্তিকরভাবে গর্বিত হলেও, তাঁরা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে লজ্জা অনুভব করেছে এইজন্যে যে, তাদের পায়ের জুতোর গড়ন অথবা কাদালাগা জুতোর অগ্রভাগ ইউরোপীয়দের চোখে রুচিহীন বলে মনে হতে পারে। ইউরোপের কৃষ্টিকে আমরা অগ্রাধিকার দিতে সম্মত আছি। আমাদের অগ্রাধিকারের দাবী আমাদের গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সমৃদ্ধি, সাচ্ছন্দ এবং যান্ত্রিক নৈপুণ্য। যা কিছু পুরাতন, জীর্ণ এবং ক্লান্ত, তার প্রতীক হিসেবে দেখেছি আমরা ইউরোপকে—আধুনিকতা আর পৌরুষের প্রতীক হিসেবে নয়। তাই আর্ট চর্চার ব্যাপারটা আমরা মেয়েদের উপরই ছেড়ে দিয়েছি। আর্টও আমাদের কাছে ক্রমশঃ স্ত্রী-সুলভ মনে হয়েছে।

এ-চিত্র অবশ্য এখন পাল্‌টে যাচ্ছে। তবুও বিশ্বাসটা থেকেই যায়।

আসল কথাটা এই যে, আমাদের অতীতকে ত্যাগ করে ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হওয়াটাই অংশতঃ আর্টের জগতের প্রতীক চিহ্নগুলি থেকে সরে যাওয়া হয়ে দাঁড়ায়। দ্য তকেভিলি এটা ভালভাবেই লক্ষ্য করেছিলেন। কারণ আর্টের পরিধি রহস্য আর প্রতীক নিয়ে, যা জীবনের বিয়োগান্ত ভাবটা ফুটিয়ে তুলতে পারে, মানুষের অবস্থা আর ভাগ্যের কথাটা ইঙ্গিতে প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু আমেরিকা হল তেমন এক নতুন স্থান যার ভবিষ্যত ট্রাজিডিকে মেনে নেয়নি। এর অতীত কথা হল আশা।

এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হলে শুধু কবিত্ব করলে চলবে না। কদর্যতা, দারিদ্র্য এবং নীচে নামার কবলে পড়ে আমেরিকানরা নিজেদের জন্যে কিছু করতে কৃতসংকল্প হয়। ওদের অধঃপতনের মুখে রুখে দাঁড়ানোর প্রয়োজন অনুভব করেছিলাম আমরা--শুধু আর্টের মাধ্যমে উপলব্ধি দিয়ে নয়। সংশোধন করতেও চেয়েছিলাম। তাই সামাজিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর সমাজবিজ্ঞানের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে।

যে আগ্রহ ও উদ্দেশ্য শিল্পীকে উদ্দীপ্ত করে তোলে, আমাদের ক্ষেত্রে সেই আগ্রহ সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীর, মানুষ নিয়ে চর্চার মধ্যে স্থান পেয়েছে। এও মানুষের উদ্দেশ্য আর গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভের সেই অধীর আকাঙ্খা, মানুষের আচরণ ব্যাখ্যা করবার সেই একই প্রয়াস। এর পরিণতি হল একটি পাঠ্য পুস্তকে, পরিবার কল্যাণ অথবা চিকিৎসাশাস্ত্রে মনোরোগ বিদ্যার আবির্ভাবে।

তাই শিল্পীর পদ্ধতিকে, অভিজ্ঞতাকে তৎক্ষণাৎ স্বীকার করাকে আমাদের চলবার পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেছি। প্রবল কৌতূহলে চালিত হয়ে শিশু যেমন সাগরসৈকতে একটা গর্ত খুঁজে পেলে ভিতরে কি আছে দেখতে চায়, তেমনি আমরা পৃথিবীকে জানতে চেয়েছি। অথবা কবি যেমন প্রকৃতির খেয়াল অথবা কোন মুহূর্তকে অনুভব করতে চায়, সেই ভাবে। কিন্তু আর্ট যে সৃষ্টি করে তা আমাদের বিদ্যমানতার বাখ্যাই শুধু, কিন্তু আমাদের যা সৃষ্টি তা প্রায়শঃই এমন কিছু হয়েছে, যা অবস্থার রূপান্তর ঘটায়।

প্রতিভা যখন আর্টের দিকে ঝুঁকেছে তখনও প্রবণতা অবস্থা পরিবর্তনের দিকেই,—অন্ততঃপক্ষে আমেরিকার বিশেষ অর্থ আবিষ্কার, সুন্দরতা এবং জঘন্যতা উভয়ের মধ্যে আমেরিকাকে আরও সুস্পষ্টভাবে দেখার দিকে। তাই গ্রান্ট

উড নীরস প্রেরী অঞ্চল এঁকেছেন খামারের চাষীর পরিপ্রেক্ষিতে এবং ওয়াল্ট হুইটম্যান সংগ্রাম করেছেন এলোমেলো, স্পন্দিত, উত্তেজনাপূর্ণ জাতিকে ছবির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে।

আমাদের অনেক বড় কবি আছেন, আবার হবেনও ; তবুও আমাদের সংস্কৃতিতে সাহিত্যের স্বাভাবিক প্রবণতা হল সাংবাদিকতার উপর। সাধারণ ঘটনা ও বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন আর দৈনন্দিন জীবনে তার বাস্তব রূপায়নের দিক থেকে যে দুনিয়া দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে, সাংবাদিকতা সেখানে অপরিহার্য। এখন বিজ্ঞানের সহজ বর্ণনা কবিদের সাবেকী কল্পনাকে ছাড়িয়ে গেছে ; ওডিসেস-এর বিস্ময়কর ভ্রমণ বৃত্তান্তের তুলনায় ওয়াল্ট ডিসনে রূপালী পর্দায় প্রকৃতির বিস্ময়কর যে অবদান দেখান, তা অধিক বিস্ময়কর। তাই এই পটভূমিকায় আমরা চাই বাস্তববাদী মানুষ যাঁরা আমাদের সঠিক চালিত করতে পারেন, এমন মানুষ যাঁরা আমরা বুঝতে পারি এমন ভাষায় কথা বলতে পারবেন।

দুনিয়ার কি ঘটছে জানতে চান ? সাপ্তাহিক সংবাদপত্র অথবা মহাদেশ-গুলোর রাজনৈতিক পরিচয় পাবেন জন গানথারের 'রাজনৈতিক গাইড' পুস্তকে। মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে চান ? ওভার ষ্ট্রীটের শেলফগুলোতে রয়েছে সহজ সরল বইয়ের সারি। এখানকার বিশেষজ্ঞদের ঔপন্যাসিক অথবা নাট্যকারের ন্যায় বর্ণনক্ষমতা প্রয়োগের দক্ষতা আছে। আর যেসব বিষয় নিয়ে ওঁরা গবেষণা করেন, সেসব রীতিমত আকর্ষণীয়, তাই বহুলাংশে ওঁরা ঔপন্যাসিক ও নাট্য-কারের স্থান দখল করে নিয়েছেন।

সাংবাদিকতা উপন্যাস এবং নাট্য জগতেও প্রবেশ লাভ করেছে। আপটন সিনক্লেয়ার তার উপন্যাসগুলোতে যেমন ঘৃণ্য অতীতের মাংস বিক্রেতা আর তেল মালিকদের পাপের মুখোস পাঠকদের কাছে খুলে ধরতে চেষ্টা করেছিলেন, আজকের ঔপন্যাসিকেরা সেই রকম সিনেমা জগতের নীচতা, বিজ্ঞাপনের মারপেঁচ অথবা ক্যারিয়ারের জীবনযাত্রার কলুষতা প্রকাশ করছেন। সংবাদ সাময়িকী-গুলো উপন্যাস রচনাপদ্ধতির সাহায্যে সমসাময়িক ঘটনাগুলোকে লোভনীয় আর স্মরণীয় করে পরিবেশন করছেন, আর আধুনিক জীবনযাত্রা চিত্রনে উপন্যাসিকেরা সাংবাদিকতা পদ্ধতির সাহায্য নিচ্ছেন। চলচ্চিত্রও যত দিন যাচ্ছে, সমসাময়িক ঘটনামুখী হচ্ছে। যে ঘটনা মানুষের পারস্পরিক মূল সম্পর্ক প্রকাশ করে, তার পরিবর্তে যেসব ঘটনা সমস্যা প্রকাশ করে তাই আমরা পাচ্ছি। এই সমস্যাগুলো হল বর্ণগত বৈষম্য, পানাসক্তি আর অপরাধ প্রবণতা।

যান্ত্রিক দুনিয়া সাংবাদিকতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে; আমাদের যা লিখিত, চিত্রিত অথবা রচিত তা জানবার উপায়গুলিও যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে। প্রাচীন দলিল, কাগজের বই, ছবি এবং রঙীন ছবির সুন্দর প্রকাশের প্রাচুর্যের জন্য দায়ী "বস্তুতন্ত্রবাদ"। জনপ্রিয় সাময়িকী 'লাইফ', টি এস এলিয়টের গোলমেলে কবিতাগুলো, হেমিংওয়ের 'ওলডম্যান অব দি সী' প্রকাশ করে, অতীতের বিখ্যাত লেখকদের যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলে, বিশ্বের ধর্মবৃত্তান্ত প্রচার করে। চীজ কেকের মত খাবারের এবং অপরাধীদের চিত্রও প্রকাশিত হয়। আগে ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিল যারা, তারাও ধরা পড়ে উচ্চ সংস্কৃতির জালে। কে বলতে পারে এ সংস্কৃতির জীবনীশক্তি কাকে ফুটিয়ে তুলবে?

আধুনিক কারিগরী বিজ্ঞান আর শিল্পপ্রবণতা থেকে সৃষ্ট হয়েছে রেকর্ড ও টেলিভিসন, অপেরা, চিত্রের পুনঃপ্রকাশও সম্ভব হয়েছে। জ্ঞানী বোঝদারদের জন্যে সংস্কৃতিকে সংরক্ষিত রাখবার ধারণার স্বপক্ষে শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন। সত্যিকার মহান আর্টের আবেদন, আমরা মনে করি, সার্বজনীন।

আর্টকে জনপ্রিয়রূপ দেবার এই প্রয়াস বিদেশী পর্যবেক্ষকদের অনেককেই ব্যথিত করে। তাঁদের ধারণা আর্টের পরিধি জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিলে, এর পবিত্রতা নষ্ট হয়।

সাহিত্য

আশা করা যেতে পারে হুইটম্যানকে অনুসরণ করে আমাদের সাহিত্যে প্রতিফলিত হবে নির্ভেজাল অকৃত্রিমতা, জীবন্ত আশাবাদ, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের সংস্কৃতির স্বাস্থ্যকর প্রয়োগবাদ।

আদৌ নয়। ডবলু, এইচ, অডেন বলেছেন, "ইউরোপ থেকে আসার পর আমার সবচেয়ে বড় যে ধারণা হয়েছে, তা হল কোন দেশে কোন কালে লিখিত সাহিত্য এমন সম্পূর্ণভাবে নৈরাশ্যমূলক নয়।"* শ্রেষ্ঠ আশাবাদী ও স্বাধীন হিসেবে খ্যাত রাষ্ট্র নিজেকে "অসহায়, হতভাগ্য, সন্দেহজনক চরিত্র আর বাস্তহারাদের সমাজ" হিসেবে কেন দেখবে—এই কথাই তিনি ভেবেছেন।

এর একটা উত্তর এই যে, আমেরিকান লেখকরা মনেপ্রাণে আদর্শবাদী, মার্কিনজীবনের প্রতিশ্রুতির উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেন এবং আদর্শ থেকে অপবিত্র হতে দেখলেই বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। লেখকের দায়িত্ব হয়েছে বস্তির উপর

* ফ্রেডারিক লিউস অ্যালেন কর্তৃক উদ্ধৃত। দি বিগ চেঞ্জ, ২৭১ পৃষ্ঠা।

দৃষ্টি দেওয়া। মার্কিন জীবনযাত্রার স্বভাবজাত বিপরীত ভারসাম্য রক্ষার দৃষ্টি নিয়েই সম্ভবত উপন্যাসিক বিজ্ঞাপনদাতার হয়ে ক্ষতিপূরণ করেন। হয়ত, ডি ডবলু, ব্রোগান ঠিকই বলেছিলেন, এখানকার সংগ্রামী জীবনযাত্রা থেকেই নিরাশা দেখা দেয়।

শক্তিশালী ঔপন্যাসিকেরা—গারল্যাণ্ড, ড্রেইসার আর নোরিস থেকে সিন-ক্লিরায় লুইস, আপটন সিন ক্লেয়ার, ডস প্যাসস, হেমিংওয়ে, ফকনার, ষ্টিনবেক্ থেকে যুদ্ধোত্তর কালের তরুণ লেখক গোষ্ঠী অবধি সবাই এই নৈরাশ্যবাদের উপরই তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। ১৯২৫ থেকে ১৯৪০ অবধি মার্কিন উপন্যাসই পশ্চিমী দুনিয়ায় সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিল।

হেমিংওয়ের শিল্পীসুলভ রচনা ভঙ্গীর বৈশিষ্ট এবং তাঁর অভিজ্ঞতাকে কি ভাবে হোলর পরিবর্তে কি ভাবে অনুভূত হোল, সে কথা বর্ণনা করবার দৃঢ় সংকল্প হল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচনায় বিশ্বের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলা মানুষের ত্রাসের ইঙ্গিত রয়েছে। তাঁর সৃষ্ট মানুষগুলো আত্ম-নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাবার ভয়ে ভীত, তাই ছোট করে, নীচু স্বরে তারা কথা বলে। তাঁর বীরেরা প্রায়শঃই শারিরীক শক্তিতে পরাজিত, যদি কোন রকমের জয় তাদের কপালে লেখা থাকে, সে হল নৈতিক জয়। এ যেন সেই পুরানো লেখা বৃদ্ধের কথা, যিনি মৎস্য আর সমুদ্রের সাহায্যে যুদ্ধ জয় করলেন কিন্তু পুরস্কার পেলেন না। তাঁর সব বই আর চরিত্রগুলোতে ধ্বংস আর মৃত্যুর বীভৎস রূপায়ণ।

জন ডস প্যাসস তাঁর আগেকার আমেরিকানদের মতোই জেফারসনীয় কৃষি গণতন্ত্র থেকে বড় ব্যবসায়ীদের কবলিত হ্যামিল্টনীয় অর্থনীতিতে পৌছানতে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। ত্রিশ দশকেব মানুষকে গৃহহীন আর স্বদেশে নিজের ঐতিহ্য থেকে বঞ্চিত হিসেবেই দেখেছিলেন। ক্যামেরায় আর নিউজরীলের মাধ্যমে তাদের জীবন ছবিতে তুলে ধরে, তিনি বেকার ও স্বল্প বেতনভুক্তদের হয়ে জষ্টি ধরেছিলেন। তাঁর নায়কদের হেমিংওয়ের নায়কদের মতো লড়াই করবার সুযোগ কখনই আসেনি। তারা আগে থেকেই পরাজিত, সহানুভূতিহীন রাজধানী তাদের আরও অসহায় করে তুলেছে।

উইলিয়ম ফকনার তাঁর দক্ষিণাঞ্চলের জীবনপদ্ধতি চর্চায় মানুষের হিংসা, অবনতি,আর অস্বাভাবিকতাই দেখেছিলেন। সেখানে অতীত, বর্তমানকে কলু-ষিত করেছে, লজ্জার সঙ্গে গর্ব মিশে গেছে এবং শিল্প যে ত্রাসের সঞ্চার করে, তার থেকেও ভয়ঙ্কর আর ভয়াবহ হল বর্ণ-বৈষম্যের অসহিষ্ণুতা-জর্জরিত

গ্রামের বস্তিগুলো। তাঁর গল্পগুলোতে দুঃস্বপ্নের ভীতিটুকু আছে। এমন কি তাঁর বইতে, ভাসমান অস্পষ্ট এবং অনুচ্চারিত উপাদানগুলোতেও এই সন্ত্রাসের ভাব আছে। তবুও এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেই ফাকনার যে ট্রাজেডির সন্ধান পেয়েছিলেন, তা অর্থহীন ছিল না।

অন্যান্য লেখকরাও, সংখ্যায় এঁরাও কম নন, একটার পর একটা সুবিধা-জনক স্থান থেকে মার্কিন দুনিয়াকে একই ধরণের অস্পষ্ট দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। এঁদের মধ্যে আছেন জর্জিয়ার আরস্কাইন কাল্ডওয়েল আর শিকাগোর জেমস ফারেল ও মেয়র লেভিন। জন. ও, হারা-ও অবস্থাপন্নদের জীবনের ফাঁকিটুকু দেখতে পেয়েছিলেন। বাড স্কুলবার্গ হলিউডে নগ্ন স্বার্থপরতা, যুদ্ধবাদীদের মধ্যে নৌ-দুনিয়ায় অথবা যেখানেই ক্ষমতা মানুষের সামাজিক মানকে অবহেলা করতে প্ররোচিত করে, সেখানেই দুর্নীতি দেখেছিলেন।

এদেশের আঞ্চলিক বৈচিত্র থেকে উদ্ভূত এ সাহিত্য নানাভাবে আনন্দদায়ক কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জীবনযাত্রা সম্পর্কে এর দৃষ্টিভঙ্গী যতটা নৈরাশ্যমূলক, তারচেয়ে অধিক বাস্তববাদী। ডরোথি ক্যানফিল্ড ফিশার শুধুমাত্র ভেরমন্ট-এর গ্রাম্যজীবনের বর্ণনাই করেন নি, ইয়াংকি সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের মনোভাবও গঠন করিয়ে দিয়েছেন। ওয়াল্টার. ডি. এডমণ্ডস্ এবং স্যামুয়েল হপকিনস অ্যাডমস্‌ বলেছেন নিউ ইয়র্কের কথা, মারাথা অসটেনসো (এবং তাঁর আগে উইলা কাথার) বলেছেন উত্তরের সমতলভূমির বহিরাগত নির্জন চাষীদের কথা, এ. বি. গাথরী বলেছেন দূর উত্তরপশ্চিমের পাহাড়িয়াদের কথা, কনরার্ড রিচটার বলেছেন পেনসিলভানিয়া আর দক্ষিণপশ্চিমের অতীত জীবনযাত্রার কথা, ক্লাইড ব্রাইঅন ডেভিস অনেক জায়গার মধ্যে বিশেষ করে মিসোরী আর কোলোরাডো, মারজোরি কিনান রলিংস ফ্লোরিডার পিছনের অঞ্চলের কথা। বেন লুসিয়েন বারমান নিজের জন্যে বিশেষ স্থান করে নিয়েছেন মাঝিদের সংস্কৃতির কথা তুলে ধরে।

কিন্তু আবার দক্ষিণে ফিরে এলেই দেখতে পাব হিংসা আর ক্ষয়, তবুও শক্তিশালী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অনেকেই দক্ষিণাঞ্চলের। অন্যান্যদের মধ্যে আছেন কারসন ম্যাককালার্স, লিলিয়ান স্মিথ, ইউডোরা ওয়েলটি, এমন আরও অনেকের নাম মুহূর্তমধ্যে করা যায়।

আমেরিকানদের সবাই বহিরাগত। নবাগতের অভিজ্ঞতা, ইউরোপে ও অন্যান্য মহাদেশে তাঁদের অতীত, এবং এদেশে তাঁদের সংগ্রামও ধীরে ধীরে

এখানকার সংস্কৃতির মধ্যে মিলিয়ে যাবার অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁরা শক্তিশালী সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। আরভিং ফাইনম্যান সংবেদনশীল প্রত্যয় নিয়ে প্রাচীনকালে ইহুদীদের জীবনযাত্রা নিয়ে লিখেছেন, হেরম্যান উক তীক্ষ্ণ ভাষায় চিত্রিত করেছেন বর্তমানের জীবনপদ্ধতিকে। অলিভার লা ফারগে তার 'লাফিং বয়' ও অন্যান্য বইয়ে দুই কৃষ্টির মাঝে ইণ্ডিয়ানদের সংগ্রামের দিকে সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়েছেন। রিচার্ড রাইট বর্ণবৈষম্যের ফলে নিগ্রোদের উপর কি প্রভাব দেখা দিয়েছে, তার বর্ণনা করেছেন, যেমন অন্যান্য নিগ্রো লেখকেরাও করেছেন। আমাদের জটিল জাতীয় চিত্র পূর্ণ করেছেন যাঁরা, তাঁদের নাম লিখলে একটি পৃষ্ঠা ভর্তি হয়ে যাবে।

নিজেদের মিশ্রসংস্কৃতির সমাজ থেকে আমেরিকানরা আন্তর্জাতিক জগতকে বুঝতে চেষ্টা করতে গিয়ে, তার মধ্যে নিজেদের ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলে। উপন্যাসগুলো এক্ষেত্রেও সংযোগ রক্ষা করলে। পার্ল বাক আন্তরিকতার সঙ্গে চীন সম্পর্কে লিখলেন। জেমস মিচনার নতুন করে এশীয় সংস্কৃতি আবিষ্কার করলেন। আমেরিকানরা সবসময়েই ইউরোপকে ভিত্তি করে উপন্যাস রচনা করেছেন। আফ্রিকা আগ্রহের কেন্দ্রভূমি হলে, আমেরিকানরা সাগ্রহে এমন সব উপন্যাস (সব সময়ে এসবের লেখক আমেরিকান নাও হতে পারেন) পড়তে লাগলেন যাতে সেখানকার দুঃখজনক তাৎপর্য্য ও সমস্যা সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

এই সব উপন্যাসের মাধ্যমে যে মনোভাবপ্রকাশ পেয়েছে, তা মুখ্যতঃ নৈরাশ্যমূলক হলেও, এমন সব প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক আছেন যাদের দৃষ্টিভঙ্গী এক তরফা নয়। জন ষ্টিনবেক জীবনকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন, তাঁর ধারণা জীবনের জন্য সংগ্রাম করা অর্থহীন নয়। সামাজিক দায়িত্বজ্ঞানহীনতা মানুষের কি করতে পারে, সে সম্পর্কে তাঁর মনোভাব এর উল্টোই। রক্ষণশীল কৌতুকলেখক জে, পি, মারকোয়াণ্ড দেখিয়েছেন অতীত জীবনের মান অনুযায়ী যাঁরা জীবনধারণ করেন অথবা যাঁরা অর্থের দিকে চেয়ে থাকেন, তাঁদের দ্বারা কি করে মানুষের শক্তির অপচয় হতে পারে। তবুও তাঁর সুরে আন্তরিকতা আর সহানুভূতি আছে, বিরক্তি অথবা আশাহীনতা নেই।

রবার্ট পেন ওয়ারেন মানুষের, বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের জীবন সম্পর্কে যে চিত্র এঁকেছেন, তার মধ্যে প্রকৃত দুঃখবোধের ছাপ দিতে সক্ষম হয়েছেন। তার মধ্যে সদিচ্ছা কি করে কুফলে পরিণত হয় তা-ও আছে। 'কু' থেকে কি করে 'সু'-তে পরিণত হয় নিয়তির সে পরিহাস তিনি দেখেছেন 'অল

'দি কিংস মেন'-এ উইলী স্টার্কচার-এর ব্যাখ্যাতে। মানুষ এখনও ন্যায়বিচারের দিকে চেয়ে আছে, যদিও এই বোধটুকু লুণ্ঠিত হচ্ছে অথবা নিজেরাই সত্যভ্রষ্ট হচ্ছে। এখানেই মানুষের আশা।

জেমস গোল্ড কজেন্স অনেক বিষয় নিয়ে লিখেছেন, তবুও সব সময়েই দেখেছেন মানুষ আত্মিক মূল্যবোধের কাঠামোর মধ্যে সংগ্রাম করছে, তার মূল সমস্যা হল 'কু' থেকে 'সু'-কে পৃথক করে জানার প্রয়াস আর উপযুক্তকে কি করে বাছাই করা যায় তার পথ নির্ধারণ করা। এই বইগুলো 'কু'র মুখোমুখী হয়েছে কিন্তু তার মধ্যে নিমজ্জিত হয়নি।

এডনা ফারবার, জিরাল্ড ওয়ারনার ব্রেস এবং হ্যামিল্টন ব্যাসো যাঁরা কু-র আবর্তে পড়েছেন, তাঁদের দলে পড়েন। এঁরা সাধারণ জীবন নতুন করে সৃষ্টি করা এবং ব্যক্তি ও সমাজের ঘাত-প্রতিঘাতেই বেশী আগ্রহশীল।

অন্যান্য বহু প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন লেখকদের নামের তালিকা থেকে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা উচিত হবে মনে হয় না। তবুও, নেলসন অ্যালগ্রেন এবং সল বেলো সম্ভবতঃ অত্যন্ত সাধারণ এবং স্বাভাবিক পর্যায়ের নীচেকার মানুষের প্রতি আগ্রহ এবং পাঠকের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করে নতুন চরিত্র সৃষ্টির দক্ষতার জন্য, উল্লেখ দাবী করতে পারেন।

এদেশ তার ইতিহাসের জন্য গর্বিত এবং সর্বদাই অতীতকে নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে কারণ এ-অতীত একেবারেই সাম্প্রতিক। 'এখানে তাই ঐতিহাসিক উপন্যাস সর্বদাই জনপ্রিয়। এই ক্ষেত্রে অনেক দক্ষ গল্প লেখকদের মধ্যে কেনেথ রবার্টস, স্যামুয়েল শেলাবার্গার, টমাস বি. কস্টিন, ব্রুস ল্যানকাস্টার এবং ভ্যান ওয়াইক ম্যাসন একটি প্রতিনিধিমূলক তালিকা।

যে উপন্যাসগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ নতুন করে জন্মলাভ করেছে তার মুখ্য ভিত্তি ডন প্যাসোসের লেখার ষ্টাইল। কারণ উপন্যাসগুলোতে সামূহিক যুদ্ধ নায়কদের প্রতিভাত করা ব্যাপারে তাঁর টেকনিকের প্রয়োজন; আর প্রয়োজন স্কট ফিটজেরাল্ডের লেখা—তাঁর মুড-এর জন্যে; স্টাইনবেকের লেখার বৈশিষ্ট তাঁর হিউমার, হেমিংওয়ে তাঁর সংলাপ আর ঘটনাসৃষ্টির জন্য বিখ্যাত। *দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁরা এমন কোন স্কোয়াড বা প্লেটুন বেছে নিয়েছেন যাতে নানান জাতের লোক আছে। সংস্কার বাধা সৃষ্টি করেছে, কিন্তু সঙ্কট মুহূর্তে দেখা গেছে ঘৃণিত জাতের

* এই সব মন্তব্য এবং নতুন উপন্যাস সম্পর্কে অন্যান্য মন্তব্য ম্যালকম কউলে'র 'দি লিটারারি সিটুয়েশনে' পাওয়া যাবে।

লোকটিই নায়কের ভূমিকা পেয়েছেন। অসহিষ্ণু যারা তারা হয় নিহত হয়েছে, নয়তো তাদের মত পালটে ফেলেছে এবং গোলাগুলির মধ্যে দলের সদস্যরা সকলকে নিজেদের আপন ভাই বলে মনে করেছে। সংস্কারের সঙ্গে থাকে অফিসার এবং ফেলে আসা প্রিয়াদের মধ্যে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাদের প্রতি ঘৃণা। সামরিক শৃঙ্খলাকে ভাল চোখে না দেখলেও, যুদ্ধকে ওরা অনিবার্য হিসেবেই মেনে নেয় এবং যেমন করে হোক নতুন ধরণে জীবনযাপন পদ্ধতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়। তবুও তারা যে যুদ্ধ করে তার মধ্যে থাকে না কোন রকমের কর্তব্যবোধ অথবা আদর্শ। সকলেরই আশা, বাড়ী ফিরে যুদ্ধ বিভীষিকা ওদের গার্হস্থ জীবনে কিছুটা বৈচিত্র্য আনার। আশার কথা এই যে, এই বইগুলো ভাল ভাল মানুষে ভর্তি—সাধারণ মানুষ, সঙ্কটকালে যাদের বীরত্ব তাদের নির্যাতিতের পাশে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করে।

স্কুল, চার্চ, চাকরী, ক্লাব, বলখেলা, প্যারেড, স্কোয়ার নৃত্য, অর্থ-নৈতিক উত্থান-পতন, রাস্তার দু'ধারের নিরানন্দ পরিবারের কাহিনী ও আনন্দের ঘরকন্না, বড় দিনের সময়কার রাস্তার রঙীন আলো, হাস্যকর গর্ব ও সরল আন্তরিকতা, অগ্নিকাণ্ড অথবা বন্যার সময়ে সেবা, ছোটর বীরত্ব ও বড়র নীচতা, নিজস্ব অনুভূতি এবং তরুণদের মনে নিরাপত্তা অথবা ভয়ের ভাব জাগান—এই সব ঘিরে ছোট ছোট সহরের যে জীবনযাত্রা তার কাহিনী এখনও কেউ লেখেন নি।

এই পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার জন্যে, আমেরিকান লেখকেরা পাঠকগোষ্ঠী কোন বিশেষ সুরে বাধা থাকবে, এমন ভাবতে পারেন না। বরং (মার্গারেট মীড ঠিকই বলেছেন) তাঁদের নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবনের উপর নির্ভর করতে হয়, যার বিভিন্ন তাৎপর্য আছে। সম্ভবতঃ এজন্যেই তাঁরা বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গের (স্যাটায়ার বা ক্যারিকেচারের) দিকে ঝুঁকেছেন এবং এমন অস্বাভাবিক কিছুকে বর্ণনা করতে প্রয়াস পেয়েছেন; যার ইঙ্গিতগুলো সহজেই বোধগম্য হয়।

আমাদের কবিতা যে বৃহত্তর জনসংখ্যার জন্যে না হয়ে, শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবির বুদ্ধিমত্তার কসরতে পরিণত হয়েছে, এ তার একটা কারণ। চল্লিশ বছর আগে যে মহান গোষ্ঠী কবিতার পুনর্জন্ম ঘটিয়েছিলেন, তার মধ্যে শুধুমাত্র রবার্ট ফ্রস্টের আবেদনই এখনও সার্বজনীন। সে কবিতায় মাটির সংযোগ এত স্পষ্ট যে, সবাই তার ভক্ত আর বুঝতেও পারে। তবুও অনেক ভাল ভাল কবি এখনও শুধু তাদের জন্যেই লেখেন, যাদের শুনবার মত মন আছে।

এঁদের কেউ কেউ তরুণ। আবার কেউ কেউ ততটা তারুণ্যের সীমা অতিক্রম করেছেন।

পাঠকগোষ্ঠী ক্রমশঃ গল্পের সৃষ্টিতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন। ছুনিয়া যে করেই হোক ক্রমশঃ এত জটিল হয়ে উঠছে যে, তাকে জানবার আর বুঝবার জন্যে আবিষ্কৃত নতুন নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা এঁটে উঠতে পারছে না। পাঠকগোষ্ঠী এই জটিল ছুনিয়াকে বুঝতে চায়! জাতির চরমতম অভিজ্ঞতা গৃহযুদ্ধ সম্পর্কিত বইগুলো তাঁরা গোগ্রাসে পাঠ করে ফেলেছেন। জীবনচরিত, ডেড সী'র আবর্ত থেকে মহাকাশে ভ্রমণ সম্ভাবনা, রাষ্ট্রনেতা ও যুদ্ধ নায়কদের জীবনস্মৃতি, কূট-নীতি বিষয়ক বই এবং আধ্যাত্মিক জীবনের আহ্বান সম্পর্কিত বই এখনও জনপ্রিয়। এ সাহিত্যের বৈশিষ্ট হ'ল, তার আন্তর্জাতিক সুর, কারণ আমেরি-কানরা তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে জগতকে জানতে চায়, যে জানার সমস্যা সমাধানের ভার শুধু তাদেরই।

সস্তা সংস্করণের বই, যার মূল্য সিকি ডলার থেকে এক ডলারের কিছু বেশী প্রকাশিত হতেই বই পড়ার হার উর্ধমুখী হয়েছে। অবশেষে মনে হচ্ছে পুস্তকের উচ্চমূল্যের উপযুক্ত একটা জবাব বিজ্ঞান দিতে পেরেছে। কারণ সদ্য প্রকাশিত পুস্তকের মূল্য অন্যান্য জিনিষের ন্যায় বেড়ে যেতে থাকলেও, সাময়িক পত্রের মূল্যে সম্পূর্ণ মুদ্রিত পুস্তক দেশে বইয়ের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে মূল পুস্তকের সস্তা সংস্করণও প্রকাশিত হয়। আগে যেখানে পাঁচ শ'য়ের মত বইয়ের দোকান ছিল, এখন সেখানে পঞ্চাশ হাজার বই বিক্রীর জায়গা হয়েছে। প্রতিটি মনিহারী আর ওষুধের দোকানে বই ভর্তি র‍্যাক ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। গৃহস্তবধূ মুদীর দোকানে গেলেও কয়েকটা বই কিনে নিতে পারেন। ১৯৫৩ সালে ৩০ কোটির অধিক সস্তা বাঁধাইর বই বিক্রী হয়েছে। বই এখন সাময়িক পত্রিকার মতো ফেলে দেওয়া যায়, স্বল্প মূল্য আর সঙ্গে সঙ্গে অচল হয়ে যাবার সামগ্রিক অর্থনীতির সঙ্গে এও মিলে গেছে, তাই লক্ষ মানুষের কাছে এর আবেদন পৌঁছেও গেছে।

অনেক বই-ই অপাঠ্য, ওদের ফ্যাকাসে মলাট দেখেই তা বোঝা যাবে। তবে এদের একটি বিস্ময়কর সংখ্যা হল প্রাচীন ও আধুনিক উচ্চ শ্রেণীর, অথবা নিগূঢ় বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকসমূহ। পূর্বে কখন বুদ্ধির ভাণ্ডার এমনভাবে হাতের নাগালের মধ্যে এসে যায় নি।

এই সস্তা মলাটের বই ছাড়াও সাড়ে এগার কোটি শোভন সংস্করণের এবং

সাড়ে নয় কোটি কিশোর পুস্তক বিক্রী হয়ে ছিল। এর উপরে রয়েছে বিরাট সংখ্যক বাইবেল, এনসাইক্লোপিডিয়া, পাঠ্য ও কারিগরী বিষয়ক পুস্তক, বছরে যার আনুমানিক মোট সংখ্যা ৮০ কোটির মত দাঁড়াবে।

কয়েক লক্ষ সদস্য নিয়ে গঠিত বুকক্লাবগুলো বই বিক্রীর গতি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। থিয়েটারের জন্যে কিছু লেখা সব সময়েই অনিশ্চিত ব্যাপার, ব্রডওয়ে প্রকাশনীর আর্থিক অবস্থা এতে বাধা দেয়; তবে টেনেসি উইলিয়মস এবং আর্থার মিলারকে আকর্ষণীয় এবং প্রায়শঃই উল্লেখযোগ্য রচয়িতা হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। এদিকে দেশের সর্বত্র যে ছোটখাট থিয়েটার আছে যার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটারও পড়ে, তাতে নতুন পুরাতন সব রকমের বইই অভিনীত হয়। অভিনয়ের স্টাইল, স্টেজ এবং জটিল লেখা ব্যাপারে তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রায়শঃই উত্তেজনাকর। সামার থিয়েটার বিশেষ সংগঠনে পরিণত হয়েছে। গোলাঘর, টাউনহল এবং দর্শক হবার মত ছুটি প্রচুর সংখ্যক লোক থাকলেই বিশেষভাবে নির্মিত থিয়েটারে ব্রডওয়ে শিল্পীদের নৈপুণ্যের সঙ্গে তরুণ আশাবাদীদের মিলন হয়, যার ফলে সেক্সপীয়ের থেকে সর্বাধুনিক ব্যঙ্গ নাটক পর্য্যন্ত অভিনীত হয়।

জাজ

থাইল্যাণ্ডের রাজা যখন পরিপূর্ণ কক্ষে বেণী গুডম্যানের সঙ্গে যোগ দেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে রাজকীয় সম্মান দেন, লণ্ডনের রয়াল ফেষ্টিভাল হলে লুই (স্যাচমো) আর্মস্ট্রং যখন তার রয়াল ফিলহারমনিক অর্কেষ্ট্রাতে তাঁর সানাইতে সুরের তুফান তোলেন, যখন মধ্য প্রাচ্যের শ্রোতারা যাঁরা পূর্বে কখনও জাজ শোনেন নি, তাঁরা ডিজি গিলেসপির বাজনা শুনে উত্তেজনায় দিশেহারা হয়ে যান, তখন এটা সুস্পষ্ট যে সারা দুনিয়া জাজকে সংস্কৃতি সঙ্গীতে নতুন আর উত্তেজনাপূর্ণ অবদান হিসেবেই নিয়েছে। জার্মানীতে জাজ শোনাবার পর সেখানকার শ্রোতাদের সম্পর্কে লুই আর্মস্ট্রং বলেছিলেন, "হাত দিয়ে তালি দিতে দিতে ওঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন এবং শেষে চেয়ার দিয়ে তালি দিতে সুরু করলেন"। পুলিশ অবশেষে ঠাণ্ডা জলের ধারা দিয়ে তাল ভঙ্গ করে দর্শকের চেতনা ফিরিয়ে আনল।

গিলেসপি আর তাঁর দল যখন এথেন্স পৌঁছান তখন সেখানে জোর মার্কিন

বিরোধী মনোভাব চলছে। কিন্তু যে ছাত্রের দল মার্কিন দূতাবাসে প্রস্তর নিক্ষেপ করেছিল, তারাই অর্কেষ্ট্রা শুনতে এল এবং থেকে গেল, অবশেষে গলিতে শান্তি রক্ষার্থে নিয়োজিত পুলিশের সঙ্গে নাচতে সুরু করল। কাঁধে করে গিলেসপীকে তারা বাড়ী নিয়ে গেল।

জাজের জন্মভূমি যুক্তরাষ্ট্র, এখানেই লালিত হয়েছে। এর গ্রাম্য উৎস নিখুঁতভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। আর্টের সমস্তটা জুরেই এর রাজত্ব। যে দুইটি মহান সঙ্গীত ঐতিহ্য এর মধ্যে মিলিত হয়েছে, তা হল ইউরোপীয় ও পশ্চিম আফ্রিকার সঙ্গীত সংস্কৃতি। মাঠের কাজে আর কঠিন শ্রমের একঘেয়েমী দূর করে কাজের উৎসাহদনের জন্যে এই সুর ও ছন্দের সৃষ্টি, অবশ্য এ মুখ্যতঃ নিগ্রোদের দান, পরে শেতাঙ্গরা কিছু ঘষামাজা করেছেন। অথবা, আরও সঠিক বলতে চাইলে, মিলমিশের পথেই এর জন্ম। নিউ অর্লিয়েন্স-এএর শ্রীবৃদ্ধি এবং সেখানে ক্রেওলস (যার ধমনীতে ফরাসী ও স্প্যানিশ রক্ত ছিল) দুটো সাংস্কৃতিক ধারাকে একই স্রোতে মিলিত করেন।

নিগ্রোদের সঙ্গে যদি প্রথম থেকেই মিলেমিশে যাওয়া হত অথবা তাদের সম্পূর্ণভাবে পৃথক করে রাখা হত, জাজ কখনই জন্ম নিত না। একটি সমাজের অনন্যসাধারণ অবস্থা থেকেই এর উদ্ভব যা নিগ্রোদের শ্রেষ্ঠ গুণের সমাদর করে, কিন্তু খৃষ্টীয় ও গণতান্ত্রিক নীতির কথা মুখে বললেও তার উপর সম্পূর্ণ আস্থা না থাকতে নিগ্রোরা সমাজে উপযুক্ত মর্য্যাদা পেত না! তবুও গল্পের সেই ভীতু খরগোসের ন্যায় নিগ্রোরা সকলের অজান্তে তাদের অধিক শক্তিশালী ভাইদের হারিয়ে দিয়েছে, কারণ তাদের সঙ্গীত বাইরের দুনিয়ায় সর্বত্রই প্রায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্টের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অবদান হিসেবে পরিগণিত হয়।

নিয়ত বিবর্তনের মধ্যে এগিয়ে গিয়েছে জাজ। যে সমাজের অংশ, তারই রূপ-নিয়ে জাজ পাল্টাচ্ছে, নতুন নতুন ছন্দ ও সুর আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে নতুন করে বেঁধে নিচ্ছে। সুর বা ছন্দ সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বার এখানে সর্বদাই উন্মুক্ত। যাঁরা আগে কখন শোনেন নি, এমন কি তাদের উপরেও জাজ এত প্রভাব বিস্তার করে কেন? কারণ, হামবুর্গ-এর হট ক্লাবের প্রেসিডেন্ট বলেছেন, 'পূর্ণকক্ষ এক একটা অধিবেশন যেন ছোটখাট এক একটি গণতন্ত্র। সব কটা যন্ত্রই সমান শক্তিশালী এবং নিজস্ব বৈশিষ্টের উপর দাঁড়িয়ে আছে। যা সবাইকে বেধে রেখেছে তা হল সহিষ্ণুতা আর অপর বাদকদের সম্পর্কে বিবেচনা'।

এমন কি শিক্ষানবীশও সঙ্গে সঙ্গে এর স্বতঃস্ফূর্ত দক্ষতার ব্যক্তিগত সৃজনী প্রতিভা এবং উদ্দীপ্ত দলীয় প্রয়াস, যা লিখিত নোট না থাকলে আর্টের শ্রেষ্ঠ প্রতিফলনে প্রয়োজন, তার উপস্থিতির কথা বুঝতে পারে। দক্ষতা, বিশ্বাস এবং পারস্পরিক সমঝোতার উপরই নির্ভর করে এর সাফল্যলাভ।*

সর্বঘটে বিগুমান মনবিশেষজ্ঞ অন্য কারণ দর্শান। তিনি বলেন যে জাজ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে এক ধরণের প্রতিবাদ এবং নবযৌবন, বুদ্ধিজীবি এবং নিগ্রোদের কাছে এর আবেদন যে অত্যধিক, তার কারণ সমাজ যে ভাবে তাদের অপাঙক্তেয় করে রেখেছে তার ক্ষতিপূরণের প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করে।

কোন এক আর্টের প্রতি যে সংবেদনশীলতা, সহজেই আর একটির দিকে চালিত হয়। পতিতালয়ের নিন্দিত সঙ্গীত জাজ, এমন প্রবাহে পরিণত হতে পারে, যার মধ্য দিয়ে জনসাধারণ আর্টের প্রতি তার দায়িত্বকে মার্জিত করে তুলবে।

কিন্তু জাজ কি? মার্শাল ষ্টীয়ারনস্ একে বলেছেন, "এ হল প্রায় স্বাভাবিক আমেরিকান সঙ্গীত যার বৈশিষ্ট হল আশু সংযোজন, মানুষের কণ্ঠস্বরের স্বাধীন ব্যবহারের প্রকাশবৈচিত্র এবং জটিল ধ্বনিতরঙ্গ। ইউরোপীয় মার্কিন এবং পশ্চিম আফ্রিকার সঙ্গীত ঐতিহ্যের এই মিলমিশ হতে সময় লেগেছে তিনশ' বছর। এর প্রধান উপাদান হল ইউরোপীয় সঙ্গীত, ইউরো-আফ্রিকার সুস্বর এবং আফ্রিকার ধ্বনি তরঙ্গ।"

লোকসঙ্গীতের সঙ্গে জাজকে মিলিয়ে দিলে ভুল হবে। অনেক লোকসঙ্গীতই সহজে ধরা ও মনে রাখা যায়, এর অধিকাংশই নির্দিষ্ট মান অনুসরণ করে এবং তার মধ্যে উদ্দীপনার কিছু থাকে না, তবে এ সঙ্গীতের প্রবাহ নিয়তই প্রবাহিত হচ্ছে।

অন্য সঙ্গীত

জাজের উল্লেখযোগ্য উৎস নিগ্রো আধ্যাত্মিকতা এখনও সৃষ্টি করে চলেছে। সরল আন্তরিকতা, পরম আনন্দ এবং গভীর দুঃখের প্রত্যক্ষ প্রকাশে, আমেরিকার সর্বোচ্চ সঙ্গীত স্তরের অতি নিকটে জাজের স্থান। অন্যান্য লোকসঙ্গীতও বেঁচে আছে আমাদের মাঝে। লীডবেলির শ্রম সঙ্গীত, উডিগাথরী ও সিসকো

* মার্শাল স্টীয়ারনাস-এর উপভোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য 'দি স্টোরি অব জাজ'এর ২৯৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তাঁর কাছে আমি ঋণী।

হাউসটনের আধুনিক ব্যালাড, জন জেকব নাইলস্-এর পুরাতন ইংরেজী ব্যলড জিয়িয়ে রাখার প্রয়াস, কাউবয়, লাম্বার জ্যাক ও রেলরোড সঙ্গীত—এই সব মনে করিয়ে দেয় যে আমাদের দেশ নানান ধরণের সঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে যা বিশ্বের সকল অংশ থেকে আহরিত হলেও নতুন পরিস্থিতিতে নতুম রূপ পেয়েছে।

আমেরিকার সঙ্গীত লেখকরা লোকগাথার এই আর্ট মনে রেখেছেন তাঁদের সঙ্গীত বিষয় অন্বেষণের ব্যাপারে—এই বিষয়ের উপরেই আমেরিকার কনসার্ট মিউজিক দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গীতধাবার অতি প্লাবণ এত ঐশ্বর্যময় আর পর্যাপ্ত হয়েছে যে তার তাৎপর্য শুধুমাত্র অনুমান করাই যায়।

জীবনের অধিকাংশ সময় অবধি অবহেলিত ও অজ্ঞাত থাকলেও চার্লস ইভস (১৮৭৪-১৯৫৪) ধীরে ধীরে উল্লেখযোগ্য রচয়িতা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন। স্কোয়েনবার্গ ও ষ্ট্রাভিনস্কির কিছু নতুনত্বের আভাস তিনি আগেই দিয়ে গেছেন। তাঁর কনকর্ড, মাস্যাচুসেট্স্, ১৮৪০-১৮৬০, থ্রী প্লেসেস্ ইন নিউ ইংল্যাণ্ড, অনেক সঙ্গীত (সংখ্যায় প্রায় ১৫০) এবং কিছু চেম্বার মিউজিক থেকে আমেরিকার সঙ্গীতসম্ভার বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর অনেক লেখার অনুপ্রেরণাই এসেছে পল্লীগাথা থেকে এবং সব সময়েই তাঁকে দেখা গেছে পুনরুদ্দীপক মিলন, নিগ্রো সমাবেশ অথবা কোন নিউ ইংলণ্ড সহর থেকে তিনি গানের সুরসঙ্গতি আনতে চেয়েছেন। এই লোকপ্রিয় উপাদান থাকলেও, ইভস তাঁর সময়ের তুলনায় অনেক এগিয়ে গিয়েছেন তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে, বহু সঙ্গীত, বহু ধ্বনি এবং স্বরবৈষম্যও তাঁর লেখায় প্রকাশ পেয়েছে।

জাজ সঙ্গীতের রচনা বৈশিষ্টের সাহায্য নিয়ে অ্যারন কোপল্যাণ্ড কনসার্ট মিউজিককে নতুন করে জীবন দান করেন। তাঁর 'লিংকন প্রোট্রেট' এবং ব্যালে 'অ্যাপালাসিয়ান। স্পিং' রচনায় আমেরিকান বৈশিষ্টের ছাপ রয়েছে। শেষোক্তটি জনপ্রিয় একটি গাথার ভিত্তিতে রচিত। রেডিও ও সিনেমার জন্যে লিখতে গিয়ে তিনি পল্লীগাথা আর পল্লী অনুভূতির সঙ্গে আধুনিক কনসার্টের ভাষা মিলিয়ে দিয়ে যে দক্ষতা দেখিয়েছেন, তাই তাঁকে বৃহত্তর জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেছে।

রয় হ্যারিস অনেক সঙ্গীত লেখকের মতো ওয়াল্ট হুইটম্যান থেকে প্রেরণা পেয়েছেন। হুইটম্যানের উপরেই ভিত্তি করে রচিত হয়েছে তার সিমফনি ফর দি ভয়েসেস, অন্য দিকে ফোক সং সিমফনি রচিত হয় লোক-গাথার উপর।

আমেরিকান কাহিনীর আর পটভূমির উপর এত সুন্দর সঙ্গীত রচিত হয়েছে যে, এমন কি বিশেষজ্ঞের পক্ষেও সব জানা সম্ভব নয়। আর্থার ফারওয়েল কাহিনীর জন্যে নিগ্রো, রাখাল বালক আর রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে উপাদান খুঁজে বেড়িয়েছিলেন। ডগলাস মুর রূপকথার উপর ভিত্তি করে অপরূপ ছোট ছোট গীতিকাব্য লিখেছিলেন। গাঁয়ের লোকনৃত্য সঙ্গীত বাজনা, নাচের হল আর সার্কাসে, তাঁর সজীব ছন্দ, উজ্জ্বল হাস্যরস ও পট পরিবর্ত্তনের উপাদান খুঁজে পেয়েছিলেন। জন অ্যালডেন কার্পেণ্টার-এর প্রেরণার উৎস ছিল জাজ। গ্রাম্য রসিকতা, এবং যান্ত্রিক শব্দ, কুকুরের চীৎকার, পেরেক পেটানোর শব্দ, প্রভৃতি সহরের নানাপ্রকার শব্দধ্বনিকে তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন। মেরী হোয়ে অর্কেষ্ট্রা আর কোরাসের জন্যে উত্তেজনাকর একটা চেন সমবেত সঙ্গীত লিখেছিলেন আর এমন যন্ত্রসঙ্গীত কল্পনা করেছিলেন যার মধ্যে আধুনিক ও অনাদিকালের টেকনিক একত্রিত হয়েছিল। ভাজিল টমসনের কৃতিত্ব কয়েকটি চলচ্চিত্রের জন্য, যেমন 'দি রিভার' এবং 'দি প্লাউ যাট ব্রোক দি প্লেনস' যা তাঁর সঙ্গীতকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়।

সঙ্গীত ধর্মী কৃষ্টি

১৯৫৫ সালে সাড়ে তিন লক্ষের অধিক নরনারী পয়সা দিয়ে গুরুগম্ভীর কনসার্ট শুনেছেন ; অন্য দিকে বেসবলের প্রথম ডিভিসন লীগের খেলা দেখার জন্য মোট দেড় লক্ষ লোক পয়সা দিয়ে টিকিট কিনেছেন। বাকী পৃথিবীর সকলে মিলে সঙ্গীতের জন্যে যা ব্যয় করে, আমেরিকার সঙ্গীত বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ তার চেয়ে অধিক।

পাবলিক লাইব্রেরী, যারা লাইব্রেরীতে গান শুনতে চান, তাদের জন্য গান শোনার বুথ খুলেছেন এবং যাঁরা চান বইয়ের মত তাঁদের রেকর্ড ও ধার দেওয়া হয়। অনেক রেডিও ষ্টেশনের বৈশিষ্টই হল সঙ্গীত এবং সেখানে সারাদিন রাগ প্রধান, লঘুরাগপ্রধান, আধুনিক এবং জনপ্রিয় সঙ্গীত বাজিয়ে যাওয়া হয়। লং প্লেয়িং রেকর্ড চালু হবার পর থেকেই রেকর্ড ক্লাব গড়ে উঠেছে এবং বুক ক্লাবের মতোই সেসব জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। লক্ষ লক্ষ সঙ্গীত রসিক যাঁদের সঙ্গীত শিখবার সুযোগ হয় নি তাঁরাও ভিভালদি, বাচ্, মোজার্ট ও সিম্ফনি অর্কেষ্ট্রা থেকে বহু দূরের সহরে থেকে সমাদর করতে শিখেছেন। মেট্রোপলিটান অপেরার

শনিবারের বেতার প্রচার জাতীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যার শ্রোতার সংখ্যা দুই কোটি হবে।

সঙ্গীত শুধু শোনাই হয় না, গাওয়াও হয় এবং আগে যাঁরা গাইতেন, এখনকার গায়কদের সংখ্যা তার তুলনায় অনেক বেশী। দশ লক্ষের অধিক আমেরিকান এখন একর্ডিয়ান বাজান এবং সমসংখ্যক ব্যক্তি গীটারও বাজান। ছোট ছোট সহরে চার্চ সঙ্গীতময় জীবনের চিরকালের কেন্দ্র। স্কুল কার্যসূচীর মধ্যেও সঙ্গীত এসে গেছে। কিণ্ডারগার্ডেনের রিদম গ্রূপ থেকে হাই স্কুলের বিস্ময়করভাবে সুশিক্ষিত কোরাল ও সিমফনি গ্রূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেই পর্যায়ে পৌঁছেছে, যে পর্যায়ে প্লেটো তাঁর আদর্শ রিপাবলিকে সঙ্গীতকে নিয়ে যেতে চেয়েছে—যৌবনকে বিকশিত করবার একটা শ্রেষ্ঠ পথ হিসাবে তিনি সঙ্গীতকে মেনে নিয়েছিলেন।

অন্যান্য সব কিছুর মত সঙ্গীতশিক্ষার ক্ষেত্রেও সরকারী নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষা স্বেচ্ছাসংগঠনসমূহই বেশী কাজ করেছে। দেশব্যাপী হাজার হাজার সঙ্গীত-সংগঠন গড়ে উঠেছে গাইবার অথবা অভিনয় করবার জন্যে। অধিক খ্যাতনামা গোষ্ঠীর মধ্যে আছে পেনসিলভানিয়ার বেথেলহেম-এর বাচ্ ফেষ্টিভাল এবং লিণ্ডেসবার্গ-এ যে দলটি ফী বছরে মেশিয়া অভিনয় করে, কানসাস-এর অ্যামেচার অভিনেতাগণ, বিশেষজ্ঞের পরিচালনাধীনে যারা অভিনয় করে পেশাদরী বাহাদুরী বজায় রাখে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও সঙ্গীতকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রী-দের কাছ থেকে প্রায়শঃই সঙ্গীত সম্পর্কে কিছু জ্ঞান দাবী করা হয়। তাদের কনসার্ট, আধুনিক ও ক্লাসিকাল সঙ্গীত শিখ্‌তে হয়। পাঠ্যসূচীর মধ্যে সঙ্গীত রচনা ও গান গাওয়াও স্থান পেয়েছে।

গ্রীষ্ম আসতেই চারিদিকে সুরু হয় সঙ্গীত মুখর শিবির, সম্মেলন আর সঙ্গীত শিক্ষার স্কুল। এখানে অ্যামেচারের দল তাদের সুরকারদের সঙ্গে নতুন কিছু পরিবেশন করে। গ্রীষ্ম শিবির সংগঠিত হয়, সঙ্গীতের দিকে দৃষ্টি রেখে এবং কিশোর-কিশোরীরা সঙ্গীত, সংকীর্তন এবং যন্ত্র সঙ্গীতে বিস্ময়কর কৃতিত্ব দেখায়। গ্রাম্য পরিবেশে তারাভরা আকাশের নীচে বষ্টন সিমফনির মত বিখ্যাত অর্কেষ্ট্রা যখন বেজে ওঠে, তখন বিরাট খোলা প্রাঙ্গণ ছড়িয়ে প্রশস্ততর মাঠ জুড়ে হাজার হাজার শ্রোতা নীরবে সঙ্গীতসুধা পান করে।

ধরুন আপনি যদি একমাত্র সঙ্গীতশিল্পী হন যিনি বেহালা অথবা কাঠের

সানাই (ওবই) বাজিয়ে থাকেন, মিউজিক আনলিমিটেড থেকে আপনার অংশটুকু বাদ দিয়ে, বাকী রেকর্ডিংগুলো কিনে ফেলতে পারেন। এভাবে আপনি কোন পেশাদার সিমফনি দলের একমাত্র বাদক হতে পারেন!

ইউরোপের উপর আর নির্ভরশীল নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন নিজেই তার সঙ্গীতশিল্পীদের শিক্ষা দেয়। যে কোন চারজন পেশাদার শিল্পীর মধ্যে এখন তিনজনই আমেরিকান এবং সকলেই স্বীকার করবেন যে তাঁদের সঙ্গীতও উঁচু-দরের। ইউরোপের ন্যায়, এখানকার সঙ্গীতের বৈশিষ্ট, শ্রেষ্ঠত্বে আগেকার সব কিছুকে পেছনে ফেলে এসেছে। এইসব শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সঙ্গীত পারদর্শিতার সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোন যোগাযোগই প্রায় থাকে না। এজন্য কয়েকজন ম্যানেজারের প্রভাবাধীন প্রথাই দায়ী। আমেরিকান ফেডারেশন অব মিউজিক যে সঙ্গীত, সঙ্গীতের স্বাভাবিক গতিকে প্রতিহত করে, তাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

গান শোনার প্রাবল্য সঙ্গীতকে বাণিজ্যিক রূপ দিতে চলেছে। শ্রোতার দল ভারী হয়ে উঠলে তাদের পছন্দ-অপছন্দের দিকে দৃষ্টি দিতেই হয় এবং শ্রোতার সংখ্যা যত অধিক হয় (অন্ততঃ পক্ষে আমাদের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের এই সময়-টুকুতে) পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ তত কম। এত বড় শ্রোতৃমণ্ডলীকে খুশী করবার প্রয়োজনে সুরকারকে তার নিজের ইচ্ছামত সুরসৃষ্টিতে বাধা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সুরস্রষ্টা পেশাদারীগায়ক, রেডিও ষ্টেশন, বিজ্ঞাপনদাতা অথবা ষ্টুডিওর কাছে গৌন হয়ে পড়েন। অপর দিকে চলতি সঙ্গীতভাণ্ডার সমানভাবে চালু থাকবার জন্যে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং নতুন কিছুর চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

তবুও এখানেও ভারসাম্য রক্ষিত হয়, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বাণিজ্যিক মনোভাব এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত এবং সুরকার সঙ্গীতরসিক ও প্রকৃত সমঝদারদের জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে।

নৃত্য

আর্ট অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমেরিকানরা অকস্মাৎ নতুন করে নৃত্যকেও আবিষ্কার করেছে এবং নতুন চাহিদানুযায়ী খাপ খাইয়ে নিয়েছে। আগেকার দিনে নৃত্য সব সময়েই মার্কিন জাবনের অংশ বিশেষ ছিল। তখন রীল ও স্কোয়ার নৃত্য ভ্রাম্যমানজীবনকে আনন্দ পরিবেশণ করত। পথপ্রদর্শক ইসাডোরা ডানকান-এর উপর ভিত্তি করে রুথ সেণ্ট, ডেনিস ও টেড শ' তাঁদের দলবল

নিয়ে যে নৃত্যের স্বাধীনপদ্ধতি প্রকাশ করেন ও জাতীয় নৃত্য প্রদর্শণ করেন, তা অনেক আমেরিকান দর্শকদের কাছেই পরিবেশিত হয়। এঁদের সৃষ্ট অনেক নৃত্যেরই আধ্যাত্মিক অর্থ ছিল এবং, এমন কি, তাঁরা চার্চেও নৃত্য পরিবেশণ করেন। এঁদের নাচের অনেক বিষয়ই ছিল আমেরিকার অতীত ঐতিহ্য।

অন্যান্য প্রখ্যাতনামা নৃত্যশিল্পীরা—মার্থা গ্রাহাম, ডোরিস হামফ্রে, চার্লস উইডম্যান, জোসে লিমন—মাত্র কয়েকজন নৃত্যবিশারদের নামই করছি—যে আর্ট প্রকাশ করেন, তাতে সঙ্গীতের সঙ্গে আঙ্গিক আর ইঙ্গিত মিশিয়ে শুধু মানুষের মেজাজই নয়, সামাজিক অনাচার, ব্যক্তিগত দুঃখবোধ অথবা জয়ের আনন্দ এবং প্রকৃতির দৃশ্য ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

ইতিমধ্যে একদা ইউরোপের কায়েমী স্বার্থ হিসেবে গণ্য ব্যালে, কয়েকটি খ্যাতনামা আমেরিকান কোম্পানী গঠিত হতেই এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে খাপখেয়ে যায়। সঙ্গীতমুখর মিলনান্তক নাটকের উপযোগী উপভোগ্য নৃত্য উদ্ভাবনে পথ দেখান আগনেস দ্য মিলি। তিনি ব্যালে, আধুনিক নৃত্য এবং ওকলহোমা'র লোকনৃত্য পরিবেশণ করতেন, আস্তে আস্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যালেনৃত্য বেশ খাপখেয়ে যায়। নৃত্য আর অলঙ্কারের পর্যায়ে থাকে না, সমগ্র নাট্যদুনিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। ফ্রেড আসটেয়ার আর জেনি কেলির দক্ষ নাচে সমৃদ্ধ মার্কিন চলচ্চিত্রেও এই নৃত্য বিশিষ্ট কার্যক্রম হিসেবে গ্রহণ করা হয়। 'সেভেন ব্রাইডস ফর সেভেন ব্রাদার্স'-এ ঘটনা আর চরিত্র-সৃষ্টি নাট্যের সঙ্গে নৃত্যের এমন এক অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ যে দর্শকেরা ভুলেই যান তাঁরা বিশেষভাবে কেবল নৃত্যই উপভোগ করছেন এবং এই হল নৃত্যজগতের শ্রেষ্ঠ অভিনন্দন।

কেরিওগ্রাফি এখন টেলিভিশনের অধিক উল্লেখযোগ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। টেলিভিশনে শ্রেষ্ঠ তরুণ নৃত্যশিল্পীরা আসছেন। এঁদের এবং অনুকরণীয় ইভা কিচেল-এর (যিনি নাচ নিয়েই কৌতুক করেন তাঁর ওরণা আর আবরণের আড়ালে থেকে) নৃত্যের সুরে হাস্যরসের ন্যায় করুণ রসও থাকতে পারে।

নৃত্যশিক্ষায় পথ প্রদর্শকের অধিক কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন মারথা হিল ও মার্গারেট এইচ' ডোবলার। তাঁরা নৃত্যশিক্ষার্থীদের যেমন, দর্শকদের তেমনি নৃত্য উপভোগ করার শিক্ষা দেয়। শিক্ষকমহলের সমর্থনই তাঁদের শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছে।

চিত্রাঙ্কণ ও ভাস্কর্য

মার্কিন চিত্রাঙ্কন সম্পর্কে যে কোন নিরপেক্ষ অভিমতই একথা স্বীকার করবে যে, এই দেশের সাধনা একমাত্র ফ্রান্স ব্যতীত অন্য যে কোন দেশের সঙ্গে তুলনীয়। চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে ফ্রান্সই দুনিয়াকে নেতৃত্ব দিয়েছে। মার্কিন চিত্র-শিল্পের মুখ্য মেজাজই হল বাস্তবতাবাদ—অবশ্য এ বাস্তবতাবাদ প্রায়শঃই রোমাঞ্চকর পরিমণ্ডলে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। জর্জ ইনেস ও টমাস ইয়েকিনস-এর মত প্রাকৃতিক দৃশ্য চিত্রকর, উন্মুক্ত সমুদ্রের শিল্পী উইনস্লো হোমার ও তাঁর পরবর্তী কালের অনুসরণকারীরা, গাঁথা ও অতীন্দ্রিয় সুর আর নিজস্ব বৈশিষ্টে ভাস্বর জেমস এ ম্যাকনীল হুইসলার ও অ্যালবার্ট রাইডার, অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রোট্রেট শিল্পী জন সিঙ্গার সার্জেন্ট (এঁর সঙ্গে চাইল্ড হাসাম এবং মেরী হাসাটের নামও উল্লেখযোগ্য) এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে শিল্পগোষ্ঠী ফরাসী ইমপ্রেসনিস্ট নীতি অনুসরণ করেছেন—এঁরা বর্তমান শতাব্দীর মার্কিন চিত্রশিল্পের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছেন।

রবার্ট হেনরী, জন স্লোয়ান আর জর্জ বেলোজের নেতৃত্বে অন্যান্য শিল্পীদের যে দলটি "দি এইট" নামে খ্যাত হন, তাঁদের জোরদার আন্দোলন ছিল কেতাবী চিত্র আর ইউরোপীয় প্রভাব মুক্ত বিষয় ও পদ্ধতির নির্বাচনে অবাধ স্বাধীনতা লাভের। বাস্তবতার দিক থেকে মার্কিন দৃষ্টিপটের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন এঁরা। এর থেকেই উদ্ভব হয় "অ্যাশ ক্যান স্কুল", যার সদস্যরা বাস্তবজগতে যা দেখেছেন তাকে ছবির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে কখনও ভয় পান নি।

আধুনিক চিত্রশিল্পের সঙ্কটকাল হল ১৯১৩ সাল। এই সময়ে নিউইয়র্ক-এর 'আরমারি শো' প্রদর্শনী। ফ্রান্সের চিত্রশিল্পীরা কি করছেন আমেরিকায় তার ইঙ্গিত বয়ে আনে। তারপর থেকে আমাদের মধ্যে আধুনিকধর্মী আন্দোলন জোরদার হয়েছে। জন্ম নিয়েছে ফবিজম, কিউবিজম, এক্সপ্রেশনইজম, ডাডা, সাররিয়েলইজম প্রভৃতি। সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হল শিল্পী পৃথিবীর দিকে তাকানোর সেই আধুনিক মনোভাব গ্রহণ করেন, যাতে মনে হবে সব-কিছুই বুঝি নতুন (প্রকৃত পক্ষে এ মনোভাব অবশ্য সেকালেরই)। আর চিরাচরিত বাধামুক্ত হয়ে অন্তরের নির্দেশে চিত্রাঙ্কন শুরু করেন। 'আরমারি শো' শিল্প নক্সায়, বস্ত্রে, আভ্যন্তরীন সাজসজ্জা এবং এমন কি প্লাম্বিং ও হার্ডওয়ারেও

বিপ্লব ঘটায়। সাধারণ শিল্পরসিকেরাও 'নিউ আর্ট' সংগ্রহ করতে থাকেন, যার অনেক কিছুই পরে মিউজিয়মে স্থান পায়।

বিমূর্তনের (abstraction) প্রথম ভক্ত হলেন ম্যাক্স ওয়েবার, চার্লস ডেমাথ, জন মারন, ষ্টুয়ার্ট ডেভিস এবং আরসাইল গোর্কী। শেষ পর্য্যন্ত এই আর্টিষ্টদের অঙ্কিত চিত্র থেকেই সৃষ্টি হয় আমেরিকান অ্যাবসট্রাক্ট ইনপ্রেশন-ইজম গোষ্ঠী। চল্লিশ দশকে এর নেতা ছিলেন জ্যাকসন পোলক, রবার্ট মাদারওয়েল, উইলিয়ম বাজিওটস এবং মার্ক রোথকো। বস্তু নয়, সৃষ্টিই ছিল তাঁদের চিত্রের বিষয়বস্তু। ১৯৪৮ সালে জ্যাকসন পোলক যখন আঁকার সরঞ্জাম মেজেয় বিছিয়ে আস্তে আস্তে রঙ বুলোচ্ছিলেন, তখন তাঁর প্রয়াস চরম সাফল্য অর্জন করেছে, একেই বলা হয় 'সৃষ্টির বিস্ফোরক গতি'।

বর্তমানের বিমূর্তনবাদী কয়েক জনেরই নাম করা যেতে পারে—উইলেম ডু কুনিং যাঁর বিরাট ক্যানভাস কৌতুকচিত্রে উজ্জল হয়ে উঠত, মার্ক টোবে যার ক্যালিগ্রাফিক চিত্রে প্রাচ্যের প্রভাব আছে, ক্লিফোর্ড স্টিলের মানচিত্রের মত রঙের তুলি, বোনোন ফ্রাঞ্জ ক্লাইনের সাদা-কালো রেখার মাধ্যমে চিত্রাঙ্কন যা জাপানে সমাদৃত হয়েছে। রঙ এবং তুলি স্বাধীন গতির উপর অধিক গুরুত্বদান এই গোষ্ঠীর সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট।

এই আধুনিকতাবাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মার্কিন কাহিনীর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বাস্তববাদের সাবেকী ঐতিহ্য। এর মুখ্য মুখপাত্র হলেন ওহিও'র চার্ল'স. ই. বার্চফীল্ড, মিসৌরির টমাস হার্ট বেনটন, কানসাসের জন. ষ্টিউয়ার্ট কারী আর আইওয়ার গ্রান্ট উড। এডওয়ার্ড হপারের গভীর অনুরাগ ছিল তাঁর সম্মুখের সাধারণ দৃশ্যের উপর। চলমান দৃশ্যকে অনন্তকালের রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। বিমূর্তনবাদী না হলেও অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটিহীন প্রশস্থ আর রঙীন অঞ্চলের দিকে অধিক দৃষ্টি দেওয়ায়, বিমূর্তন ও প্রকাশনের (অ্যাবসট্রাকসন ও রিপ্রেসেনটেসান) মাঝে আশার সেতু গড়ে তুলতে পেরেছেন।

অন্যান্যদের মধ্যে যারা কয়েকটি বাস্তববাদী দৃশ্যের সঙ্গে গতানুগতিক দৃশ্যাঙ্কনের মিলন ঘটিয়েছেন, তাদের মধ্যে আছেন জর্জিয়া ও' কীফি, চার্ল'স শীলার, পীটার ব্লুম এবং জন আর্থারটন।

সাধারণ কোন আমেরিকানকে, কোন আর্টিষ্টকে তাঁর পছন্দ প্রশ্ন করলে, তিনি সম্ভবতঃ নরম্যান রকওয়েলের নামই প্রথম করবেন। তাঁর নাম বিখ্যাত

আর্টিষ্টের তালিকাভুক্ত হবে না, তবে তাঁর টেক্‌নিক এবং ফটোগ্রাফিক ষ্টাইল আর কৌতুকপ্রিয় এবং আবেগমধুর নাট্যানুরাগ. যারা আর্ট বলতে গল্প বলা বোঝেন, তাদের কাছে প্রিয় করে তুলেছে।

গত কুড়ি বছরে সর্বস্তরে আর্টের প্রতি প্রচণ্ড অনুরাগ দেখা যাচ্ছে। অর্থ নৈতিক মন্দার সময়টুকু আর্টকে সম্মানের আসনে বসিয়েছে, তখন জানা গেছে যে, বেকার আর্টিষ্টদের সরকারের উপর ততটুকু দাবীই আছে যতটুকু বেকার ট্রাক ড্রাইভারদের আছে। প্রাচীরগাত্রে তাঁরা যে চিত্র এঁকেছেন, আর্টের প্রতি জনগণকে তা আকৃষ্ট করেছে, অপরদিকে 'ইনডেক্স অব আমেরিকান ডিজাইন'-এ লোকশিল্পের সুন্দর চিত্রগুলোতে অতীত সংস্কৃতির প্রতি আমাদের যে আগ্রহ ছিল তা ফুটিয়ে তুলেছে ; আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করেছে। কতকটা ভার্জিনিয়া এবং উইলিয়ামসবার্গ কলোনীর পুনর্গঠনের মাধ্যমে। ডবলু পি, এ, এবং ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের চিত্র ও ভাস্কর্য্য বিভাগের (ফেডারেল ভবনগুলির গঠন শিল্প নিয়ে যা কাজ করে) মাধ্যমে মার্কিন সরকার নিজেকে বিশ্বের অন্যতম শিল্পরসিকে পরিণত করেছেন। যাদুঘরের পর যাদুঘর, বিশেষ করে, নিউ ইয়র্কের 'মিউজিয়ম অব মডার্ণ আর্ট' সমসাময়িক চিত্রসৃষ্টি সংরক্ষণের জন্যে আত্মনিয়োগ করেছে। এমন কি, ছোটখাট, গরীব সমাজও চাঁদা তুলে সমাজের সকলকে দেখানোর জন্যে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে এবং সেখানে সবাই মিলে সব ছবি এনেছে। 'ভার্জিনিয়া মিউজিয়ম অব ফাইন আর্টস' সর্বপ্রথম রাষ্ট্রব্যাপী আর্ট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। ভ্রাম্যমান মোটরগাড়ী এই প্রদর্শনী দূর দূর অঞ্চলে নিয়ে গিয়েছে। দেশের সর্বত্র ছোট বড় যে সব যাদুঘর আছে সেখানে আর্ট নবজীবনলাভ করেছে। বালকবালিকাদের সেখানে যেতে বলা হয়েছে এবং সেগুলোকে অনুকরণ করে আঁকা অথবা নিজেদের আঁকা ছবি দিতে বলা হয়েছে। বড়রা মাটির বাসনকোসন তৈয়ার করা ও তাঁত শিল্পে যোগ দিতে পেরেছে অথবা শিল্প শিক্ষায় যোগ দিয়েছে। পাঁচ লক্ষ লোক এখন অয়েল পেন্টিং করেন।

ভাস্কর্য্যও দ্রুত তার পূর্বতন মূর্তি গঠনের বাস্তববাদ থেকে সরে গেছে। মার্কিন বংশোদ্ভূত হলেও জ্যাকব এপস্টীন ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন এবং সেখানে, রুডি ব্লেশ ঠিকই মন্তব্য করেছেন, "তিনি ইংরেজদের ভয় দেখিয়েছেন তাঁর ভাস্কর্য নিয়ে—অবশেষে তারা তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন।*

---

* মডার্ণ আর্ট ইউ এস. এ, ২৫ পৃষ্ঠা।

জনপ্রিয় এবং অলঙ্কারিক ভাস্কর্য শিল্পী পল ম্যানসিপ অনেক শীর্ষ স্থানীয় মূর্তি তৈয়ারী করেছেন। জো-ডেভিডসনের পোট্রেট, ম্যাহনরি ইয়ং-এর শ্রমিক মূর্তি এবং গার্ট্রুড ভ্যাণ্ডার বিল্ট হুইটনে, গুটজন বর্গলাম এবং মালভিনা হফম্যানও উল্লেখযোগ্য ভাস্কর শিল্পের নিদর্শন এবং শিল্পী। কেতাবী সূত্র পরিত্যাগ করবার সৎসাহসে উদ্বুদ্ধ, কাঠ আর পাথরের প্রত্যক্ষ শিল্প রূপদান এবং শারিআলিষ্ট ভাস্করগোষ্ঠীকে খ্যাত করেছেন তার মধ্যে আছেন উইলিয়ম জোরাক, ইসামু নেগুচি, চেইম গ্রস, রবার্ট লরেন্ট, প্রভৃতি। গত বিশ বছরে আর্টিষ্টদের সৃষ্টি এত বেশী হয়েছে যে, কয়েকজনের নাম করা রীতিমত বিপজ্জনক—ন্যায় বিচার করলে শতশত আর্টিষ্টের নাম করতে হয়।

আলেকজাণ্ডার ক্যালডার-এর গতিশীলতা এবং উন্মুক্ত দিগন্তের উপর গুরুত্ব ও বিভিন্ন উপাদান দিয়ে নির্মাণমূলক কাজে কর্মব্যস্ত আর এক শিল্পী-গোষ্ঠীর প্রয়াসের মধ্যে পাওয়া যাবে সর্বাধুনিক দৃষ্টীভঙ্গী। লক্ষ লক্ষ আমেরিকান এই ধরনের আর্টের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে টেলিভিশনের জন্য নির্মিত জেমস আরনেস্ট-এর "প্রোডিউসার্স সো কেস" থেকে।

স্থপত্য

কর্মবাদের (Functionalism) মূল যুক্তি যুক্তরাষ্ট্রে গভীর ছাপ রেখে গেছে। প্রথম নবাগতদের বাড়ীতে তৈরী যন্ত্রপাতি, আসবাব এবং তৈজসপত্রগুলোতে এমন সুন্দর সুন্দর নক্সা থাকত যে, এখনও যাদুঘরগুলোতে তখনকার ঘাসনিরানী, মিশ্রণের প্রয়োজনীয় কাঠের বাটি (মিক্সিং বাউল) এবং ধাতুনির্মিত বাসনপত্র রেখে দেওয়া হয়েছে। নিউ ইংল্যাণ্ডের সাধারণ সল্টবক্স হাউস এবং দেলাওয়ারে সুইডেন থেকে আগতদের কাষ্ঠ নির্মিত ঘর (লগ কেবিন) ছিল সারল্য ও বাস্তবতাবোধ এবং সহজলভ্য উপাদানের শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ।

শিল্পযুগের সুরুতে সেই ১৮৪০ সালে হোরেসিও গ্রীনাফ যথাযোগ্যভাবে কর্মবাদের ব্যাখ্যা করেন। তিনি লিখেছিলেন, "সৌন্দর্য্য বলতে আমি যা বুঝি সে হল কর্মের প্রতিশ্রুতি।" ব্যবহারোপযোগী জাহাজ নির্মাণে, সেতু আর যন্ত্র নির্মাণে তাঁর আদর্শ রূপায়িত হোত ; প্রচলিত আর্টে তাঁর তেমন উৎসাহ ছিল না। তাঁর যুক্তি ছিল, কোন গঠন শিল্পের নির্মাণভিত্তি হবে আয়ত্বাধীন জায়গায় বৈজ্ঞানিক ব্যবহার প্রয়োজনানুসারে পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে

তার গড়ন এবং গঠন স্থিরীকৃত হবে। তাঁর মতে গণতন্ত্র, বিজ্ঞান ও শিল্পই রুচিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর (aesthetic) মানস্বরূপ।

গ্রীনাফ-এর নীতি রূপ পেয়েছে জন রোবলিং এর ব্রুকলিন সেতুর নক্সা আর নির্মাণে! ১৮৬৯ সালে সেতুটির নির্মাণ সুরু হয়েছিল। এখনও একে আদর্শ নির্ণয় হিসেবে গণ্য করা হয়।

কিন্তু এই স্পষ্ট কর্মীজীবনের পূজারী হয়েও ইউরোপের ন্যায় যুক্তরাষ্ট্র মন্থর অলঙ্কারকরণের যুগে প্রবেশ করে। দুর্ভাগ্য বলতে হবে, অধিকাংশ দেশ যখন নিজেকে গড়ে তুলছে এদেশে তখন এই অবস্থা, ফলে আমাদের জীবনে শ্রীহীনতার পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিন্তু চিকাগোগোষ্ঠীর স্থপতিদের কাজের ফলে আমেরিকার গৃহগুলি তার পুরাতন কর্মভিত্তিক জীবনের সঙ্গে যোগ রেখে নির্মিত হয়। এই গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় ছিলেন হেনরী হবসন রিচার্ডসন (১৮৩৮-১৮৮৬) এবং লুই সালিভান (১৮৫৬-১৯২৪)।

অর্থমনোভাবাপন্ন নিউ ইয়র্ক নয়, কৃষি প্রধান সহর শিকাগোতে যে গণতান্ত্রিক চাহিদানুযায়ী ক্রিয়াবাদ বিকশিত হয়েছে, এ কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়। রিচার্ডসন বাড়ীর যে নক্সা আঁকেন তার মধ্যে অবাস্তর অলঙ্কার দিয়ে ধাঁধাঁ সৃষ্টীর প্রয়াস নেই, আছে বাড়ীর ভিতরকার চিত্র। ইস্পাতের ফ্রেম উদ্ভাবন না করলেও সালিভান যে কাঠামো নির্মাণ করেন তা অর্দ্ধ শতাব্দীর আদর্শ হয়ে থাকে। সেন্ট লুইয়ের ওয়েনরাইট বিল্ডিং এবং সেলেসিংগার বিভাগীয় বিপনি-ভবন তাঁর সৃষ্টীর নিদর্শন। সেই ১৮৮০ সালে সালিভান তাঁর সেই বিখ্যাত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন: গঠনপ্রণালী কর্মধারা রূপায়ণে সাহায্য করে এবং কর্মপদ্ধতি গঠনপ্রণালী নির্দ্ধারণ করে। সচেতন সমাজে তিনি এমন স্থপত্য চেয়েছেন যা একাধারে সমাজের চাহিদা মেটাতে এবং প্রগতির বাহন হতে পারে।

সালিভানের শিষ্য ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইট (১৮৬৯) তাঁর নির্মিত গৃহগুলিতে গুরুর আদর্শ অনুসরণ করেন—তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের উপযোগী করে, সমান্তরাল লন সৃষ্টি ক'রে এবং ভিতরবাড়ীকে ঘিরে। বাইরে থেকে বাড়ীটা কেমন দেখাবে তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে রাইট, বাসিন্দাদের চাহিদানুযায়ী বাড়ীর নক্সা তৈরী করেন। আসবাবপত্র ও গৃহসজ্জার পরিকল্পনা বাড়ীর নক্সার সঙ্গে মিলিয়ে করা হয়—সাধারণভাবে তৈরী এবং শান্তি প্রদানকারী—বলিষ্ঠ পদ্ধতিতে পরিকল্পিত ভবনের পক্ষে যা স্বাভাবিক।

পরিকল্পনা, কাঠামো এবং যন্ত্র বিশেষজ্ঞ রাইট 'গাগেন হিম মিউজিয়াম'-এর মতো বিস্ময়কর নতুন নতুন নক্সা অথবা গৃহনির্মাণের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।

কারুশিল্পের প্রাচীন সারল্য ও দক্ষতা হস্ত যা তার বৈশিষ্ট ছিল আবার শিল্প-যুগে চূড়ান্তভাবে সবচেয়ে উপযোগী পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। জনসন ওয়াক্স কোম্পানীর রাইটস্ ল্যাবরেটরী, জেনারেল মোটরস্ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল রীসার্চ সেন্টার অথবা আলবার্ট খান এর ফ্যাক্টরীর মতো বাড়ীগুলো কর্মবাদের সাফল্যের স্বাক্ষর, তার সৌন্দর্য্য ও উপযোগীতার জন্য।

কর্মবাদী আদর্শের পক্ষে লড়াই সর্বপ্রথম জয়যুক্ত হয় শিল্পভবনগুলিতে, তাদের স্কাইস্ক্রেপার আর কারখানার বাড়ীগুলোর নির্মাণপদ্ধতিতে যেখানে সহজ সরল আর সার্থক নক্সাগুলো থেকে অধিক উৎপাদন হয়েছে। তারপর এই আদর্শকে নেওয়া হয় বাড়ী আর স্কুলগৃহে, অবশেষে চার্চ আর লাইব্রেরীতে, যেখানে অতীত ঐতিহ্য পুরাতনের পুণরাবৃত্তির দাবী করাই স্বাভাবিক। বাড়ীতে ব্যবহারোপযোগী জমির বহুধরণের ব্যবহারএখন অপরিহার্য বলেই ধরেই নেওয়া হয়। ছোট ছোট বাক্সের আকারের ঘরগুলো—বৈঠকখানা, শয়ন ও ভোজন কক্ষ—একটি বড় কক্ষে রূপান্তরিত হয়েছে। গৃহস্থবধূ এখন নিজেই তাঁর সকল কাজ করে বলে রন্ধন কক্ষটিকে বড় ঘরের এক অংশ থেকে পৃথক করে নেওয়া হয়।

ইউরোপে যেমন রাইটের প্রভাব আছে, সেইরকম মার্কিন নির্মাণশিল্পেও অনেক ইউরোপীয় স্থপতির প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে এসে রিচার্ড নিউট্রা অ্যানটোনিন রেমণ্ড, মারসেল ব্রিউআর, ওয়ালটার গ্রোপিয়াস ও মাইস ভ্যান দ্য রোহে আন্তর্জাতিক স্কুল স্থাপন করেছেন। মার্কিন মুল্লুকে স্বল্প সময়ের জন্য অবস্থান করলেও, লে কারবাসিয়ায়-এর প্রভাব সারা পৃথিবীর ন্যায় এখানেও পড়েছিল। ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইট (যিনি টোকিওর ইম্পেরিয়াল হোটেলের নক্সা করেন) ও অন্যান্য স্থপতিদের মাধ্যমে জাপানী স্থপত্যের অনেক উপাদানই মার্কিন নক্সাগুলোকে প্রভাবিত করেছে।

এই প্রভাবের সঙ্গে মিশেছে আমাদের কারিগরী অগ্রগতি যার ফলে নতুন আর সস্তা মালমশলা পাওয়া গেছে। এসব দেশের চেহারা পাল্টে দিয়েছে—এখনও পাল্টাচ্ছে। কর্মবাদীদের প্রয়াসকে স্কাইস্কেপারগুলো জাঁকজমকপূর্ণ প্রভাব এনে দেয় দেশের গৃহ ব্যবস্থা উন্নয়ন (এখনও যার গঠনপ্রণালী অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্রী), অবসর বিনোদনের স্থানগুলি এবং দোকানগুলি ঘিরে রয়েছে কিছুটা

বাগান যা নতুন দিনের কথা ঘোষণা করছে। আস্তে আস্তে বাড়ী আর সমাজকে অবসর যাপনের উপযোগী করে পরিকল্পনার দিকে—ঘনিষ্ঠ পারিবারিক জীবন, ক্রমবর্ধমান অবসর বিনোদন, বাড়ীর ভিতর আর বাইরের জমি একীকরণ এবং দলীয় খেলাধুলোর দিকে ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। স্থপত্য শিল্পের নব জাগ-রণের আর দেরী নেই।

জন সংযোগের মাধ্যম

আর্টের প্রকাশ থেকে আমরা এখন প্রকাশের আর্টের দিকে যাচ্ছি। এই দুইয়ের মধ্যে কয়েকটি অস্বস্তিকর সম্পর্কের কথা মনে পড়ছে। জনসংযোগের মাধ্যমগুলি প্রতিটি আর্টের শ্রেষ্ঠত্বকে কাজে লাগায় এবং কখনও কখনও তাঁদের প্রকাশ আর্ট নাম পাবার কৃতিত্ব রাখে। তবে এই মাধ্যমগুলি এমন কিছুও করে যার সঙ্গে আর্টের কোন সম্পর্ক নেই এবং তাদের উদ্দেশ্য সৃষ্টি নয়, মুনাফা।

১৯৫৬ সালে বিজ্ঞাপনদাতারা ব্যয় করেছিলেন দশ বিলিয়ন ডলার। এর অধিকাংশই ব্যয়িত হয় টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র ও সাময়িকীর মাধ্যমে ৬২৬টি সাধারণ সাময়িক পত্র, ১৭০০ দৈনিক সংবাদপত্র ও ৯,০০০ সাপ্তাহিক, ২,৯৪৭ রেডিও ষ্টেশন ও ৪৬৫ টেলিভিশন ষ্টেশন—এই মাধ্যমগুলোকে জিয়িয়ে রেখেছেন বিজ্ঞাপনদাতারা। অনিবার্যভাবেই বিজ্ঞাপনদাতাদের দৃষ্টি বিজ্ঞাপন এবং ঘোষণা পেরিয়ে প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয়ের উপর পরে। বিজ্ঞাপনদাতারা ক্রেতাদের আহ্বান জানান তাদের আনন্দ যুগিয়ে। প্রতিটি সিগারেট ও সাবান প্রস্তুতকারীই সর্বাধিক ব্যবসা চান, প্রত্যেকেই সবচেয়ে জনপ্রিয় রেডিও অথবা টেলিভিশন সূচীর অন্তর্গত থাকতে অথবা সর্বাধিক প্রচারিত সাময়িকীতে বিজ্ঞাপন দিতে চান। সংবাদ ও সাময়িক পত্রগুলোও নিজেদের মধ্যে প্রতি-যোগীতা করছেন। সকলেই অধিক পাঠক পাঠিকা চান।

টেলিভিশন

সবচেয়ে বেশী করে দর্শকদের আকর্ষণ করে কি ?

ক্লেডারমস টেলিভিশনের শ্রোতার সংখ্যা এক কোটি তিরিশ লক্ষ, লা বোহেমে'র দেড় কোটি। ন্যাশান্যাল ব্রডকাস্টিং কোম্পানী পাঁচ লক্ষ ডলার ব্যয় করে লরেন্স অলিভার-এর 'তৃতীয় রিচার্ড' নাটকটি উপহার দিলে, দিনের বেলায় সর্বাধিক দর্শক আকৃষ্ট হয়—পাঁচ কোটি। ইদানীং কালে এক যুগ আগের মনোবৃত্তির সেই পুনরুক্তি সত্বেও, মনে হয় সুযোগ পেলে জনসাধারণ ভাল জিনিষ লুফে নেবে।

এ যে শুধু "ক্রেডারমস" অথবা "রিচার্ড" নয় তা জানবার জন্মে বেশীদিন টেলিভিশন দেখতে হয় না। তবে কি ?

কয়েকদিন পর পর টেলিভিশন দেখলে কয়েকটা জিনিষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটা হচ্ছে এর প্রচণ্ড কল্যাণশক্তি—বিশুদ্ধ অবসর যাপনের আনন্দ প্রদানকারী, ঘনিষ্ঠ দ্রুততা ও প্রত্যক্ষ ও মানবীয় আবেদন, সমগ্র জাতির সাংস্কৃতির উন্নয়নের সম্ভাবনা। নিউ ইয়র্কে অবস্থিত রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তর থেকে সুয়েজ খালে ডুবে যাওয়া জাহাজ, কালিফোনিয়ার অগ্নিকাণ্ড—এমন অনেক কিছুই দেখা যাবে এর মাধ্যমে। টেলিভিশন যে সব প্রখ্যাত ব্যালে নাচের আগে যাঁরা খবর পর্যন্ত রাখত না, তাদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে। টেলিভিশনের পর্দায় রূপায়িত ঘটনাবলী দেখতে দেখতে প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ি, ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে যাই, ক্যামেরার সামনে দেখা মানুষের সঙ্গে আমাদের জড়িয়ে ফেলি, পৃথিবী সম্পর্কে নতুন জ্ঞানের অনুভূতি আমাদের আকৃষ্ট করে, শত রকমে দেখিয়ে দেয় যে সত্যিই দেশ বিদেশে আমরা সবাই এক জাতি।

আর যা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল এই যে, টেলিভিশন সব-কিছুকেই ক্যামেরার পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াস পায়। মনে হয়, ভালমন্দর পার্থক্যটুকুও যেন বোঝে না। স্পষ্টতঃই স্থানীয় ষ্টেশন ও বহু কেন্দ্রের মাধ্যমে মাসের পর মাস প্রতিদিন আঠার ঘণ্টা ধরে যে কার্য্যসূচী চালু থাকে, তা মাঝারী ধরণের হতে বাধ্য। মুস্কিল এই যে প্রধান প্রচেষ্টাগুলোর মধ্য দিয়েও টেলিভিশন এখন পর্য্যন্ত এমন কোন পরীক্ষিত নীতি আবিষ্কার করতে পারেনি যাতে অপূর্ব আর নিম্নশ্রেণীর কার্যসূচীর মধ্যে পার্থক্য করা যায়। অবশ্য থিয়েটারও কয়েক হাজার বছরের অভিনয়ের পরও দর্শকদের মতামতের উপর নির্ভর করা ছাড়া ভালমন্দ বিচারের কোন নির্দ্দিষ্ট মানদণ্ড স্থির করতে পারে নি।

পারিবারিক জীবনের উপর নিয়ত গুরুত্ব দেওয়া টেলিভিশনের আর একটা বিস্ময়কর অবদান। পারিবারিক সমস্যা সর্বত্রই দেখা দেয় প্রতিদ্বন্দ্বীতামূলক মনোভাবসম্পন্ন পরিবারগুলিকে কতবার ছেলেমেয়েদের তাঁরা আদর করে ক্যামেরার সামনে নিয়ে আসেন সে সম্পর্কে সব সময়ে প্রশ্ন করা হয় এবং ঘরোয়া জীবনের হাল্কা দিক, ও সেই সঙ্গে হাসি আর বিবেচনা সকল মুস্কিল আসান করে দেয়—তারুণ্যের বাধাহীন প্রকাশ বারংবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, এই ক্ষুদে শয়তানেরা কত দুষ্ট আর মজার এবং আমাদের নবীন বর্দ্ধিষ্ণু, নিয়মমুক্ত, নাছোড়বান্দা, ভয়ঙ্কর, ব্যয়বহুল, গর্বিত, সদয়, আবেগমধুর

সংস্কৃতির কতটা প্রতীক। আমাদের শিশুপ্রীতি আত্মপ্রীতির মত হতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে এ আত্মশুদ্ধিকরও। টেলিভিশন আমাদের দুর্বলতা জানতে পেরেছে এবং তাকে মূলধন করে ব্যবসা চালাচ্ছে।

আজ যাকে উপহাস করে উড়িয়ে দেয় দুদিন পরে আমেরিকানরা তাকে গ্রহণ করবেই, যেমন একদা তারা ডুক্যাম্পের "নিউড ডিসেণ্ডিং অন এ ষ্টেয়ারকেস"কে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছিল, কিন্তু পরে দুনিয়ার সেরা আধুনিক আর্টের সংগ্রাহক হয়ে ওঠে। এই ভাগ্যবান দেশে অতি সহজে যে হাসি দেখা যায়, তা শিশুসুলভ সারল্যের নয়। কখনও ট্রাজেডির খুব কাছাকাছি থাকে, যেন পাশের কোন রেললাইনের উপর দিয়ে এক্সপ্রেস ট্রেন চেলে যাচ্ছে। এরমধ্যে নিহিত রয়েছে এই গভীর বিশ্বাস যে, সদিচ্ছার দ্বারা বিরোধের মীমাংসা হতে পারে, কোন জিনিষের মুখ্য অংশ তার হাসির অংশটুকু এবং হাসা মানেই জয় করা।

বাইরের দর্শকেরা অভিযোগ করেন, আমাদের মধ্যে জীবনের দুঃখবোধ নেই কথাটা সত্যি। কিন্তু বিয়োগান্ত দৃষ্টিভঙ্গী কি মিলনাত্তক দৃষ্টিভঙ্গীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ? দাসত্ব, বিশেষ অধিকার, পাশবিকতা, শোষন এবং সাধারণ মানুষকে না খাইয়ে যে কৃষ্টি গড়ে ওঠে তার ক্ষেত্রেই দুঃখবোধের যুক্তি আছে। কিন্তু আমেরিকার সংস্কৃতি, তার যত দোষই থাকুন না কেন, ঐ ধরণের নয়। এখানে গুরুত্ব হয়েছে বাস্তবের উপর। এ সংস্কৃতি বিশ্বাস করে যে সার্বজনীন শিক্ষা বৈষয়িক এবং সাংস্কৃতিক উন্নতি আয়াসসাধ্য। স্বাভাবিকভাবেই তাই তামাসার প্রতি এখানে কিছু ঔদার্য আছে, কৌতুকবোধই এখানকার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী।

ভালভাবে আরও যে একটা জিনিষ টেলিভিশন সম্পাদন করে—তা হল নাটক ও তথ্যের মিলন। 'অ্যানড্রিয়া ডোরিয়া' ডুবে যাওয়ার ঘটনাটা দেখান হয়, সত্যিকার ছবি আর নতুন করে তোলা দৃশ্য মিলিয়ে। কারাগার সম্পর্কে পেশাদারদের দিয়ে গৃহীত টেলিপ্লের বৈশিষ্ট্যই হল তার অভিনয়ের স্বাভাবিক পদ্ধতি যাতে সহজেই এই শিক্ষা পাওয়া যায়: ছিন্নমূলদের বিশ্বাস কর এবং তাদের আবার সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকবার অধিকার দাও, যদি অপরাধকে জয় করতে চাও। সাধারণ ক্যারিবিয়ান সমাজে কার্যরত একজন ডাক্তারকে ঘিরে রচিত একটি চিত্র এই কথাই প্রমাণ করে যে প্রতিটি সংস্কৃতিরই নিজস্ব জীবনধারা আর উদ্দেশ্য আছে, আর সকলেই শ্রদ্ধা দাবী করতে পারে।

ছাব্বিশটি শিক্ষাকেন্দ্রই শুধু নয়, অনেক বাণিজিক কেন্দ্র থেকেও সম্ভাব্য সকল রকমের শিক্ষণীয় কার্যসূচী অনুসরণ করে। এই কার্যক্রম দিনের পর

দিনে শুনলে এবং নোট নিলে ঘরে বসে স্বাধীনভাবে নিজেকে শিক্ষিত করে তুলতে পারেন। শিক্ষার উদ্দেশ্যে টেলিভিশনের ব্যবহার এখনও তেমনভাবে সুরু হয়নি। ন্যাশানাল সিটিজেন্‌স কমিটি ফর এডুকেশন্যাল টেলিভিশন যা স্বাভাবিকভাবেই একটি স্বেচ্ছাসংগঠন টেলিভিশনের মান সাধারণভাবে উন্নত করবার জন্যে কাজ করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই পাঁচ কোটি লোক শিক্ষা বিষয়ক টেলিভিশন শুনছে।

দোষ ত্রুটি যাই থাকুক না কেন, টেলিভিশনে অভিনয়, পরিচালনা, গতি প্রযোজনা আর উদ্ভাবনের দিক থেকে সর্বোচ্চস্তরে পৌঁছে গেছে। আর সংযোগ স্থাপনের এ হল সক্রিয় সজীব মাধ্যম। জনসংযোগ স্থাপনের সকল মানুষের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে টেলিভিসন। প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের চিত্র, সাময়িক পত্র আর বই থেকে ঘটনা, রেডিও ষ্টেশনের অভিনেতা—এসবই টেলিভিশনে কাজে লাগে। পরে হলিউডে সব কিছু চিত্রায়িত হয়।

দর্শকের দিক থেকে সবচেয়ে বিরক্তিকর হল অসহনীয় দীর্ঘতা, পুনরুক্তি এবং কখনও কখনও অবমাননাকর বানিজ্যিক মনোভাব। সবচেয়ে বিরক্তিকর হল যৌবন, সৌন্দর্য, সুখ, পারিবারিক আনন্দ এবং খ্রীষ্টীয় নীতিবাদের পবিত্র প্রতীক ক্রয়ের অধিকার—এক প্যাকেট সিগারেট অথবা কোন নতুন সাবান বিক্রির জন্যে!

ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব রেডিও এবং টেলিভিশন ব্রডকাস্টারস নিজেদের মধ্যে যে নীতি বা 'কোড' স্থির করে নিয়েছেন তাতে আছে শিক্ষা এবং সংবাদজ্ঞাপন ও আনন্দপ্রদানের দিক থেকে যা সেরা, তা-ই দিতে হবে। জন-সেবাকে কর্তব্য হিসেবে স্বীকার করে স্থানীয় ঘটনা এবং ঘোষণা বিনামূল্যে প্রচার করা যেতে পারে, দর্শকদের চার্চে যেতে, 'কম্যুনিটি চেস্ট'-এ দান করতে বলা যেতে পারে অথবা মন ভাল রাখার উপায় কিংবা কল্যাণসূচী ব্যাখ্যা করাও যেতে পারে। বাকা সময়টুকু সরকারকে দেওয়া হয়। অন্য যে কোন দেশের চেয়ে সরকার এখানে বাণিজ্যিক মাধ্যমগুলির উপর নির্ভর করে কারণ এখানে সরকারের নিজস্ব কোন প্রচারযন্ত্র নেই। (যেমন সি, বি, এস, বিমানবাহিনীর সহযোগীতায় বিমানবাহিনীর ক্ষমতা সম্পর্কিত একটি ধারাবাহিক প্রয়াসের জন্য দশ লক্ষ ডলার ব্যয় করেছিল।) বাণিজ্যিক প্রয়াস শুধুমাত্র লাভ করতে পার-লেই টিকতে পারে, সেই হিসেবে টেলিভিশন অথবা রোডিওকে সর্বাগ্রে আর্থিক দিকটার উপর দৃষ্টি দিতে হয়। কিন্তু সব কার্যসূচীর জন্যই কি সকলকে আবেদন

জানানোর দরকার? এমন কি 'ছোট্ট', টেলিভিশন দর্শকগোষ্ঠী বলতেও লক্ষ লক্ষ শ্রোতা বোঝায়। বুদ্ধির দিক থেকে কৌতুহলী এবং উদাসীনদের চাহিদা মেটানোর নৈতিক দায়িত্ব নেই কি ষ্টেশনগুলোর?

এই সার্বজনীন প্রচারযন্ত্রের মুখ্য অসুবিধে হল তার নিম্নশ্রেণীর রুচিপূর্ণ কার্যসূচীর দিকে। এই অসুবিধে থেকে উদ্ধার পাবার মত প্রভাবও রয়েছে। শ্রোতাদের সংখ্যাধিক্যতা, সকল রকমের রুচি আর অভিজ্ঞতার পূর্ণ দর্শক থাকে বলে টেলিভিশনের কার্যক্রমে সবরকম রুচির প্রতি সহিষ্ণুতা দেখা যায়। এমন শ্রোতার দল আবার অতিরিক্ত আগ্রহের সৃষ্টি করে, যা সৃষ্টিকরার ক্ষমতাকে জিয়িয়ে রাখে। নাটক, ব্যালে আর সঙ্গীতের মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ, তার জন্য আশাতীত আগ্রহ থেকে প্রমাণ হয় যে, এর রুচি ভবিষ্যদ্বক্তারা যা বলেছেন, তার চেয়ে উঁচুদরের এবং এই ভাবেই টেলিভিশনের মান উন্নয়নে বানিজ্যিক প্রেরণা যোগায়।

রেডিও

টেলিভিশনের আবির্ভাবের পর থেকেই রেডিওর প্রতিপত্তি স্তিমিত হয়ে গেছে। তা হলেও এখনও জনসাধারণের কাছে রেডিওর প্রভাব পৌছয় এবং টেলিভিশন না থাকলেও রেডিও চলে এমন ক্ষেত্র এখনও আছে। টেলিভিশনের সঙ্গে প্রতিযোগীতা করতে গিয়ে রেডিও তার নিজস্ব বৈশিষ্টগুলো নতুন করে ফুটিয়ে তুলছে।

মেয়েরা যারা ব্যস্ত থাকেন, তাঁদের পক্ষে টেলিভিশন সেটের সামনে ঠায় বসে থাকা একরকম অসম্ভবই; যাঁরা বছরের পর বছর পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে থাকাই পছন্দ করেন এবং যাঁরা টেলিভিশন পর্দার চেয়ে নিজেদের জগত নিয়েই অধিক ব্যস্ত, তাঁদের পক্ষেও ঐ একই কথা। এঁদের কাছে 'সোপ অপেরা'র দাবীই এখনও অপ্রতিহত। এখনও রান্নাঘর, স্নানের ঘর, শয়নকক্ষ এবং মোটরগাড়ী—মানুষের চোখ আর হাত ব্যস্ত থাকলেও কান যেখানে খোলা, সেখানেই রেডিওর অপ্রতিহত প্রভাব। চড়ুইভাতির আনন্দদানে অথবা সমুদ্রের ধারে একটা দিন যাঁরা কাটাতে চান, রেডিও তাঁদের শ্রেষ্ঠ সঙ্গী। ট্রানসিস্টর আর ব্যাটারীতে তৈরী রেডিওগুলো পকেটে ভরে যে কোন্ জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। রেডিও তার যে শক্তি নতুন করে অবিষ্কার করেছে তা হল সারল্য, ঘরোয়া পরিবেশ, দ্রুততা, সংক্ষিপ্ততা আর বর্ণনা।

সংবাদ, আবহাওয়াসংবাদ অথবা সঙ্কটকালে সর্বশেষ বুলেটিনের জন্যে মানুষ রেডিওর দিকে তাকিয়ে থাকে। বড় বড় সহরাঞ্চলের অন্ততঃপক্ষে একটি রেডিও ষ্টেশন থেকে সুরের যে নিরন্তর স্রোত প্রবাহিত হয় অথবা সারারাত্রি ব্যাপী অনুষ্ঠানে রেকর্ড আর তার ফাঁকে ফাঁকে কৌতুক পরিবেশন সঙ্গীহীনকে সঙ্গ দেয়।

শুধুমাত্র দাঁড়িকামানোর, প্রাতঃরাশ গ্রহণ অথবা মোটর চালিয়ে অফিসে যাবার সময় যাঁরা রেডিও শোনেন, তাঁদের জন্যে এখন রেডিও'কে সংক্ষিপ্তসূচী গ্রহণ করতে হয়েছে। যাঁরা অনেকক্ষণ শুনতে চান তাদের জন্যে উদ্ভাবিত হয়েছে ধারাবাহিক লম্বা কার্যসূচী ; প্রতিটি অধ্যায় যার স্বয়ংসম্পূর্ণ অথচ প্রথম থেকে শেষ অবধি একটা ধারাবাহিক সম্পর্কও থাকে। সংবাদপত্রের মতোই সর্বশেষ সংবাদের পরেই কোন কংগ্রেস সদস্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, বিদেশের সংবাদ, নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অথবা মেয়েদের ফ্যাসানের দিকে ছুটবে।

একযোগে বিভিন্ন ষ্টেশনের জন্য তৈরী রেকর্ড এখন স্থানীয় ষ্টেশনগুলোতে উচ্চ রুচিসম্পন্ন আনন্দ দেয় আর কেন্দ্রসমূহ থেকে যা আসে তার ফাঁকে ফাঁকে বিজ্ঞাপন অথবা ঘোষণা প্রচার করা যেতে পারে। যে সুবিধে একদিন বিত্তবানদের একচেটে ছিল, তা এখন স্থানীয় ছোট ছোট রেডিও ষ্টেশন ও ব্যবসায়ীদের হাতেও এসে গেছে।

চলচ্চিত্র

টেলিভিশন সিনেমাকে ভীষণ আঘাত দিয়েছে। থিয়েটারগুলোতে আগে যেখানে সপ্তাহে নয় কোটি লোক যেতেন, এখন সেখানে যান সাড়ে পাঁচ কোটি। এর একমাত্র কারণ না হলেও, টেলিভিশন একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। সিনেমায় যেতে অনেক অর্থ লাগে, বিশেষ করে কোন সম্পূর্ণ পরিবারের পক্ষে, কারণ তাঁদের ছেলেমেয়েদের জন্তে টিকিট কিনতে হয় নয়তো বাচ্চাদের কাছে বাড়ীতে থাকবার জন্তে বেবীসিটারকে অর্থ দিতে হয়। এও একটি কারণ। নতুন গাড়ী ব্যবহার কিছু সাহায্য হয়েছে, কারণ বাচ্চারা ক্লান্ত হয়ে পড়লে পেছনের আসনে ঘুমিয়ে পড়তে পারে।

টেলিভিশনের অস্তিত্ব অস্বীকার করা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে হলিউড [illegible] যোগ দিলে এবং টেলিচিত্র তৈরী করতে সুরু করল—পুরোন ছবিগুলো টেলিভিশনে ব্যবহৃত হল, অভিনেতা অভিনেত্রীদেরও, যাদের মজুরি ছিল

[illegible]

পর কিছুদিন বসে থাকতে হয়, ধার দেওয়া সুরু হল। আর ভাল ছবি তৈরীর দিকেও মন দিল—নিরুপায় হয়ে মামুলী ছবি থেকে হিট ছবির দিকে, যা যে কোন সময়েই সম্ভব। এর ফলে সম্পদ হিসেবে যা পাওয়া গেল, তা টেলিভিশন পাবে আগে কেউ ভাবতেই পারেনি। পাওয়া গেল অনেক অভিনেতা, অভিনেত্রী, গতিশীল কার্যক্রম, কর্মসূচীর বিরাট পরিধি। চরম মুহূর্তে কতকগুলো কারিগরী উন্নতি এই বৈশিষ্টের উপর গুরুত্ব আরোপ করল—বড় লেন্স, বড় পর্দা (screen) এবং রঙীন দৃশ্যপট।

হলিউডে অবশ্য ফন্দি-ফিকিরের কখনই অভাব ঘটেনি। মন্থর গতি, জলের নীচের ছবি, জাহাজ ডুবি, ট্রেনের সংঘর্ষ, সারা সহরে অগ্নিকাণ্ড, হাস্যরসাত্মক আকর্ষণীয় জাবন, কার্টুন, পাশব ধ্বংসলীলা, সেই সঙ্গে হাস্যকৌতুক এবং পুনরুদ্ধারের কাজ—এসব দুনিয়ার দর্শকদের শিখিয়েছে বিস্ময়কর কিছু পেতে হলে হলিউডের কাছে পাবে। একটা ছায়াছবি তুলতে দুশ' ছিয়াত্তর রকমের কলা আর কারুশিল্পের সাহায্য নিতে হয়।

হলিউডের একটা ঐন্দ্রজালিক শক্তির কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। দুনিয়ার যৌন জীবন আর স্বপ্নের প্রতীক এই হলিউড। যাঁরা, এমন কি হলিউডের ছবির নিন্দে করে, তারাও না দেখে ছাড়ে না। এই ভাবেই তারা তাদের জন্য তৈরী হলিউডের স্বপ্নবিলাস উপভোগ করেছে এবং দোষ ত্রুটির জন্য হলিউডকে দায়ী করেছে।

হলিউডের আন্তর্জাতিক সাফল্যের একটা কারণ হল এই যে, সুরু থেকেই হলিউড শিখেছে (এর কারণ আমাদের দেশের অধিবাসীরা বিভিন্ন দেশ থেকে আগত) মানুষের মূল প্রয়োজন, ভীতি, খেয়ালীকল্পনা অথবা নিশ্চিন্ত নির্ভরতার ভিত্তিতে রচিত চিত্রনাট্যে সার্বজনীন আবেদন আছে। ভিতরের উত্তেজনা ও আক্রমণের 'কাউবয়' ছবি, মারামারি-কাটাকাটির ছবি, যেখানে ডাকাতের অনুসরণকারী ছুটে চলে তার বিবেক দংশনে, যৌন আবেদনমূলক ছবি যেখানে দর্শক নায়িকার সহাস্য সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে—এসবেরই আবেদন সার্বজনীন। দক্ষিণ সমুদ্রোপকূলের বাসিন্দাদের নিজেদের বিশ্লেষণী ক্ষমতা বলে সিনেমা ছবিগুলো দু' ভাগে বিভক্ত করেছে—মারামারিপূর্ণ আর যৌন আবেদনপূর্ণ। তারা দুইয়েরই ভক্ত।

আমেরিকার দুর্ভাগ্য বলতে হবে—এইসব সার্বজনীন ছবিগুলোর সহজ সরল দর্শকেরা বিশ্বাস করতে সুরু করেছেন যে, সকল আমেরিকানই বদমায়েস

প্রকৃতির আর প্রেম করে বেড়ায়, যদিচ নিজেদের দেশের মানুষকে ছবির চরিত্রগুলোর সঙ্গে তারা কখনও ঐভাবে এক করে ফেলে না। হলিউডের সাফল্যের মূল্য হল সারা বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই মিথ্যে আর ঘৃণা দিয়ে গড়া কল্পিত এক ছবি—দেশের এবং তার সংগঠনগুলো সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য পরিবেশন করা সত্ত্বেও বিশ্বের এ ধারণা দুর্বল হয়নি এবং কম্যুনিজম এর সুযোগ নিয়েছে। পাগলিয়াকির মতো আমেরিকাকে বুঝি দুনিয়াকে শুধু হাসিয়েই যেতে হবে, কেউ তাকে গুরুতর মূল্য দেবে না।

মেক্সিকান, আরব অথবা অন্য কোন পরিচিত জাতের লোককে ভিলেন-এর ভূমিকায় নামালে নিদারুণ প্রতিবাদ উঠেছে, তাই অনেকদিন আগেই হলিউডে স্থির করা হয়েছে যে, আমেরিকানদেরই শুধু (অথবা, হতে পারে অপরিচিত জাতের কম্যুনিষ্টদের) শয়তানের ভূমিকায় নামানো হবে। এই ভাবে পৌরুষের খাতিরে, আরও কিছু অর্থের জন্যে আমরা বিশ্বের চলচ্চিত্র জগতে শয়তানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে সম্মত হয়েছি। জাগতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার অনিবার্য ক্ষমতাবৃদ্ধিতে যাঁরা রুষ্ট হয়েছিলেন, তাঁদেরকে আমাদের ঘৃণা করবার পথ আমরা সহজ করে দিলাম, কারণ আমরা কি নিজেদের শয়তানী চক্রের শনি, অলস ধনী, ডাকাতের দলের সর্দারের ভূমিকায় নায়ক-নায়িকারূপে ফুটিয়ে তুলিনি ?

মার্কিন কাহিনী বিশেষ ধরণের বৈশিষ্ট পেল। যে মেয়েকে দেখে মন্দ মনে হয়, কিন্তু আসলে ভাল, মার্কিন ছবির সেই হল বিশেষ নারী চরিত্র। তার মন্দটুকু সম্ভবত পুরুষ লেখকের কল্পনাবিলাস, কারণ তিনি এমন মেয়ের কথাই হয়ত কল্পনা করতে চায়, যে সহজেই তাঁর যৌন আবেদনটুকু মেনে নেবে। এই মন্দটুকুই মেলামেশার সুযোগ করে দেয়, যা তরুণ-তরুণীদের সঙ্গী সংগ্রহের জন্য সকল পরিবেশেই অপরিহার্য। মেয়েটির আগ্রহ নায়ককে এগিয়ে আসতে আর নারীসুলভ নীতিবোধজাত সহজ লজ্জা ঝেড়ে ফেলতে সাহায্য করে। তারপর নায়িকা নায়কের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করে—নায়িকা এই পরিস্থিতি মেনে নেয় এবং অবশেষে উভয়ের বিয়েতে হয় তার শেষ পরিণতি।

আমেরিকার পারিবারিক জীবনের বৈশিষ্ট কয়েকটি ছবির বিষয়বস্তু হয়। নায়ক প্রায়শঃই তার মা-বাবাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলে, নিজের জীবনের ধারা নিজেই বেছে নেবে—এই তার দাবী। নায়ক জোর দেয় তার নিজের সৃষ্ট পরিবারের উপর, যে পরিবার থেকে সে এসেছে তার উপর নয়। যৌবন মানেই

স্পর্ধা। বাবাদের প্রায়শঃই দেখা যাবে টেকো, অসমর্থ আর উপহাসের পাত্র হিসেবে। উত্তেজনাপূর্ণ মিলান্তক নাটকে (মেলোড্রামা) বাবা মানুষটি ভাল নয়, রীতিমত গোলমেলে এবং নায়ককে ফেলে এগিয়ে যেতে চান। ফ্রয়েডীয় ভাষায় এর অর্থ এই হতে পারে যে, ছেলের পিতাকে ফেলে এগিয়ে যাবার পক্ষে এ হল একটা ক্ষমার্হ ওজুহাত। যে বিপজ্জনক বিশ্বের বিরুদ্ধে তার লড়াই, সেখানে ছেলের দোষই প্রধান, পুলিশ তাকে যে সন্দেহের চোখে দেখে, তা কতকটা তার নিজের বিরুদ্ধে নিজের অভিযোগের মতোই।

অপরাধমূলক (ক্রাইম) চিত্রের মূল হল পীড়া দেবার কল্পনা। প্রায়শঃই দেখা যাবে, পুলিশ নয়, স্বাধীন কোন তদন্তকারী অপরাধ সমস্যার সমাধান করছেন। তিনি বিদ্রোহী পুত্রের প্রতীক, যে আইন (পিতার ক্ষমতার প্রতীক) অমান্য করেছে ন্যায় বিচার পাবার জন্যে। প্রতীকের দিক থেকে আমেরিকান হলেন এমন একজন তরুণ, যে নতুন দুনিয়ার জন্যে পিতার দুনিয়া পরিত্যাগ করেছে, যে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে পশ্চিমের চিরনতুন দুনিয়ায় এসেছে, বিত্ত আর আনন্দের সন্ধানে। এখানে আইনকে তার দাস হতে হবে, এখানে সে নতুন ঘর বাঁধবে, যার বিরুদ্ধে আবার তার বংশধরেরা বিদ্রোহ করবে। পিতার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আর সকলের মধ্যে সাম্য, গণতন্ত্রের ভিত্তিমূল ; তাই আমাদের লোকপ্রিয় আর্টের একটি চিরস্থায়ী বিষয়বস্তু। যৌবন, আগ্রহ (নারী এবং পুরুষের) চেষ্টা ও জয়কার, সময়ের সাম্যবাহক—এইগুলোর উপরেই জোর দেওয়া হয়।

সন্দেহাতীত গুণগত ব্যর্থতার জন্যে যারা চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধতা করেন, তাঁরা এই কথাটা ভুলে যান যে এই ছবিগুলো শুধুমাত্র শুচি সমাজের বিজ্ঞ মানুষের জন্যে তৈরী হয়নি, সারা বিশ্বের জন্যে রচিত হয়েছে এই লোকপ্রিয় নাটকগুলো। এবং সেই হেতু এসব সেই একই ধরণের কল্পনা, ভয়, আকাঙ্খার উপর ভিত্তি করে রচিত হবে, যার অস্তিত্ব লোকগাথার মধ্যেও রয়েছে।

চলচ্চিত্রগুলো আরো ভাল হত যদি সেন্সর বোর্ড ওদের আরও কম করে দাবিয়ে রাখতেন। বহুমুখী আইন-কানুনের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে সিনেমাশিল্প 'মোসন পিকচার প্রোডিউসারস অ্যাণ্ড ডিসট্রিবিউটার্স অব আমেরিকার' অধীনে নিজেরাই নিজেদের উৎপাদন নীতি (প্রডাক্সন কোড) স্থির করেছে। চলচ্চিত্র জগতের বিশেষ আইন কানুনের বাঁধনে কোন কুকুর জৈবিক প্রয়োজনে কোন স্থান শুঁকে দেখতে পারবে না, এই বস্তু কানুনে কোন

বাচ্চা কুকর্ম করে তার প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলতে পারবে না, স্নানের ঘরে জামা কাপড় দেখান চলবে না, আইনানুযায়ী যাদের বিয়ে হয়েছে তাদের একত্রে শোবার বিছানার ছবি দেখান যাবে না। প্রাপ্ত বয়স্কদের সমস্যা আর অভিযোগ, বিশেষ করে যার সঙ্গে যৌন জীবনের সম্পর্ক আছে, সে সব নিষিদ্ধ। ক্যাথলিকদের "লিজিয়নস্ অব ডিসেন্সী" এবং কয়েকটা প্রোটেসট্যান্ট চার্চ নিয়ত লক্ষ্য রেখেছে হলিউডের উপর, যাতে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য কোন অশ্লীল কাহিনী চিত্রায়িত না হয়।

দুশ্চিন্তার কারণ সহজেই বোঝা যায়। সিনেমা ছেলেমেয়েরাও দেখে। নয় বছরের ধারেকাছের ছেলেমেয়েরা বিশেষ করে রোমাঞ্চকর কাহিনী আর ষোল'র কাছাকাছি যারা তারা যৌন-আবেদনমূলক কাহিনীর দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু যে বাধা নিষেধ আরোপিত হয়েছে, তাতে বিবাহিতদের যৌনজীবন বাদ পড়েছে, তার জায়গা নিয়েছে অবিবাহিতদের জীবন। এর ফলে অপরাধ আর হিংসাত্মক নীতি প্রবেশাধিকার পেয়েছে, আর সাদাকালোয় মিশিয়ে এক মিথ্যে জগতের সৃষ্টি হয়েছে। সেন্সর বোর্ড সিনেমার ছবিগুলো নিয়ন্ত্রণ করে মনুষ্যত্ব গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। অপরাধের প্রকৃত কারণ তাঁরা দেখতে চাননি— বস্তি অঞ্চল, উদাসীন প্রকৃতির মা-বাবা, আমোদ-প্রমোদ বিষয়ক কর্মসূচীর স্বল্পতা এবং ঐশ্বর্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদানকারী সমাজের অপরাধজনিত বিষয়ে উস্কানি এর জন্যে দায়ী। নিজেদের দোষ ত্রুটি স্বীকারের চেয়ে, চলচ্চিত্রের উপর দোষারোপ করা সহজ।

সুপ্রীম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়ে সেন্সর বোর্ডের আইন-কানুনের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। স্বাধীন চিত্রনির্মাতারা এখন এই কোডের অনুমতি লিপি ছাড়াই সিনেমা দেখাতে পারেন। এই ধরণের কোন আইনের কড়াকড়ি না থাকায় টেলিভিশন হলিউডের সম্পর্কে আরোপিত কয়েকটি গণ্ডী সহজেই ভাঙতে পেরেছে।

কিন্তু সেন্সর সমস্যার সমাধান হলেও একটি মূল সমস্যা থেকে যাবে। হলিউড একটি শিল্প এবং আর্ট সম্মত কিছু সৃষ্টি করতে প্রয়াস পাচ্ছে। বিরোধ বেধেছে এই দুটোতে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হিসেবে যে ফরমূলাকে মেনে নেওয়া হয়েছে, তার থেকে একটু সরে গেলেই অর্থ প্রদানকারী ব্যাঙ্কের আর উৎসাহ থাকে না। অথচ টিকিট বিক্রীর হার বারংবার প্রমাণ করেছে যে আর্টসম্মত চিন্তা আর মৌলিকতাই অধিক অর্থ টেনে আনে।

সফল চিত্রগুলি এখন অধিক হারে এমন ব্যক্তিদের দ্বারা নির্মিত হচ্ছে যারা একাধারে লেখক, পরিচালক ও প্রযোজক। আর্টসম্মত সৃষ্টিমূলক এই কাজগুলো একসঙ্গে করবার দক্ষতা এবং এই দক্ষতা যাঁদের আছে তাঁদের অধিক ক্ষমতা দেওয়ার অর্থই হল, হলিউডের মেধা বা ব্যর্থতা নিহিত থাকে তার যথাযোগ্য প্রয়োগ ও উন্নত ধরণের চিত্র নির্মাণে। তবে "ফ্রন্ট অফিস" ও পরিচালক, পরিচালকও চিত্র নির্মাতা, প্রযোজক ও অভিনেতা, আর অভিনেতা ও এজেন্টদের মধ্যে যে তিক্ততা আছে তা এতেই শেষ হবে না।

অভিনেতা, তথা আধুনিক চিত্রজগতের নায়কদের তাদের চপল আর অদমনীয় ভালবাসা, জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাত্রা, প্রায়শঃ বাহুল্য প্রচার এবং আমাদের মত সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যে তাদের আকস্মিক আবির্ভাব —এসবের জন্যে আমাদের কাছে তাদের এই মরজগতে অলিম্পাচের দেবতাদের মতই নমস্য মনে হয়। তবে গুণমুগ্ধের দল যতটা কল্পনা করে, তাদের নায়ক-নায়িকাদের জীবন ততটা আরামের নয়। ছবি যখন তৈরী হয়, তখন অবশ্য তাদের অনেক দিনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, আবার বহু সময় শুধু অপেক্ষা করেই থাকতে হয়, একই দৃশ্যের বিরক্তিকর পুনর্গঠন (রি-টেক) নির্বিবাদে হজম করতে হয়। দুটো ছবির মধ্যবর্তী সময়ে তারা অবসন্ন আর নিরাশ হয়ে পড়ে, উদ্দেশ্যবিহীনভাবে পার্টিতে যোগ দেওয়া, যৌন দুঃসাহসিকতা আর আমোদ-প্রমোদ খুঁজে বেড়ান ছাড়া কিছুই করার থাকেনা। এসবেরও এক সময়ে শেষ হয়। আর যে মান নির্ধারণ করে তাদের জীবনযাত্রা পরিকল্পনা করতে হয়—তার তায় নির্ধারিত হয় দর্শকদের উপর তাদের আকর্ষণী শক্তির তারতম্যে। দেশের অন্য যে কারও তুলনায় অধিক আয় করলেও, ক্রীতদাসদের মতো সাত বছরের চুক্তি তাদের বেঁধে রাখে। জনগণের মধ্যে তাদের জৌলুস আছে, কিন্তু সিনেমা কর্মীদের কাছে তারা ঘৃণিত। তবুও জনগণ অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে তাদের এক করে ফেলে এবং বিরক্তিকরভাবে গুণমুগ্ধ পূজারী হয়ে ওঠে।

এরা যে ছবিতে নায়ক সে-বই সারা বিশ্বের দর্শকদের আকৃষ্ট করে। কিন্তু কেন?

হলিউডের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলোতে কঠিন আর জটিল টেকনিকাল সাফল্যের জন্য আমাদের আবেগের মূল স্পর্শ করে। অভিজ্ঞতাকে সহজভাবে প্রকাশ করে, সময় আর স্থানের পরিধি বৃদ্ধি করে, হত্যাকাণ্ডের বিভীষিকার মধ্য দিয়ে নিরাপদ

স্থানে পৌঁছে দেয়, ভিতরের যুদ্ধপ্রিয় মানুষটির ভয় ও ঘৃণাকে রূপ দেয়, ধার করা সৌখীনতায় আনন্দ করে, হাস্য রসিকের সঙ্গে চতুরভাবে, বীরের প্রতি বীরত্ব, দেখিয়ে শয়তানকে হারিয়ে দিয়ে সর্বশেষে পুরস্কার হিসেবে সুন্দরী মেয়েকে জয় করে। এক ডলারেরও কম দামের টিকিটের বিনিময়ে আর কি আনন্দ লাভ হতে পারে?

সংবাদপত্র

বিশ্বের সমস্ত নিউজ প্রিন্টের শতকরা ষাট ভাগ ব্যয়িত হয় আমেরিকার সংবাদপত্রগুলোতে। সংবাদ পরিবেশনের দিক থেকে 'নিউ ইয়র্ক ডেলী নিউজ' (রবিবারের বিক্রী সংখ্যা – ৩,৬৯৪,৮৫১)-এর মত জনপ্রিয় সংবাদপত্র, থেকে, 'ক্রিশ্চয়ান সায়েন্স মনিটার' 'ওয়াল ষ্ট্রীট জার্ণাল' আর 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' যারা সারা দুনিয়ার পূর্ণাঙ্গ খবর পরিবেশনের গর্ব করতে পারে এবং যাদের রবিবারের সংস্করণের জন্যই প্রয়োজন হয় দু'শ একর বনভূমির। স্থানীয় ছোট খাট কাগজও আছে যাতে ব্যক্তিগত সংবাদের আর সামাজিক ক্রিয়াকলাপের উপর জোর দেওয়া হয়। কোন সমাজের আদর্শ আর তার নীতিবোধকে তুলে ধরাই এদের উল্লেখযোগ্য অবদান। 'ক্লীভল্যাণ্ড প্রেস'-এর মত কাগজও আছে যার সম্পাদক লুই সেলজার, বাল্যকালে যিনি অত্যন্ত গরীব ছিলেন, আজ গোটা সমাজের বিবেকের মুখপাত্র করে ফেলেছেন তাঁর কাগজটাকে। এই কাগজের সম্পাদকেরা ময়লাতে ভরাট হয়ে আসা লেক পরিষ্কার করা অথবা কোথাও চিড়িয়াখানা স্থাপনের মত প্রয়োজনীয় কাজের উপর নজর দেন। এখানকার পূর্ণ সময়ের জন্য নিয়োজিত জনৈক মহিলা কর্মচারীর কাজই হল মার্কিন আর বিদেশী ছেলেমেয়েদের মধ্য পত্রালাপের সংযোগ বজায় রাখা।

আমেরিকার বহিরাগত জনসংখ্যাই জনপ্রিয় সংবাদপত্রের প্রকৃতি নির্ধারণ করে। জোসেফ পুলিৎজার সর্বপ্রথম জার্মাণ ভাষায় প্রকাশিত একটি সংবাদপত্রে আবিষ্কার করলেন জার্মান বংশোদ্ভূত বহিরাগতদের পছন্দ অনুসারে। তাঁর 'নিউ ইয়র্ক ওয়ারল্ড,' নানান দেশ থেকে আগতদের বংশধরদের সমর্থনে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। একইভাবে হার্ষ্ট, আইরিশদের সমর্থনে তাঁর কাগজটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন। উভয়েই বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র থেকে উত্তেজনাকর সংবাদের (প্রয়োজনীয়তা), সামাজিক ও দলগতসংবাদ পরিবেশনের এবং পাঠক-পাঠিকাদের পরামর্শ দেবার মূল্য উপলব্ধি করেন।

আয় বৃদ্ধির একমাত্র উৎস বিজ্ঞাপন এবং বহুল প্রচারের মুখ্য পথ হয়েছে উত্তেজনাকর সংবাদ পরিবেশন। খেলাধূলা, সমাজের সংবাদ, হাস্যকৌতুকী, পুস্তক পরিচয়, আর্ট, গৃহ নির্মাণবিষয়ক তথ্য, ছোটখাট মেরামত করার পদ্ধতি সম্পর্কিত বিশেষ বিভাগ এবং হালকাধরণের ও চিন্তার খোরাক যোগাতে পারে মত বিভিন্ন বিভাগীয় সম্পাদকের লেখা গল্প ও প্রবন্ধ, চিকিৎসা ও ব্যক্তিগত পরামর্শ দান—এ সবের মাধ্যমে সংবাদপত্র, বৃদ্ধ-যুবা সকলকেই আকৃষ্ট করতে চায়।

বড় বড় সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, যেমন—অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, ইউনাইটেড প্রেস, ইনটারন্যাশানাল নিউস সার্ভিস দেশের সর্বত্র টেলিগ্রাফে সংবাদই শুধু পাঠায় না, এখন টেলিগ্রাফিক পদ্ধতিতে প্রেরিত সংবাদ সম্বলিত একটা ফিতে 'পান্‌চ' করলে একেবারে লিনোটাইপ মেশিনে কম্পোজ শুরু হয়ে যায়। সিণ্ডি-কেটের সংখ্যা শ' দুইয়ের মত। এরা সকল রকমের 'কলম' আর ফিচার সরবরাহ করে। ছোটখাট কাগজ, যা অন্যথায় সংবাদপত্র গোষ্ঠীর ('চেন') খপ্পরে গিয়ে পড়ত, সহজেই পাঠকদের বিশ্বের সংবাদ ও বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ আলোচনা সরবরাহ করতে পারে—এর জন্যে শুধুমাত্র স্থানে স্থানে নিজস্ব মৌলিকতাকে বিসর্জন দিতে হয়। সংবাদপত্রগুলো সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিদানে উল্লেখযোগ্য স্থানীয় সংবাদ দেয়, যা তাঁরা অন্য গ্রাহকদের দিতে পারেন। এই ভাবে পারস্পরিক সাহায্য দান ব্যবস্থা চালু থাকে।

সাময়িক পত্র

সাধারণ ভাবে প্রচারিত পাঁচশ সাময়িক পত্রের মধ্যে ৫৪টির বিক্রী ৭ লক্ষ থেকে ১ কোটি ১০ লক্ষ অবধি। 'রিডার্স ডাইজেষ্ট'-এর প্রচার শুধু আমেরিকায় নয়, সমগ্র দুনিয়াতেই। প্রচারের দিক দিয়ে তার স্থান সর্বোচ্চ। স্থান থাকলে এ সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা উচিত ছিল। এর আশাবাদী সুর, অপচয় আর প্রতারণার মুখোস খুলে দেওয়া, সহজ পাঠ্য প্রবন্ধ, গল্প লেখার মত রচনাভঙ্গীতে প্রবন্ধ, ব্যক্তিগত জীবনী, জনপ্রিয় বিজ্ঞান, ব্যক্তিগত পরামর্শ এবং হাস্যরস পরিবেশনের দক্ষতার মধ্যে মার্কিন চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যাবে।

সহস্র সহস্র বাণিজ্যবিষয়ক পত্রিকা, চিন্তাশীল সাময়িকী (যার অনেকগুলোই পৃথিবীর সেরা), কোম্পানীসমূহের প্রকাশিত পত্র-পুস্তিকা, স্কুলের কাগজ এবং বিভিন্ন সংগঠনের বুলেটিন বিরাট 'নিউজপ্রিন্ট' চাহিদার একটা প্রধান কারণ।

নানান ধরণের ম্যাগাজিন রয়েছে। সজীব অথচ জ্ঞানপূর্ণ 'আমেরিকান স্কলার' থেকে আরম্ভ করে সজীব অথচ বুদ্ধিহীন হাস্যরসের পত্রিকাও আছে। এর মধ্যে আবার নানান ধরণের সাময়িকী রয়েছে। এর মধ্যে আবার বিখ্যাত ব্যক্তিদের (সাধারণত সিনেমার তারকা) নগ্ন কাহিনীও প্রকাশিত হয়, এমন কাগজও আছে। এসব কাগজে গর্ভপাত করার ব্যবসা এবং যে সমাজ মানুষের লোভ ও নষ্টামির ভার পুরোপুরি বহন করছে, তার সকল পঙ্কিলতাই প্রকাশ পায়।

বিজ্ঞাপন পেতে হলে বহুল প্রচারিত কাগজগুলোর দরকার, তাই ছাপাবার মত আকর্ষণীয় উপাদানের অন্বেষণ চলে সবসময়েই, তা যত বীভৎস অথবা জঘণ্যই হোক না কেন। তবে আশার কথা এই যে, যে সাময়িকীগুলোতে সবচেয়ে ভাল লেখক, ফটোগ্রাফী আর রুচিপূর্ণ ছাপা থাকে, তাদের প্রচারই সর্বাধিক আর অশ্লীল সংবাদপূর্ণ পত্রিকার প্রচার শুধু সংবাদ অথবা ছবির সাময়িকীর চেয়ে নয়, অনেক ধর্মীয় পত্র-পুস্তিকার চেয়েও কম।

অনেক আমেরিকান কুরুচিপূর্ণ লেখা বাতিল করে দেবার জন্যে সেন্সর প্রথা পছন্দ করেন। কিন্তু দেশ এখনও মনে করে যে কেবলমাত্র উৎকট অশ্লীলতা ছাড়া অন্য সব কিছু প্রকাশ করার স্বাধীনতা না দিলে বাক স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়ে। আবর্জনা সাহিত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার পথ হল শিক্ষার বিস্তার এবং নোংরা সাহিত্যের প্রচার বন্ধ করে দেওয়া নয়, উন্নত ধরণের কিছু পরিবেশন করা।

সমালোচনা

জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছবার মাধ্যমগুলো যদি খুব বেশী নীচে নামেও, সে সব দেখিয়ে দেবার মত সমালোচকও আছেন। সিনেমা, রেডিও ও টেলিভিশন, সংবাদপত্র, এবং সঙ্গীত, নৃত্য থিয়েটার, রেকর্ড, সাহিত্য—এ সবকেই নিয়ত হাজার রকমের প্রশ্নের মুখোমুখী হতে হয়। সংস্কৃতির সমালোচকদের সংখ্যা ইতিপূর্বে কখনও এত অধিক হয় নি।

সমালোচকেরা নির্মম হবেনই। মার্কিন ঔপন্যাসিকেরা ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যে জাতির অত্যন্ত কঠোর সমালোচনা করেছেন। এখন সমালোচকেরা ঔপন্যাসিকদের বিচার করছেন। স্পষ্ট সাহিত্য সব দিক থেকে বিচার করা হচ্ছে—লেখকের বড় হবার পরিবেশ, সমাজের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী। এই সব মিলিয়ে নেওয়া হয়

তাঁর বই অথবা প্রতীকগুলোর সঙ্গে। জন ক্রোয়ে র‍্যানসন যে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনা করে, নয়া সমালোচনা নামে তা খ্যাত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য সাহিত্যিকের সৃষ্ট সাহিত্য আর প্রকৃতির পৃথক সমালোচনা।

সাহিত্য ত্রৈমাসিক খুব চলে। এডমণ্ড উইলসন, কেনেথ বার্ক, লিওনেল ট্রিলিং ও জোসেফ উর্ড ক্রাচের মত লেখকেরা মুখ্যতঃ সমালোচক হিসেবেই প্রথম দিকে খ্যাতি অর্জন করেন, আবার মার্ক ভ্যান ডোরেন-এর মত কবি অথবা ঔপন্যাসিকেরাও অনেক মুখরোচক সমালোচনাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

দেশ সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের এবং ঔপন্যাসিক সম্পর্কে সমালোচকের ধারণা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে খুব খারাপ মনে হতে পারে। আসল কথা এই যে, ঔপন্যাসিক এবং সমালোচক সকলেই আদর্শবাদী মানের দিকে লক্ষ্য রেখে লেখেন। এ হল আমেরিকার আর একটা দিক, যা অত্যন্ত আশা নিয়ে যা ভাল তার দিকেই তাকিয়ে থাকে।

'জাজ' সম্পর্কে শিশুদের সবজান্তার মনোভাব এবং প্রথম শ্রেণীর কাগজগুলোর চমৎকার সমালোচনা যিনি শোনেন অথবা পড়েন অথবা লক্ষ্য করেন যে সমালোচনাও রাজনীতি অথবা খেলাধুলা বিষয়ক মন্তব্যের ন্যায় সিণ্ডিকেটের (একই লেখা যারা বিভিন্ন সংবাদপত্রে পাঠান) অনুমোদন পেয়েছে, তাঁরাই আমেরিকার সজাগ সমালোচক মনোভাবের খবর পাবেন।

আমেরিকান সমালোচকেরা, নিজেদের শুধুমাত্র মার্কিন দুনিয়ায় আবদ্ধ রাখেন নি। ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচকদের বেশ কয়েকজন এসেছেন আমেরিকা থেকে; অন্যদিকে জনৈক ফরাসী পর্যবেক্ষকের মতে ফ্রান্সের বাইরে ফরাসী আর্ট ও সাহিত্যের সব চেয়ে অধিক আর উন্নত ধরণের সমালোচনা লিখিত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

মনস্তত্ত্ব, সমাজবিদ্যা এবং নৃতত্ত্ব বিদ্যার অন্তর্দৃষ্টিতে সমৃদ্ধ এবং অলঙ্কারশাস্ত্র সম্মত, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য শক্তিশালী হয়ে উঠেছে মার্কিন সমালোচনা। এখন এর ভিত্তিমূল প্রসারিত এবং অনুভূতি গভীরতর হচ্ছে। মার্কিন সমালোচকেরা তাঁদের এবং তাঁদের পদ্ধতি সম্পর্কে নিশ্চিন্ততা নিয়ে চেয়েছিলেন, ডেলমোর স্কোয়ার্জের ভাষায়, "প্রচলনবাদ-বিরোধী সজাগ মনোভাবটিকে জিইয়ে রাখতে—না হলে বুদ্ধিবাদ এবং বুদ্ধিবাদের বাস্তবতা অর্থহীন হয়ে যাবে।" মার্কিন সমালোচনা বুদ্ধিবাদ যাতে অর্থহীন না হয়, তার জন্যে নিজেদের করনীয়টুকু করে চলেছেন।

রুচি

মার্কিন রুচি উন্নত হয়েছে অথবা নীচের দিকে পিছলিয়ে যাবার গতি কোন রকমে রুদ্ধ করে রেখেছে ?

এর একটা জবাব পাওয়া গিয়েছিল যখন টেলিভিশনে দশ পনের বছরের পুরানো সিনেমার ছবি দেখাতে সুরু করল। মুক্তির সময় যে ছবিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে হয়েছিল, এখন তাকে টেকনিকের দিক থেকে সেকেলে, সংলাপের দিক দিয়ে কিম্ভূতকিমাকার, বিষয়বস্তুর অসারতা, আর আদর্শের দিক থেকে কাঁচা মনে হয়। সমসাময়িক টেলিভিশন আর সিনেমার এই তুলনামূলক সমালোচনাই উন্নত ধরণের রুচির কথা জানিয়ে দেয়।

দর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিযোগীতা এবং তার ফলে লক্ষ লোকের কাছে আবেদনমূলক বিষয়বস্তুর সন্ধান প্রায়শঃ এই মানকে শোচনীয়ভাবে নীচে নামিয়ে আনে। কিন্তু যা কিছু রুচিহীন আর সেকেলে, তার বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান সুন্দর আর্টসম্মত সৃষ্টিগুলো ভারসাম্য রাখতে পারবে। কলাবিদ্‌দের বৈঠক দেখতে অভ্যস্ত ইউরোপীয়েরা, খবরের কাগজের অথবা টেলিভিশনের নীচুস্তরের সংবাদ অথবা ছবি পরিবেশন দেখে সংকোচবোধ করতে পারেন। কিন্তু পরিবর্তনবাদী আমেরিকানরা সমকালীন সৃষ্টিকে স্থায়ী মনে না করে,তার দৃষ্টিভঙ্গীর দিকে দৃষ্টি দেয়। এই মনোভাব থেকেই তারা মনে করে যে সকলের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদানের মাধ্যমগুলি তারা খোলা রাখতে পেরেছে এবং এই মাধ্যমগুলির সাহায্যে ক্রমশঃ জাতির রুচির মানকে সর্বশ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এই মাধ্যমগুলির চিরন্তনী ক্ষুধা নিবৃত্তি করার জন্যে কি করে স্বাস্থ্যকর খাদ্য-সংগ্রহ করা যায় এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের, এদের মধ্যে উৎকৃষ্টদের সাহায্য করতে কি করে উৎসাহিত করা যায়, সেই হল আসল সমস্যা। সম্ভবতঃ এ চাহিদা মেটাবেন সেই সৃজনী প্রতিভা যা বিদেশে না গিয়ে দেশেই অবস্থান করছে। মার্কিনী মূঢ়তা ও নীচতা ছেড়ে পালিয়ে যাবেন, সৃজনী প্রতিভার জন্য এমন কোন সাংস্কৃতিক স্বর্গ নেই। ফলে, লিওনেল ট্রিলিং ঠিকই বলেছেন, রীতিমত সাংস্কৃতিক উন্নতি দেখা যাচ্ছে। মনের চাহিদা ও কল্পনার কাছে মাথা নত করতে প্রস্তুত আছেন এখন বিত্তবানের দল। এভাবেই রুচি ও স্পর্শকাতর মনের অস্তিত্বকে এঁরা মেনে নিয়েছেন। নিয়ত সম্প্রসারণশীল বুদ্ধিবাদ শ্রেণী

কলাসম্মত সৃষ্টিকে জোরদার করে তুলছে এবং আগের তুলনায় আজ চিন্তার মূল্য এবং কদর অনেক বেশী।*

পুরোপুরি স্থানীয় সমস্যা থেকে আমেরিকানদের রাজনৈতিক দৃষ্টি এখন আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গের দিকে গেছে। দ্রুততর সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণের তোরণ-দ্বারে দণ্ডায়মান আমেরিকার শিল্পীরা সাহসের সঙ্গে বাস্তববাদী ভাষায় এমন কথা বলবেন যা সমস্ত পৃথিবী বুঝতে পারবে বলে আশা করা যেতে পারে।

আমোদ-প্রমোদ

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলতে পারে, এই সম্ভাবনায় আমেরিকান সৈন্যদের পকেটে তারের কোন বাদ্যযন্ত্র রাখতে শেখান হয়েছিল। সন্দেহজনক অথবা শত্রুপক্ষের কোন স্থানীয় বাসিন্দা এলে বাদ্যযন্ত্রটি পকেট থেকে বার করে তাদের (শিশুদের খেলা) 'ক্যাটস ক্রেডল' বাজাতে বলা হয়েছিল। খেলার এই প্রতীককে শত্রুকে জয় করার কাজে নির্ভর করা যেত এবং যেখানে পরস্পরের বোধগম্য ভাষার অভাব থাকে, সেখানে বোঝাপড়ার সেতু হিসেবেও কাজ করতে পারে।

প্রাচীন কালের খেলাধুলো আর উৎসব থেকে আধুনিক কালের অলিম্পিক খেলাতে, প্রাচীনকালের টেম্পল (মন্দির) থেকে আধুনিক কালের স্কোয়ার নৃত্যে পুরুষ আর নারী তাদের জটিল প্রবৃত্তি আর আশা আকাঙ্খা প্রকাশের জন্যে অঙ্গভঙ্গীকে কাজে লাগাতে চেয়েছে। বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা, গোলমালের মধ্যে অর্থ খুঁজে বার করাই হয়েছে কলামুদ্রার ন্যায় খেলাধুলোর উদ্দেশ্য। কোন আর্টের মতোই সুস্পষ্ট ভাবে জাতির খেলাধুলোর মধ্যে তাদের উদ্দেশ্য আর জীবনের ব্যাখ্যা প্রকাশ পায়।

তা হলে আমেরিকার খেলাধুলো আর অবসর বিনোদন ব্যবস্থা থেকে কি শিখতে পারি :

খেলাধুলা ও স্পোর্টস

স্কোয়ার নাচ ইউরোপীয় লোকনৃত্য থেকে উদ্ভূত হলেও অনেক দিক দিয়েই খাঁটি আমেরিকান। পল্লীগ্রামে উৎপত্তি, তাই সুরে গ্রাম্যভাব আছে। চার জোরা দম্পতিকে একটা বর্গ হিসেবে গ্রহণ করে, এই নৃত্য পাণিজ দম্পতিকেই একক হিসেবে মেনে নিয়েছে এবং দলীয় সহযোগীতার উপর জোড় দিয়েছে। নৃত্যের দ্রুত আর সহজ ভঙ্গিমার মধ্যে চিন্তা আর গতি মিশে যায়।

স্কোয়ার নাচ সামাজিক মানুষের ছোট্টজগত। এখানে সামাজিক ব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তিই অপরিহার্য্য, সকলের কাজ এক হয়ে সামগ্রিক সৌন্দর্য্য স্থাপিত করে। প্রকৃতপক্ষে স্কোয়ার নৃত্য প্রতীক হিসেবে গোটা সমাজকে রূপায়িত করে।

জোর দেওয়া হয় ব্যক্তির উপর (ব্যক্তিবাদ) এবং পারস্পরিক লাভের জন্যে স্বেচ্ছায় সে যে সমাজে যোগদান করে, তার উপর (স্বেচ্ছাবাদ)। আবার দলটি কয়েকটি বর্গ বা স্কোয়ার দিয়েই গঠিত হয়। সকলেই একই আইন অনুযায়ী পৃথক ভাবে অথচ মিল রেখে কাজ করে (কেন্দ্রীয়বাদ বা ফেডারেলিজম), স্ত্রী-পুরুষের বিরুদ্ধ গতিতে ভারসাম্য রক্ষিত হয়, ওদিকে নৃত্যে মেয়ে আর পুরুষ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। মিলেমিশে যাবার দিকেই থাকে ঝোঁক, আটজন হাতে হাত বেঁধে বৃত্তাকারে নৃত্যের ভিতর দিয়ে যার বাহ্যিক প্রকাশ হয়।

আমাদের প্রধান খেলাগুলোতেও এই পদ্ধতিই প্রকাশ পেয়েছে। দলের মধ্যে ব্যক্তির উপরেই জোর দেওয়া হয়, এই দলই আবার লীগের অন্য দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে।

বেসবল, আমেরিকার একটি প্রতিনিধিমূলক খেলা। এটা নির্ভর করে দলগত সহযোগীতার (টীম ওয়ার্ক) উপর, তবে এখানেও ব্যক্তিগত সাফল্যের পূর্ণ সুযোগ রয়েছে। নির্ভুল খেলা, গতি, সজাগ চক্ষু এবং শক্তিশালী বাহু সাফল্যের হাতিয়ার। আশাতীত সুযোগগুলো কাজে লাগাতে হবে খেলোয়াড়কে, একই সঙ্গে খেলার মাঠে বিভিন্ন দিকে কি হচ্ছে জানতে হবে এবং দ্রুত স্থির করতে হবে কি করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। কারও নির্দেশ ব্যতিরিকেই দলটি মিলে-মিশে খেলে যায়। পারস্পরিক বুঝাপড়া আর সাহায্যের উপরই নির্ভর করে এই খেলা। (এই জন্যেই কি যুদ্ধের সময় আমেরিকার সৈন্যরা সবচেয়ে বেশী সাহসিকতার কাজ করে? না, শত্রু নিধন নয়, দলের অন্য সভ্যদের রক্ষা করার কাজ।)

বাস্কেটবলও নির্ভর করে এই টীমওয়ার্ক, দ্রুত চিন্তা, দ্রুত বল ফিরিয়ে দেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে সুযোগের সদ্ব্যবহারের উপর। (১৮৯৩ সালের কিছু আগে 'মাস'-এর অন্তর্গত স্প্রিংফীল্ড সহরে সর্বপ্রথম সুরু হয় বাস্কেটবল।)

ফুটবলের আমেরিকান সংস্করণের উৎপত্তি ১৮৬৭ সালের পরে। এখানেও টীমওয়ার্ক মাথা আর পায়ের কসরতের মিলিত প্রয়াস, গতি আর নিয়ত ছুটোছুটি। তবে এই খেলায় খেলোয়ারদের শারীরিক বলপ্রয়োগের উপর যেন বেশী জোর দেওয়া হয়। আশেপাশের প্রতীকগুলোতেও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যুদ্ধের উপর—সামরিক বাদ্য, বয়স্কা আর সুন্দরী নারী, প্রাচীনকালের যোদ্ধাদের ছবি, ইজ্জত রক্ষার জন্য তাদের নায়কদের কাছে সমর্থকদের কাতর আবেদন, উৎসাহদানের জন্য বন্য চিৎকার, ঐক্যের প্রতীক হিসেবে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কোন জন্তুর প্রতিকৃতি (কোলাম্বিয়ার সিংহ, প্রিন্সটনের বাঘ) ইত্যাদি।

খেলোয়াড়দের মত দর্শকরাও বুঝি লাভবান হয়। অনেক আগে যখন আইন কানুন বলে কিছু ছিল না অথবা থাকলেও খুব দুর্বল ছিল, তখন অবাস্তব বিচারের উপর নির্ভর না করে কোন দলের সঙ্গে যুক্ত রাখাতেই আমরা নিরাপত্তা অনুভব করতাম। খেলাধূলোতেও এই মনোভাব এসেছে। কোন দক্ষ দলের সমর্থক হয়ে যাই আর আমাদের চারিদিকের হাজার হাজার সেই দলের ভক্ত দর্শকের সঙ্গে মিলে গিয়েছি মনে করি। এইভাবে সমাজের সঙ্গেও আমরা মিশে যাই।

খেয়ালী শখ

নানা ধরণের শখের ইয়ত্তা নেই। অবসর সময় বেড়েই চলেছে আর শখের খেয়াল মিটাতেই তা কেটে যাচ্ছে। পিতৃপুরুষেরা অতীতে যে কাজে গর্ব অনুভব করতেন, আবার সেই কারুশিল্পের দিকে ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। শখের বাগানকরা সদস্যদের সংগঠন আর উৎকৃষ্ট ফুলের প্রদর্শনী প্রাধান্য পাচ্ছে। ডাক টিকিট থেকে বোতাম, ছোট ছোট মূর্তি থেকে অটোগ্রাফ্ সংগ্রহ দারুণ বেড়ে চলেছে। নানা দেশের জীবজন্তু পোষা—যেমন চিনছিলা এবং শ্যামদেশীয় বেড়াল পোষা বিশেষ শখেরই অঙ্গ। নিজে হাতে কাজ করার হাওয়া এমন অনেকের ক্ষেত্রেই সাফল্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে, যারা আগে আর কখনও নিজের হাতে কাজ করেনি। হাতে তৈরী শিল্প থেকে বই, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির ছ'শত কোটি ডলারের নতুন ব্যবসায় সুরু হয়েছে। হি ফি—সুন্দর গ্রামোফোন তৈরী একটা শিল্পবিদ্যায় রূপান্তরিত হয়েছে, অনেক পত্রিকাতেই অনেক যাদুকর, যাদুকরীবিদ্যার মূল সূত্র বাতলে দিচ্ছেন।

প্রতিটি হবির একটা করে ক্লাব আছে। নানাধরণের শখের ভিতর দিয়ে মানুষ নতুন নতুন বন্ধু খুঁজে পাচ্ছে। পাখী দেখে যাঁরা আনন্দ পান, তাঁরা অন্ধকারে কোন নির্দিষ্ট স্থানে মিলিত হচ্ছেন নতুন কিছু পাখীর নমুনা সংগ্রহের আশায়—না, গুলি করে নয়, চোখের দেখা দেখে। রাজপথে একটার পর একটা পুরাতন মোটর গাড়ী: উৎসাহী সভ্যরা কোন ক্লাবের হয়ত আউটিং-এ যাচ্ছে, হয়ত ওদের পরনে পঞ্চাশ বছর আগেকার পোষাক-পরিচ্ছদ, মনে হয় গর্বিত মালিকদের দৌলতে গাড়ীগুলো তাদের পূর্বেকার হৃত গৌরব ফিরে পেয়েছে। গায়কগোষ্ঠী গড়ে ওঠে লোকসঙ্গীত অথবা উচ্চাঙ্গসঙ্গীত

গাইবার জন্যে। লস এনজেলস্‌-এ শুধুমাত্র চিকিৎসকদের দিয়ে গঠিত একটা 'সিমফনি অর্কেষ্ট্রা' আছে।

অভিনেতাদের শখ মেটাবার জন্যে রয়েছে পাড়ায় (কম্যুনিটি) নাট্যাভিনয়। অভিনয় করতে না পারলেও যাঁরা নাট্যরসিক তাঁদের দৃশ্য অথবা পোষাক তৈরীতে দেওয়া হয়। নর্থক্যারোলিনার রোআনোক দ্বীপে প্রতি গ্রীষ্মেই অভিনীত হয় 'দি লষ্ট কলোনী', ওয়েষ্টার্ণ রোডিওতে কাউবয় ড্রামা, আলবুকার্ক ফিয়েস্তা ও তার গণনৃত্য ও গণনাট্য—এই সব সমারোহ আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আরও ঐশ্বর্যশালী করে তুলেছে। কঠোর পরিশ্রম করে যারা দেশকে গড়ে তুলেছে, এখন উপভোগের জন্য তারা কিছু সময় নিচ্ছে।

গ্রামের স্কুলগৃহকে সমাজের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করার রীতি অনেক দিনের। মন্দার সময়ে এই আদর্শ পুনরুজ্জীবিত হয় এবং এর ফলে অনেক পাবলিক স্কুলই এখন সজীব হয়ে উঠেছে। এমন রাত হয়ত যাবেই না যেদিন হাই স্কুলগুলো আলোকিত হয়ে ওঠেনি, কারণ গ্রামবাসীরা স্কুলের দোকানে গিয়ে আসবাবপত্র তৈরী করতে শিখছে, মা-বাবার দল স্কুলের প্রেক্ষাগৃহে শিক্ষক-অভিভাবক সমিতির সভায় মিলিত হচ্ছেন, জিমনাসিয়ামে শিশুর দল রেকর্ডের তালে তালে নাচছে, না হয় লাইব্রেরীতে কোন আলোচনা সভা বসেছে। কোন কোন সহর বেশ বড়, এসবের জন্যে তাদের পৃথক প্রমোদকেন্দ্র থাকে।

তরুণদের আমোদ-প্রমোদের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না বলে উনবিংশ শতাব্দীতে খেলার মাঠের আবির্ভাব হয়। এখন যে কোন সজীব সমাজের পক্ষে খেলাধূলোর মাঠ অপরিহার্য। যেখানে সমাজ অর্থের অভাবে পারেনি, স্বেচ্ছাসেবকের দল এগিয়ে এসেছে এই কাজে। ১৯৫৬ সালে দেখা গেছে ছিয়াত্তর হাজারের অধিক বেতনভুক প্রমোদ কর্মী এই ধরণের কার্যসূচী নিয়ন্ত্রণ করেছেন। এঁদের মধ্যে কেউ আংশিক কর্মী, আবার কেউ বা সর্বক্ষণের।

আর আগেকার মত আনুষ্ঠানিক কাজকর্মের জন্য নয়, পার্কের নক্সা করা হয় এখন তার ব্যবহারিক দিকে লক্ষ্য রেখে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পার্ক হল বিরাট ন্যাশানাল পার্কগুলো, যা মেইন থেকে ওয়াশিংটন রাজ্য বরাবর চলে গেছে। এগুলোতে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষিত হয়েছে, আবার আধুনিক মোটর চলাচলের উপযোগী রাস্তা থাকায় জাতীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবারও ব্যবস্থা আছে। সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ পার্ক ইয়েলোষ্টোনের আয়তন সাড়ে তিন হাজার বর্গমাইল। এর মধ্যে রয়েছে উষ্ণ প্রস্রবণ এবং রঙীন কাদার বুদ্‌বুদের শব্দমুখর পুকুর, হ্রদ,

বন এবং পাহাড়ের অপূর্ব দৃশ্য—যা প্রকৃতির একটি সেরা কীর্তি বলে মনে হয়। ঐতিহাসিক এবং যুদ্ধক্ষেত্রের পার্কসংখ্যা কম হলেও অনেক দুষ্প্রাপ্য স্মরণীয় বস্তুর সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছে—যেমন লিঙ্কনের জন্মস্থান বলে খ্যাত কাঠের ঘরটি, গেটিসবার্গের যুদ্ধক্ষেত্র এবং ভার্জিনিয়ার জেমসটাউনের যে স্থানে সর্বপ্রথম ইংরেজরা বসতি স্থাপন করেছিল।

এ ছাড়া জনসাধারণের জন্য খোলা রয়েছে ১৫০টি ন্যাশানাল বনভূমি যার মধ্যে রয়েছে ৪,৪০০টি শিবির আর পিকনিকের জায়গা, শিকার, মাছ ধরা, স্কিয়িং আর জলক্রিয়ার স্থান। সামান্য খাজনায় জমির লীজ পাওয়া যায় এবং এইসব শ্রান্তিনিবারক বনানীতে গৃহ নির্মাণ করা যেতে পারে। প্রতিটি রাজ্যেরই প্রায় নিজস্ব ঐতিহাসিক মন্দির আর পার্ক আছে, যেখানে শিবির স্থাপনের সুযোগ দেওয়া হয়।

ছুটির দিনে আমেরিকানরা এই সব জায়গাতে এত অধিক সংখ্যক এসে হাজির হয় যে কয়েকটিতে অন্ততঃ আর তিলধারণের স্থানটুকুও থাকে না। ইতিহাসের উৎস দেখার অদম্য উৎসাহ নিয়ে তারা ছেলেদের এগিয়ে দেয় প্লিমাউথ রক, জেফারসনের মন্টিসেলোতে ঘরের ভিতরের বায়ুর গতি নির্দেশক যন্ত্রের পর্য-বেক্ষণে (ইনডোর ওয়েদারভেন) অথবা আল্যামোর দিকে যেখানে ডেভি ক্রকেট যুদ্ধ করে নিহত হন, এসবের খোঁজে। ওয়াকিবহাল যাঁরা, তাঁরা সঙ্গে নিয়ে চলেন সুন্দর 'ষ্টেট গাইড,' মন্দার বাজারে ফেডারেল রাইটার্স প্রজেক্ট যা প্রকাশ করে ছিল। অতীতে আর কখনও ঐতিহাসিক জগতের প্রতি এত আগ্রহ দেখা যায়নি। দেখা যায়নি অতীতকে সংরক্ষণ অথবা পুনর্নির্মাণের এত প্রয়াস। পুরাতন সালেম পুনর্নির্মিত হয়েছে। তারপর পুরাতন উইলিয়াম্‌স বার্গ, পুরাতন ষ্টারব্রিজ এবং এখন পুরাতন প্লিমাউথ পুনর্নির্মিত হল। এই ঝোঁক যদি টিকে থাকে, ইউ-রোপের চেয়েও হয়ত আমাদের "পুরাতন" ঐতিহাসিক দৃশ্য সংখ্যা অধিক হয়ে যাবে।

গরমের ছুটি এখন হাজার হাজার শ্রমিকেরাও চাকরীর সুবিধা হিসেবে ভোগ করেন কখনও যাঁরা আগে এ সময়ে ছুটির মুখই দেখতে পেতেন না। গাড়ীতে করে তাঁরা নিজেদের পরিবারকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠিয়ে দেন, যাতে দেশ আর দেশবাসীদের সঙ্গে তাদের সংযোগ বৃদ্ধি পায়। সব জায়গায় একই কোম্পানীর পেট্রোল, আর সিগারেট ব্যবহার করে জেনে আরাম পায়, প্রাকৃতিক দৃশ্যের উত্তেজনাকর বৈচিত্র্য আর ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হয়। সপরিবারে

ছুটি উপভোগের সামর্থ যাঁদের নেই, তাদের জন্যে আছে উন্মুক্ত আবহাওয়ায় শিবির স্থাপন আর অন্যান্য সহরের বাসিন্দাদের সহযোগীতায় বিনা ভাড়ায় কিছু দিন তাদের বাড়ীতে ছুটি উপভোগ করা।

গতিশীলতা, মনে হয়, সংক্ষিপ্ত পোষাক পরতে এদের উৎসাহিত করেছে। মোটরে লম্বা পাড়ি দেওয়া, শিবিরে থাকা, পার্বত্য নদীতে মাছ ধরা, ভূগর্ভস্থ কারখানায় কাজ করতে হলে মানুষের হাতা গুটনো সার্ট আর নীল জীনের পায়জামা পরতে বাধ্য করে। মেয়েরাও খাট জামা-পায়জামা পরেন এবং এমন কি বড় বড় হোটেলেও লেখা থাকে, "আসুন, ঐ পোষাকেই আসুন।"

বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা পরস্পরকে আপ্যায়ন করে তাদের মধ্যেও আনুষ্ঠানিকতা না থাকাটাই নতুন স্টাইল। চাকরবাকর নেই, বাড়ীর গিন্নী এমনভাবে ব্যবস্থা করেন যাতে খাদ্যদ্রব্য আগে থেকেই রান্না করে রাখা যায়, খাবার ঘরে সে সব গরম করে আনা হয়। 'বুফে' স্টাইলে পরিবেশন করা হয়। কোলের উপর ডিস রেখে অথবা ব্রিজ টেবিলে বৈঠকখানার চারিদিকে ছড়িয়ে বসে অতিথিরা খেতে থাকেন। অনুষ্ঠানের বালাই নেই অথচ অধিক জনপ্রিয় হল 'আউটডোর বারবেক'। নিমন্ত্রণকারী এখানে অ্যাপ্রন পরেন এবং সম্ভবত পাচকের টুপি মাথায় চড়িয়ে দেন, খোলা মাঠে কাঠ কয়লার উনুনে চর্বিওয়ালা হাড় রোস্ট করেন এবং বাগানে খোলা জায়গায় অতিথিদের খাবার পরিবেশন করেন।

পরিবারে একসঙ্গে কাটানোর মত অবসর বেড়ে গেছে। তাই পরিবারসমূহ বাড়ীর ভিতরেই সম্পদ সৃষ্টি করছেন। ছোটখাট হাতের কাজের জন্য পৃথক ঘর কারখানা হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে এটি বাড়ীর অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মনোবিজ্ঞানীদের অনুমোদিত যে সব খেলা ছেলেদের খেলাধুলোয় উন্নত করে তোলে সেগুলোই ছেলেমেয়েদের কাছে হাজির করা হয়। বড় হলে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় নানান ধরণের খেলাধুলো শিখতে, যা স্কুলের কার্যসূচীতে থাকে না—যেমন নাচ, পিয়ানো বাজানো, টেনিস খেলা এমন কি ঘোড়ায় চড়া পর্যন্ত।

মনস্তত্বঃসম্মত বলে বাড়ীতে আর একটা খেলা প্রবেশাধিকার পেয়েছে। এ হল স্বামী-স্ত্রীর খেলাচ্ছলে! প্রীতি বিনিময় সেকেলে বাধানিষেধ আর ভয় বাতিল হয়ে গেছে। স্বীকৃত হয়েছে যে যৌন প্রেমই সুখী পারিবারিক জীবনের ভিত্তি, যৌন প্রবৃত্তি স্বাভাবিক এবং যথোচিত; আধুনিক জীবনের অনেক উত্তেজনা

প্রশমিত হতে পারে হাসি ঠাট্টা থেকে অতিরাগের সকল প্রকারের বাধাহীন পরীক্ষা আর প্রশ্রয়ের মধ্যে।

অবসরপ্রাপ্তদের আনন্দবিধানের, অপেক্ষাকৃত নতুন চাহিদা মেটানোর জন্তে অনেক কার্যক্রমের সূত্রপাত ঘটেছে যা তাদের নতুন কাজ দিচ্ছে এবং সমবয়স্কদের সাথী হিসেবে পাইয়ে দিচ্ছে। দেশের সর্বত্র 'সিনিয়র সিটিজেনস্' অথবা 'গোল্ডেন এজ' সংগঠন গঠিত হয়েছে। সদস্যরা সকল রকমের রুচিসম্মত কার্যসূচী নিজেরাই স্থির করেন—আলোচনা সভা থেকে নাচ অবধি। সারাজীবনের প্রতিযোগীতামূলক ঘাতপ্রতিঘাতের পর বিনা পারিশ্রমিকে সমাজসেবায় আনন্দ পান অনেক অবসরপ্রাপ্ত পদস্থ কর্মচারী। স্কুলবোর্ড অথবা অন্ত কোন নাগরিক সংগঠনের সদস্য হন তাঁরা। এখন পয়ষট্টি বছরে কর্ম হতে অবসর গ্রহণ আবশ্যিক; অথচ মানুষের আয়ু বেড়ে গেছে, ফলে জাতি মূল্যবান সম্পদ পেয়েছে।

আমরা যে কার্যক্রমের কথা এতক্ষণ বলেছি, সেই রকম সকল প্রমোদসূচীই কাজের নয়। নেভাডায় লাস ভেগাস দেশের জুয়াখেলার রাজধানী; ১৯৫৫ সালে সেখানে আমেরিকানরা (এবং কিছু বিদেশী) ৬০,৩২০,০০০ টাকা দিয়ে জুয়া খেলেছে। টাকা নষ্ট করার এই প্রতিযোগীতায় প্রত্যহ যোগ দিয়েছেন ৩,৮৬১ জন। ১৯৫২ সালে তামাকের পিছনে দেশকে ৫-৩ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে হয়েছে। মদে ব্যয়িত হয়েছে এর দ্বিগুন।

কিসের জন্য অবসর ?

অবসর যাপনের বৈচিত্রের পিছনে রয়েছে শ্রমের ফল উপভোগের, অর্জিত অর্থের বিনিময়ে বৈষয়িক নয় এমন কিছু লাভের সংকল্প। তাই প্রতিদিনের দীর্ঘপথ মোটর চালনার পর তাঁরা অবসর উপভোগ করতে চায়—যেন অন্ত কোন নতুন দেশ জয় করবে।

সকল আনন্দবিনোদনের মূলে রয়েছে সৃষ্টি। অতীতে আমেরিকানরা তাদের কথায় আর কাজে এই সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছে। কাজও ছিল আনন্দের, আহার্য আর পানীয়ের মতো। পরিশ্রমের ফলে যে প্রাচুর্য এসেছে তা থেকেই দেখা দিয়েছে উৎপাদিত দ্রব্যের ভোগের প্রয়োজনীয়তা, উৎপাদনে অল্প আর ভোগে অধিক সময় ব্যয়ের দাবী। এই মৌলিক পরিবর্তন দৃষ্টিভঙ্গী পালটে দিয়েছে। আগে কাজের মধ্যে যে নীতি চরিতার্থ হোত, এখন হাসি

তামাসার মধ্যেও সেই নীতিবোধ খুঁজে পাচ্ছে আমেরিকানরা। এখনও এই ব্যাপারে সে মন স্থির করতে পারে নি। অন্যান্য সব-কিছুর মত, অবসর-যাপনের পদ্ধতিও শিখতে হবে।

শিল্পবাদ কলা আর কারুশিল্পকে আঘাত দেয়, আমেরিকা ইতিমধ্যেই তা হজম করে ফেলেছে। কারিগরী বিদ্যা লক্ষ মানুষের কাছে নাটকের আবেদন পৌঁছে দেবার মাধ্যমের ব্যবস্থা করতে পারে, আবার আর্ট এবং শিল্প একে অন্যের ক্ষেত্রে এসে গেছে। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা মানুষকে দীর্ঘদিনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছে আর শিল্প তাকে কারুশিল্পের ঐতিহ্য ফিরিয়ে দিয়েছে। পাইয়ে দিয়েছে সৃজনশীল অবসর, যা আগে উৎসব আর আর্টের সৃষ্টি করত। তাই অনেক পথ ঘুরে মানুষ আবার তার খেলাধুলো আর ব্যক্তিগত সৃষ্টির ঐতিহ্যে ফিরে যাবে। যে শক্তি তাকে লৌহ নিগড়ে বেঁধে রেখেছিল অবশেষে তাই মানুষকে মুক্তি দিল। কারিগরী শাস্ত্রের এই হল উত্তেজনাকর প্রতিশ্রুতি। বৈষয়িক সুযোগসুবিধা দেখা দিতেই, আমরা বৈষয়িক জীবন থেকে সৃষ্টিধর্মী জীবনে পৌঁছুবার সুযোগ পাব।

বৃত্তাকারে জীবন অতিক্রম করে আবার আমরা ইডেনের উদ্যানে ফিরে এসেছি। কে বলবে এই পরিক্রমা অর্থহীন হয়েছে?

বিজ্ঞান ও মানুষ

আমেরিকান রিপাবলিক যে যুগে জন্ম নিয়েছে, সে যুগকে যুক্তিবাদীর যুগ বলতে পারেন। এ যুগে বিজ্ঞান আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নতুন জীবনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে। সামাজিক জীবনে শক্তির উৎস হিসেবে আমেরিকা চিরদিনই বিজ্ঞানের উপর ভরসা রেখেছে। বেন ফ্রাঙ্কলিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর টমাস জেফারসনের সর্বাধুনিক শিল্পপণ্যের উদ্ভাবন থেকেই মার্কিন পরিকল্পনায় বিজ্ঞান তার স্থান করে নিয়েছে—শুধুমাত্র দুর্বোধ্য অথবা কৌতুহলদ্দীপক বিষয় হিসেবে নয়, সাধারণ মানুষের ভৃত্য হিসেবে, সৃজনী শক্তি হিসেবে যা উৎপাদন বৃদ্ধি আর সকলের মধ্যে সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারণ করে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যা অপরিহার্য অঙ্গ। দ্রুত চলাচল ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিবিধ ব্যবস্থার দরুণ বিজ্ঞান থেকে আমরা পেয়েছি বসবাস করবার জন্যে প্রশস্ততর দুনিয়া এবং আমাদের আগ্রহ ও দায়িত্ব দুইই বৃদ্ধি পেয়েছে; আনন্দদানকারী আর্টকে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে, নারী পুরুষের ভূমিকা পালটে দিয়েছে এবং দ্রুত রূপান্তর ক্ষমতার দরুন দুনিয়াকে এত দ্রুত পুনর্নির্মাণ করছে যে আমাদের ছেলেমেয়েদের সব সময়েই সে সব ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে আমাদের কাছে।

বিজ্ঞান মানুষের আয়ু বাড়িয়েছে এবং শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে দিয়েছে, তাই সমাজে বৃদ্ধ আর যুবার হারও পালটে গেছে। শিশুর জন্ম এখন মা-বাবার মর্জির উপর নির্ভর করে, তাই আর বোঝা নয়, বরং সুখের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক অসুখের হাত থেকে রেহাই দিয়েছে, অনেক রোগের প্রতিশেধক ঔষধ বার করেছে এবং রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছে। সকলকে পর্য্যাপ্ত আহার্য কি করে দিতে হয় জানে এবং পদাঘাতে যেমন উইয়ের ঢিপি বিনষ্ট হয়, সেই রকম যখন খুশী মনুষ্য সমাজকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলে দিতে পারে।

যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে সভ্যতাকে বর্তমান স্তরে এনেছে বিজ্ঞানই। এর মূল তত্ত্বগুলো একবার গবেষণাগারে যাচাই করা হয়ে গেলেই নিত্য প্রয়োজনীয় কাজে এবং ভোগ্যপণ্য প্রস্তুতের কাজে লাগে। বিশুদ্ধ গবেষণা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে সমগ্র জগত, যা আশাতীত ভাবে আমাদের নাইলন অথবা প্লাষ্টিকের মত পণ্যের দিকে টেনে নিচ্ছে।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক মনোভাব এবং বিজ্ঞান চর্চার অভ্যাসের গুরুত্বও সমানভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ সমস্যা সমাধানে নির্ভুল পথ হিসেবে বিজ্ঞান স্বীকৃতি পেয়েছে ; শুধু বৈষয়িক জগতের সমস্যা নয়, মানুষের নিজস্ব সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রেও। কুসংস্কার এবং অন্ধ বিশ্বাসের বিকল্প কিছু পাওয়া যায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি থেকেই। বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনী এত কার্যকরী যে বিজ্ঞাপনদাতারা অকাট যুক্তি হিসেবে লুফে নেয় বৈজ্ঞানিক যুক্তিগুলি—"পাঁচজনের মধ্যে চারজন চিকিৎসকই একমত যে...; যে গাড়ী ইঞ্জিনিয়াররা পছন্দ করেন সেই গাড়ী কিনুন।"

আধুনিক জগতে বিজ্ঞানের এই ভূমিকার কথা উপলব্ধি করে ১৯৫০ সালে কংগ্রেস "ন্যাশানাল সাইয়েন্স ফাউণ্ডেশনের" সৃষ্টি করে মৌলিক গবেষণা এবং বিজ্ঞান চর্চা সম্পর্কে জাতীয় নীতি নির্ধারণ ও অনুসরণ করে এবং "সাধারণের কল্যাণে গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করবার জন্য।" নীতি নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে সক্রিয় নেতৃত্ব নিতে না পারার জন্য সমালোচনা হলেও, স্বীকার করতে হবে যে ফাউণ্ডেশন কতকগুলি উল্লেখযোগ্য নীতি নির্দ্ধারণ করেছেন—যেমন যেখানে সম্ভব ফলিত বিজ্ঞান নয়, মূল বিজ্ঞানকে সমর্থন করতে হবে, মাধ্যমিকশিক্ষার স্কুলগুলিতে বিজ্ঞান চর্চাকে আরও বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির কাজে লাগাতে হবে এবং গোপন গবেষণাকে নয়, অন্য সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক চর্চাকে উৎসাহ দিতে হবে।

বিজ্ঞান ও সমাজ-সংস্কার

বাড়ীর পিছনের গ্যারেজের মেকানিকের মত আমেরিকানরাও সব সময়ে সমাজকে মেরামত করে চলেছে, আশা করছে আরও ভাল করা যাবে। সংস্কৃতির একটা উৎসাহজনক বিষয় হল তার বাস্তবতাবোধের উচ্চস্তর, বিজ্ঞান ভিত্তিক সমালোচনার মনোভাব। স্বার্থবুদ্ধি অথবা সঙ্কীর্ণ স্বার্থ জয়ী হলেও, স্বীকার করা হয় যে, বৈজ্ঞানিক প্রমাণই সবচেয়ে অকাট্য যুক্তি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাকেই মেনে নেওয়া উচিত।

সমগ্র দেশটাই জন্ম নিয়েছে সপ্তদশ শতাব্দীর তৎকালীন ইউরোপীয় সমাজের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে! বিদ্রোহভিত্তিক সংস্কার তাই মার্কিন সমাজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট হিসেবে দেখা দিয়েছে। তবে এ সংস্কারের পিছনে বিশ্বাসও আছে—বিশ্বাস আছে সর্বাগ্রে ঈশ্বর, তারপর মনের প্রগতিতে;

আজকের মার্কিন সংস্কারের বৈশিষ্ট হল তার ধর্ম আর নীতিবোধ, পর্যবেক্ষকদের মধ্যে যাদের কান মার্কস আর লেনিনের দিকে খাড়া থাকে, তাঁরা সংস্কারের মার্কিন পদ্ধতিকে স্বীকার করেন না অথবা স্বীকার করলেও ইচ্ছামত সন্দেহ প্রকাশ করেন।

সামাজিক দুর্নীতির প্রতিবাদ এবং সংস্কার বিষয়ক আমেরিকার বিরাট সাহিত্যের কথা বাইরের খুব কম লোকেই জানেন। এর সূত্রপাত সেই গোড়ার দিকে, এদেশে লিখিত সর্বপ্রথম ইংরেজী বই উইলিয়াম ব্রাডফোর্ড-এর "অফ প্লিমথ প্লানটেশন" পড়লেই বোঝা যাবে। সেই সাহিত্যের গতিধারা এগিয়ে চলেছে।' ঔপনিবেশিক সময় থেকে জেফারসন, উইলিয়ম লয়েড গ্যারিসন, সুসান বি অ্যানথনি, ডেমারেষ্ট লয়েড এবং সামাজিক সুসমাচারের অন্যান্য প্রাক্তনদের লিখিত পুস্তকাদিতেও কাজ, দাসপ্রথার বিলুপ্তি, আন্বিকবাদ, সমাজবাদ, তুরীয়বাদ প্রভৃতি অষ্টাদশ শতাব্দীর চল্লিশ দশকের সকল সংস্কারবাদী আন্দোলন নিয়ে লিখিত পুস্তকাবলীতে একটি শতাব্দার নোংরামির কাহিনীও পাওয়া যাবে।

ব্রাইয়ান আর টেডি রুজভেল্ট থেকে উইলসন আর লাফোলেট, অতঃপর নিউ ডীল এবং তারপর বিস্ময়করভাবে বলতে হবে, আইসেনহাওয়ার পর্যন্ত সংস্কারনীতি আগাগোড়া রাজনীতিকে প্রভাবান্বিত করেছে। এখন একথা সুস্পষ্ট যে রক্ষণশীলদের দল তাদের সামাজিক সুসমাচারকে মেনে নিয়েছে—কয়েকজন সদস্য এই ঘনিষ্ঠ সংযোগে নাক সিঁটকালেও। পপুলিষ্ট, সোশ্যালিষ্ট, প্রগতিবাদী, সংস্কারবাদী গোষ্ঠী থেকে যে প্রস্তাবই আসুক না কেন, আজ অথবা কাল তা আইনের স্বীকৃতি পাবেই।

যে দুটো স্বতঃসিদ্ধ যুক্তির থেকে এই প্রতিবাদ আর সংস্কারবাদী আন্দোলনের শক্তির উৎস, তা হল মানুষের যুক্তি আর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যা জীবনযাত্রার মান নিরন্ত উন্নত করে। এই হল আমেরিকার প্রামাণ্য মতবাদ, দুটো বড় পার্টি কথায় আর কাজে যাকে স্বীকার করে। সাম্প্রতিককালে এই দুটো পার্টি এবং মার্কিন জনগণ উপলব্ধি করেছে যে বিশ্বের সর্বত্র এই জ্ঞানকে পরিব্যাপ্ত করার মধ্যেই নিহিত আছে তাঁদের কল্যাণ।

গোঁড়ানীতিবাদীদের প্রতিবাদের সঙ্গে যুক্তিবাদীদের মিলন, খ্রীষ্টধর্মের সামাজিক বাণী আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উন্নয়ন যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞানকে মানুষকে উন্নত করবার যন্ত্রে পরিণত করেছে। জেমস টাউন আর প্লিমাউথ থেকে ব্রুক ফার্ম

আর ও নিভা কম্যুনিটি, বাইবেল কমনওয়েলথ থেকে বিভিন্ন জাতির গৃহ নির্মাণ—এ দেশে সমস্ত ব্যাপারেই সামাজিক পরীক্ষা-নীরিক্ষার শেষ নেই। জনমানবহীন পরিত্যক্ত বনভূমিতে গড়ে ওঠা নতুন বসতি প্রায়শঃই কোন না কোন বিশেষ কার্যস্ূচী নিয়েছে,যেমন জন জে শিফার্ড ওহিও'র ওবারলিনে তাঁর গঠিত সমাজের আস্তানা পাতলেন একটা স্কুলের চতুর্দিকে, যা সেখানকার তরুণদের সুসমাচার অনুযায়ী কাজ করতে শেখাবে আর সমগ্র নতুন অধ্যুষিত বনভূমিতে সকলের সঙ্গে ভাগ করে বসবাস করার ওবারলিন সামাজিক নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য করাবে।

এই সকল সমাজ ছিল এক একটা সামাজিক গবেষণাগার। পরে সমাজবিজ্ঞানীরা এই সব সমাজ নিয়ে যে চর্চা করেন, তার উদ্দেশ্য ছিল সাফল্য আর ব্যর্থতার কারণ খুঁজে বার করা। এর মধ্যে বিশেষ পরিচিত হল রবার্ট, আর, হেলেন লিণ্ড-এর মিডেলটাউন সম্পর্কিত চর্চা। এই বই লেখার আগে সামাজিক বসতি সম্পর্কে যে চর্চা হয় তাতে দরিদ্র প্রতিবেশী পল্লীর সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত ছিল। এর পর এই ধরণের সামাজিক চর্চার বন্যা বয়ে যায় ; তার মধ্যে সর্বাধিক প্রসারলাভ করেছে ডবলু্ লয়েড ওয়ারনার ও তাঁর সঙ্গীদের 'ইয়াঙ্কি সিটি' পরিকল্পনা।

বহু তথ্য থেকে সমাজবিজ্ঞানীরা মানুষের আচরণ, তাদের সমাজ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিচিত্র জ্ঞান লাভ করেছেন। জীববিজ্ঞানী যেভাবে নিস্পৃহভাবে দূরবীক্ষণ যন্ত্রে জীবকোষ অথবা পদার্থবিজ্ঞানী যেভাবে অনুপরীক্ষা করেন, সেইরকম ভাবেই এঁরা মানুষের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছেন। কি ভাবে সামাজিক আচরণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করতে হয় এবং কিভাবে সামাজিক অন্যায় এড়িয়ে চলতে হয় অথবা সংশোধন করতে হয়, তা শিখে ফেলেছেন এরা।

ডারউইন আর ফ্রয়েডের সিদ্ধান্তসমূহের ন্যায় এই নীতিগুলোও গণচেতনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানের নীতিগুলো সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানের অংশ হিসেবে প্রতিভাত হতেই, সামাজিক ন্যায়বিচার বিধানের অপ্রতিহত গতি নিশ্চিত হয়েছে। কারণ যখন বুঝতে পারেনি, তখনও মানুষ বিজ্ঞানের ঐন্দ্রজালিক কৃতিত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। বিজ্ঞান এত কাজে লেগেছে যে তার প্রমাণিত সকল সাফল্যই আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রত এই নতুন বিজ্ঞানকে সহজে সমর্থন জানাতে পারল। সমাজবিজ্ঞানের দুষ্ট ক্ষতগুলি হয়ত অস্ত্রোপচার

করে বাদ দিতে হবে নয়ত অন্যভাবে তার প্রতিবিধান করতে হবে। চিকিৎসক যেমন শুধু অসুখ নির্ধারণই করেন না, রোগীকে ভালও করেন, সেইরকম সমাজ চিকিৎসকও বর্ণ-বৈষম্য, শিশু অপরাধ এবং পারিবারিক সমস্যা সমাধান সম্পর্কে তাঁর মতামত ও পরিশোধকসূচী জানান।

এ কাজ সুরু হয়েছিল সামাজিক চাহিদা নির্ণয় সম্পর্কিত সমাজসমীক্ষা থেকে। যেমন ধরুন সাউথ ক্যারোলিয়ার গ্রীণভ্যালিতে নিগ্রো বাসিন্দাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটান এক বিরাট সমস্যা। একে সকলের সমস্যা হিসাব ধরে নিয়ে কমিউনিটি কাউন্সিল আমেরিকান আর নিগ্রো নেতাদের নিয়ে সকল ধরণের মতবাদের প্রতিনিধিত্বমূলক একটি কমিটি গঠন করলেন। বারটা তথ্যানুসন্ধান কমিটির কাজ সুরু হল। গৃহ সমস্যা থেকে বেকার সমস্যা সব কিছুরই তথ্য চাই। প্রতিটি কমিটির উপরে দুজন চেয়ারম্যান; একজন শ্বেতাঙ্গ, অপরজন কৃষ্ণাঙ্গ। সমীক্ষায় অংশ নিলেন দুইশত ব্যক্তি; গৃহস্থবধূরা প্রতিবেশীকে প্রশ্ন করলেন, মন্ত্রীরা সাধারণ বাসে বেরুলেন, মানুষ কি রকম ব্যবহার করে দেখতে।

গ্রীণভেলীতে যখন তথ্যানুসন্ধান সম্পূর্ণ হোল, গৃহনির্মাণ ও বস্তি অপসারণের কাজ তখন আরম্ভ হয়ে গেছে। এখানেই সর্বপ্রথম নিগ্রো ডাক্তারদের আমন্ত্রণ জানান হল চিকিৎসকদের সামাজিক সভায়। সম্ভবতঃ সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা কমিটিতে নিগ্রোদের শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে একত্রে কাজ করা, সেও সামাজিক অগ্রগতিরই নিদর্শন। সমস্যা নির্ধারণ এবং সমস্যা বিশ্লেষণ, আর পরে তার সমাধানে সহযোগীতার এই সমীক্ষা, জন ডিউই গণতন্ত্র সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা করেছিলেন, তার উপলব্ধি থেকেই উদ্ভূত। তিনি বলেছিলেন, গণতন্ত্র এমন এক ব্যবস্থা, যেখানে পরীক্ষামূলক পদ্ধতিগুলো প্রযুক্ত হবে স্বাধীনতার প্রয়োজনে মানুষের শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্যে; এ স্বাধীনতা সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে সহযোগীতা করবে আর এ সহযোগীতা হবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত।

গোড়া থেকেই সমাজকে উন্নত করার আদর্শ আমেরিকানদের পেয়ে বসে। এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্যে সব রকমের সমাজ সেবার আশ্রয়ই নেওয়া হয়েছে—আমোদ-প্রমোদ, বা পরিবার সেবাকেন্দ্র, মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সমাজসেবিকা, শিশুকল্যাণকেন্দ্র, অপত্যস্নেহে শিশুর লালন পালন, কর্মসংস্থানকেন্দ্র, বয় ও গার্ল স্কাউট, বয়স্ক এবং অসহায় শিশুদের যত্ন বিধান। এই সকল সেবামূলক কাজের জন্য চাঁদা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কুড়ি লক্ষেরও অধিক পুরুষ আর নারী কী বছর ঘরে ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং কমিউনিটি

চেষ্ট ও কমিউনিটি কাউনসিলগুলোকে চালু রাখবার জন্যে প্রয়োজনীয় তিরিশ কোটি ডলার আদায় করে। এই ধরণের স্বেচ্ছামূলক কাজে তারা লক্ষ লক্ষ ঘন্টা ব্যয় করে, যেমন হাসপাতালকে সাহায্য অথবা স্কাউট মাষ্টারের কাজ। পয়সা দিয়ে সমাজকে উন্নত করা যায় না। সরকারও একাজ পারেন না। সকলে সময় এবং পরিশ্রম দান করলেই একাজ সফল হতে পারে।

সমাজবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলোকে সমাজের সকল স্তরে কাজে লাগান হচ্ছে। ধর্মযাজক ধর্মোপদেশ দেবার সময় এগুলো কাজে লাগান। ছাত্রদের কার্যক্রম নির্দেশক নীতি নির্ধারণে, ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত প্রয়োজন সম্পর্কে বিবেচনার সময় স্কুলও এর সাহায্য নেয়। কর্মচারীদের ক্ষেত্রে শিল্পপতিরা মালিক-শ্রমিক জনসাধারণের মধুর ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য এর সাহায্য নেন। জন-সাধারণের অভিমত সম্পর্কে ভোটের সাহায্যে মতামতের আয়োজন করে হলিউড জানতে পারে, সাধারণ মানুষ কি চায়। বিজ্ঞাপনদাতারাও এই ভাবে জেনে নেন কোন ধরণের পণ্য ক্রেতারা চায়।

আন্তর্ব্যক্তিক (interpersonal) সম্পর্ক বজায় রাখার টেকনিক চর্চার মাধ্যমে কি করে গোষ্ঠী ও কমিটির কাজ সুষ্ঠুভাবে হতে পারে তার পদ্ধতি বার করা হয়। এভাবে সমাজবিজ্ঞান প্রয়োজনীয় যন্ত্রে পরিণত হয়েছে, যার মূল্য নির্ভর করে ব্যব-হারের উপর। ডিনামাইট নতুন রাস্তার জন্য পথ পরিস্কার করতে পারে, আবার নিরীহ কোন অসহায়কে ধ্বংসও করতে পারে। মহান কাজে যেমন, নীচ কাজেও সেই রকম অর্থ ব্যবহৃত হতে পারে। এমন কি ধর্মও বৈষম্য আর ঘৃণাকে জোরদার করার কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। তাই সামাজবিজ্ঞানের যন্ত্রগুলো বিবেকহীনের হাতে গিয়ে পড়লে, তিনি কর্মচারীদের মালিকের খেয়াল-খুশীমত চালাতে পারেন, জনমত প্রভাবিত করতে পারেন, বাণিজ্যিক অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আবেগসৃষ্টি অথবা তাকে কাজে লাগাতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে মানুষের উন্নতি করার কাজে লাগানোর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল টেলিভিশন, যার কারিগরী কৃতিত্বের কথা আগেই বলা হয়েছে। আরও উল্লেখযোগ্য হল সামাজিক ক্ষেত্রে এর কৃতিত্ব। বিরুদ্ধভাবাপন্ন সমাজগোষ্ঠীর উপর জোর করে কার্যসূচী না চাপিয়ে, সহিষ্ণুতার সঙ্গে টেলিভিশন কাজ করে সামাজিক বুঝাপড়া আর আগ্রহ সৃষ্টির জন্য। কর্মকর্তারা গাঁয়ে চাষীদের কাছে গেছেন সাক্ষাৎকারের জন্যে, ছোট ছোট দলে তাদের আহ্বান জানিয়েছেন গ্রামের স্কুলে, সহযোগীতায় সঙ্গে কাজ করে কি করা সম্ভব তা

বুঝিয়ে বলেছেন। আস্তে আস্তে বিশ্বাস দানা বেঁধে উঠল। চাষবাসের পদ্ধতি পালটে গেল। সামাজিক মনোভাব গড়ে উঠল। স্বাস্থ্যরক্ষার সুব্যবস্থা, ঘর বাড়ী, স্কুল আর আমোদ প্রমোদের ভাল ব্যবস্থা এল পরে। সরকার তার কর্মক্ষমতা জনগণের হাতে পৌঁছে দিলেন, জোর করে কিছু চাপান হল না। স্বেচ্ছামূলক সহযোগীতার জন্য অপেক্ষা করা হল, কারণ স্বতঃস্ফূর্ত যে পরিবর্তন, সেই হোল নিশ্চিত আর স্থায়ী পরিবর্তন।

নতুন সীমান্ত

চিকিৎসাবিজ্ঞান অস্ত্রের উপাঙ্গ সরিয়ে ফেলতে পারেন, পা জুড়ে দিতে অথবা পোলিও জয় করতে পারেন। কৃষিবিজ্ঞান যে পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হলে বুভুক্ষাকে নির্বাসন দেওয়া যায়, স্বল্প ব্যয়ে তা তৈরী করতে পারে। কিন্তু এ হল জীবনসংগ্রামের অর্ধেকটা মাত্র। জীবাণু, বীজাণু অথবা বিষে যত লোক আক্রান্ত হন, তার চেয়ে অনেক বেশী পড়েন উত্তেজনা, বিরোধ, প্রতিযোগীতা আর জীবিকা আহরণের সমস্যার খপ্পরে।

তাই প্রকৃতি আর সমাজবিজ্ঞান এখন এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এসেছে ডাক্তার ডেকে পাঠান মনোবিজ্ঞানীকে। ভারতবর্ষ অথবা থাইল্যাণ্ডের কোন গ্রামে নতুন পদ্ধতি কার্যকরী করতে গিয়ে কৃষিবিজ্ঞানী হয়ত নরদেহবিজ্ঞানীর সাহায্য নেন। কৃষি-বিজ্ঞানী এ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চান যে তিনি প্রচলিত কোন বাধানিষেধ অমান্য করেন নি এবং তার কার্য্যসূচী স্থানীয় রুচিসম্মত হয়েছে। শিল্পপতি নতুন যন্ত্র কাজে লাগানোর আগে সযত্নে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধীয় পরামর্শদাতাদের, তারপর পদস্থ কর্মচারী এবং পরে ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে সে-যন্ত্র বসানোর পথ সুগম করেন।

যে সব সমস্যার সমাধানের যুগপৎ যৌথআক্রমণ দরকার, সমাজ ও প্রকৃতি-বিজ্ঞান সে সব দিকে একই সঙ্গে শুধু এগিয়েই যাচ্ছে না, একে অন্যের ক্ষেত্রে প্রবেশও করছে। একদা পদার্থ আর জীববিজ্ঞানের যে ব্যবধানও ছিল, আজ জীব পদার্থ-বিজ্ঞান ও জীব রাসায়নিক বিজ্ঞান তা ঘুচিয়ে দিয়েছে। একই ভাবে জীববিদ্যা আর সমাজবিজ্ঞানের ব্যবধানও দূর হচ্ছে। জীবের কার্যপ্রণালী বিষয়ক রাসায়নশাস্ত্র যেমন বুঝতে পারা যাচ্ছে, সেইরকম সামাজিক আচরণের জৈবিকভিত্তিও সুস্পষ্ট হচ্ছে। হারিয়ে যাওয়া সংযোগ একবার দুটোকে একত্রিত করতে পারলে, এমন কি, রাসায়নিকপদ্ধতিতে মানুষের মতিগতি এবং সামাজিক

অগ্রগতিও নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। এখনই এমন সময় এসেছে যখন মানুষ সকালবেলায় দাঁত মেজে ঔষধের দোকান থেকে প্রয়োজনানুসারে খেলাধূলায় শারিরীক পরিশ্রমের জন্য অথবা গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাবার পূর্বে মানসিক শক্তিবৃদ্ধির জন্য—'এনার্জি পিল' বা 'উৎসাহজনিত শক্তি-বর্ধক ঔষধ' খেতে পারে।

'সাইবারনেটিকস'-এর কাজ হল সংবাদসমূহকে যন্ত্র আর সমাজকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার চর্চা করা।* এই যে হঠাৎ "আর সমাজকে" কথাটা জুড়ে দেওয়া হল, এ থেকেই বোঝা যাবে আমরা সভ্যতার যন্ত্রীকরণ অথবা যন্ত্রের সমাজীকরণের দিকে কতটা এগিয়েছি। নরবার্ট উইনার সংবাদবিজ্ঞান (সায়েন্স অব মেসেজেস) বলতে শুধু ভাষা, যোগাযোগের মাধ্যম আর কমপিউটিং মেশিনই (গণনা যন্ত্র) নয়, সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে এমন সাংকেতিক বিনিময় সহায়ক সব কিছুই বুঝেছেন। তাঁর বিশ্বাস সমাজকে সেবা করে এমন সব বানী (মেসেজ) চর্চা করলেই শুধু সমাজকে বোঝা যায়, আর এই বাণীর ভবিষ্যৎধারা হবে সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য, কারণ একদা যে কাজকে একমাত্র মানুষের পক্ষে সম্ভব মনে হত, আস্তে আস্তে যন্ত্র তা সম্পাদন করছে।

ইতিমধ্যেই একাজ সুরু হয়েছে। কমপিউটিং মেশিন বা "ইলেকট্রোনিক ব্রেনের"দ্বারা আগে যে কাজে বছরের পর বছর ব্যয়িত হত, এখন তা কয়েক মুহূর্তে সম্পাদিত হচ্ছে। আগে ভুলের সম্ভাবনা ছিল, এখন তাও নেই। এমন ব্যবস্থা হচ্ছে যাতে গ্রন্থাগারের কোন একটি বিষয়ের উপর যাবতীয় তথ্য তক্ষুনি পাওয়া যেতে পারে। এমন যন্ত্রও উদ্ভাবিত হয়েছে, যা এক ভাষার বইকে আর এক ভাষায় অনুবাদ করে দিতে পারে। শুধু শারীরিক পরিশ্রমই নয়, মানুষকে সারা জীবনের মানসিক দুশ্চিন্তার হাত থেকেও পরিত্রাণ দেবে যন্ত্র; সৃজনী-শক্তির পূর্ণ প্রয়োগের যুগ মানুষের হাতের মুঠোয় পৌঁছে গেছে।

গণতন্ত্র বিজ্ঞান

গণতান্ত্রিক দর্শন গণতান্ত্রিক সমাজের চাহিদা মেটাতে প্রযুক্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই হল প্রয়োগবাদ (প্রাগম্যাটিজম)। এতে জোর দিয়ে এই কথাটাই বলা হয় যে কোন কাজের ফলাফল বিচার করেই ভালমন্দ আর সত্যঅসত্যের তারতম্য বোঝা যায়, বিশুদ্ধ নীতির বদ্ধ পদ্ধতি আঁকড়ে থেকে নয়। জগতটা

* নরবার্ট: দি হিউম্যান ইউজ অব হিউম্যান বিইংস।

একটা নির্ধারিত ব্যবস্থার অংশ বিশেষ, যে ব্যবস্থায় প্রথম নীতিটি যদি একবার আবিষ্কার করা হয়, তাহলে সকল সমস্যার সমাধান করতে পারবে—অধিকাংশ দর্শনই এই নীতি নির্বোধের মত মেনে নিয়েছে। প্রয়োগবাদে বিশ্বাসী মানুষ দুনিয়াকে দেখছেন নিত্য পরিবর্তনশীল বস্তু হিসেবে, যেখানে অন্ধ বিশ্বাস এবং চরম সত্য সম্পর্কে প্রবঞ্চনা শুধু ক্ষতিই করতে পারে।

প্রয়োগবাদের ব্যাখ্যাকারী উইলিয়মই 'প্রাগমেটিজম' এই নামকরণ করেন। যুগ যুগ ধরে অস্পষ্ট অবাস্তব নীতির মধ্য দিয়ে যে দার্শনিক বিরোধ চলেছে তার অবসান ঘটিয়ে তিনি জোর করে বললেন যে, যে কোন সিদ্ধান্তের সত্য-মিথ্যা প্রমাণিত হয় মানুষের এই পৃথিবীতে তার বাস্তব প্রতিক্রিয়া থেকে। প্রয়োগবাদী ব্যবস্থা অনন্ত অধিবিদ্যক বিরোধ মিটিয়ে দিল তাদের উপযোগীতা প্রমাণের পরীক্ষার ছাঁচে ফেলে দিয়ে। জেম্‌স বলেছেন, "বিশ্বাসের দিক থেকে এবং নির্দিষ্ট যুক্তির ব্যাখ্যায় যা কিছু ভাল বলে প্রমাণিত হয় তার নামই 'সত্যি'।"

কারণবাদ (ইনষ্ট্রুমেন্টালিজম) এর প্রবর্তক জন ডিউই-ই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঙ্গে দর্শনের মিলন ঘটালেন এবং দুনিয়ার দৈনন্দিন কাজে লাগালেন সে পদ্ধতি। তিান জোর দিয়ে বলেছেন লক্ষ্যের মূল্যায়নের একমাত্র পথ হল প্রতিটি লক্ষ্যের জন্য নির্ধারিত পন্থা প্রয়োগ করলে কি ফল পাওয়া যাবে তা দেখা। পন্থা, লক্ষ্যেরই অংশ বিশেষ। কি পছন্দ করেছি তা আমরা ততক্ষণ জানিনা, যতক্ষণ না জানতে পারি এই পছন্দের ফলে কি ঘটবে। কোন ভাবাদর্শের প্রতি আনুগত্য তাদের ফলাফল বিচার করা থেকে মুক্তি দেয় না আমাদের।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের পথে সমাজ পুনর্গঠনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় ডিউই যখন ব্যস্ত, অলিভার ওয়েনডেল হোমস আইন ক্ষেত্রে আর একটা আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন, যা বাস্তববাদ নামে পরিচিত হয়েছে। আইনকে অবাস্তব অথবা (অ্যাবসট্রাকট) স্বত্বা হিসেবে দেখলে চলবে না, আইন মানুষের পরিবর্তনশীল চাহিদা সৃষ্টির যন্ত্র এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে চলেছে।

জেমস হারভে রবিনসন শিখিয়েছেন যে, ইতিহাস শুধু অতীত ঘটনার বিবরণ নয়। ইতিহাসও একটা যন্ত্র যার মধ্য দিয়ে বর্তমানকে বোঝা যায় এবং ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করা যায়। তাই সামাজিক পরিবর্তনে ইতিহাস সহায়কের ভূমিকা নিল। ডিউই ও রবিনসন এবং তাঁদের অনুগামীরা বিশ্বাস করতেন যে, শিল্পবিপ্লব যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম দিয়েছে তা রাজনীতিতেও এসে পড়বে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলোকে আঁকড়ে ধরে, শিল্প দুনিয়াটাকেই পাল্টে

দিয়েছে। কিন্তু এই কারিগরী সামাজিক দক্ষতার অপর দিকে থেকে গেল চরম সামাজিক পশ্চাদগামীতা। যে ব্যবস্থার জন্যে শিল্পীকরণ সম্ভব হয়েছে, তার নিন্দা করার পরিবর্তে ডিউই দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও অসাম্যের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য সেই পদ্ধতিগুলোকেই সমাজে প্রয়োগ করতে উদ্যত হন।

লক্ষ্য ও লক্ষ্যসাধনের পন্থার মধ্যে যে সম্পর্ক ডিউই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও, অনেকেই যুক্তি দেখালেন, মূল্যায়নে বিজ্ঞানের কোন ভূমিকা নেই। সত্য কথাটা এই যে ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের কাছেই বৈজ্ঞানিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতির তুলনায় অন্যান্য সামাজিক পদ্ধতির তুলনামূলক সুবিধাগুলো দেখিয়ে দিতে পারেন। প্রয়োগবাদে যে মূল্য নির্ধারিত হয়েছে, সে হল লক্ষ্য এবং লক্ষ্যে পৌঁছানোর পন্থা, যা স্বাধীন মানুষ নিজেই স্থির করবে।

এমন কি যাঁদের মূল্যায়ন নীতি নির্দ্ধারিত হয় কোন এক পূর্ববর্তী সার্বভৌম ক্ষমতাশীল ব্যবস্থার উপর আস্থা থেকে, তাঁদেরও স্বীকার করতে হবে যে বিজ্ঞান চিকিৎসা, শিল্প ও বৈজ্ঞানিক তথ্যমূলক গবেষণার ক্ষেত্রে যে বিরাট কার্যক্রম নিয়েছে, অর্ধশতাব্দীতে মানুষের জন্যে যে ভালটুকু করেছে, তিন হাজার বছর ধরে কার্যকারণ, জড়পদার্থ, যুক্তিবাদ হেতু প্রভৃতি বিষয়ের উপর যুক্তি কেঁদে দর্শন তা পারে নি।

জেমস্ ব্রিয়ান্ট কোনান্ট জোর দিয়ে বলেছেন, গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ পার্থিয়ান অথবা মধ্যযুগের গগণচুম্বী স্তম্ভের ন্যায়, মানুষের চিন্তাশীলতার প্রামাণিক উৎকর্ষ সৃজনীশক্তির বহিঃপ্রকাশ। "নতুন প্রত্যয়, অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ থেকে উদ্ভূত এবং নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার্থ সীমানার বাইরে ফলপ্রসূ, নতুন চিন্তাধারা বড় সহজ কাজ নয়।„ *

আমেরিকানরা বিজ্ঞানকে আঁকড়ে ধরেছে নিজস্ব বস্তু, নিজেদের নানাত্ব-বাদী, অগ্রগামী, আশাবাদী, পরিবর্তনশীল, কর্তৃত্ববাদ-বিরোধী সমাজের চিন্তা হিসাবে। এই হল তাদের সীমাহীন সীমানা—নিয়ত এগিয়ে যাওয়া আর উন্নতি-বিধানের পথ।

ফাউনডেশন

এই প্রত্যয়ের প্রতি আস্থা আর তা নিয়ে কাজ করার প্রয়াস নতুন গড়ে ওঠা গবেষণাগারগুলোতে যেমন দেখা গেছে, তেমনটি আর কোথাও নয়।

* মডার্ণ সায়েন্স অ্যাণ্ড মডার্ণ ম্যান; ১৮৭ পৃষ্ঠা

বিরাট সম্পদের উপর রচিত এই গবেষণাসৌধগুলি গড়ে উঠেছে বিংশ শতাব্দীতে গবেষণামূলক কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। কারিগরী অগ্রগতির জন্যেই এটা সম্ভব হয়েছে আর এর লক্ষ্য হল মানুষের কল্যাণ।

যে সকল অসংখ্য গবেষণার এখন কাজ করছে, তার কয়েকটির উল্লেখ করা যেতে পারে উদাহারণ হিসেবে। কার্নেগী কর্পোরেশন অব নিউ ইয়র্ক (স্কটল্যাণ্ড থেকে আগত যে বালকটি পরে এক জন ইস্পাত নির্মাতা হয়েছিলেন, তাঁর হাতে গড়া অনেকগুলো ফাউণ্ডেশনের মধ্যে অন্যতম। গঠিত হয়েছিল জ্ঞান আহরণ অথবা বিতরণের জন্য। যে সকল প্রতিষ্ঠান উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি করবার মত নতুন জ্ঞান অর্জনের কার্যসূচী নেয়, এখন এই প্রতিষ্ঠান তাদের অর্থসাহায্য করে। রাসেল সেজ ফাউণ্ডেশন-এর অধিকাংশ অর্থই ব্যয়িত হয় সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণার ফলাফল সমাজে অধিক কাজে লাগানোর দিকে লক্ষ্য রেখে। বোষ্টনের ব্যবসায়ী এডওয়ার্ড ফিলেনে স্থাপিত 'টুয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরী ফাণ্ড' নিজেই বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে এবং সাম্প্রতিককালের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার পর জনশিক্ষার কার্যসূচী অনুসরণ করে।

রকফেলার ফাউণ্ডেশনের উদ্দেশ্য ছিল "সমগ্র বিশ্বের মানব জাতির কল্যাণ-সাধন।" অনেক বিষয়ে অনুসন্ধান কার্যে সাহায্য দান করলেও, জোর দেওয়া হয় সেই ধরণের জ্ঞানচর্চা ও তাকে কাজে লাগানোর উপর, যার সঙ্গে মানুষের স্বার্থ আর চাহিদা জড়িত আছে। এর মধ্যে রয়েছে ঔষধ, জীববিদ্যা, কৃষি, সমাজবিজ্ঞান এবং মানববিজ্ঞান।

জন সাইমন গাগেনহিম মেমোরিয়াল ফাউণ্ডেশন শুধু মাত্র বৈজ্ঞানিক গবেষকদেরই নয়, সকল ধরণের সৃজনশিল্পীকে—কবি, সঙ্গীত-রচয়িতা, ভাস্কর, চিত্রশিল্পীকেও সাহায্য করে। বেশীর ভাগ ফাউণ্ডেশনের ন্যায় অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাহায্য না দিয়ে এঁরা নিজেরাই যাদের মধ্যে অসাধারণ দক্ষতার সম্ভাবনা আছে তাঁদের নির্বাচিত করেন। এমন শত শত সৃজন প্রতিভাকে এঁরা আনন্দ আর উৎসাহ দিয়েছেন যাঁদের কাজের ধরণ এমনিতেই নিরালা ধরণের এবং সমাজ যাঁদের কোন স্বীকৃতিই দিত না। মৌলিক চিন্তাধারার প্রথম নায়ককে সমাজ তেমন মূল্য কোনদিনই দেয় না এবং দেবেও না।

সবচেয়ে বড় হব ফোর্ড ফাউণ্ডেশন, যার অননুমোদিত জীবনচরিত রচয়িতা বলেছিলেন, "অনেক টাকার কাণ্ড, যার চার দিক ঘিরে আছে এমন মানুষ যারা

তার থেকে কিছু চায়।"* ১৯৫৩ সালে এর ঘোষিত মূলধন ছিল অর্ধ বিলিয়ন ডলার, কিন্তু ১৯৫৫ সালে এক ধাক্কাতেই এই অর্থ চার হাজার বে-সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালকে, তাদের নীতি বা আদর্শের কোন বিচার না করেই দিয়ে দেওয়া হয়। এ টাকা পুরোপুরি এসেছিল মোটর শিল্পের লভ্যাংশ থেকে। সামাজিক কর্তব্যবোধ আর জাতীয় কল্যাণে সাহায্য-দানের এ একটা নাটকীয় নিদর্শন।

ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের নীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে যে সমীক্ষা হয় তাতে প্রকাশ পায় যে পাঁচটি ক্ষেত্রে সর্বাধিক সাহায্য দেওয়া দরকার—শান্তি প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র ও অর্থনীতি শক্তিশালী করে তোলা, গণতান্ত্রিক সমাজের শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং ব্যক্তিগত আচরণ ও মানবীয় সম্পর্ক বিষয়ক চর্চা। পরিহাসের হলেও, সত্যি কথাটা এই যে, প্রকৃতিবিজ্ঞান আর কারিগরী বিদ্যার উন্নতিসাধনের জন্য এই অর্থের প্রয়োজন আদৌ অনুভূত হয় নি এবং এই বিরাট অর্থ সঞ্চয় সেইজন্যেই সম্ভব হয়েছিল।

ক্যানসার রিসার্চ অথবা শিশু পক্ষপাত নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়ে যাঁরা লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছ থেকে সাহায্য পান—আমেরিকানদের বুদ্ধিসম্পন্ন হবার নৈতিক দায়িত্ব, মানবীয় সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানের ক্ষমতা, এই ধরণের কাজে সাহায্য দানের দায়িত্ব এবং সবচেয়ে বড় কথা, ভবিষ্যতের উপর বিশ্বাস, বুদ্ধি আর বাস্তব দৃষ্টিতে দেখলে সব সময়ে মঙ্গল হবেই ফাউণ্ডেশনগুলোর মধ্য দিয়ে এই ধারণা—নতুন করে ঘোষিত হচ্ছে।

* ডোয়াইট ম্যাকডোনাল্ড, দি ফোর্ড ফাউণ্ডেশন: দি মেন অ্যাণ্ড দি মিলিয়নস্।

আমরা কোথায় চলেছি?

প্রতিটি সংস্কৃতিকেই ব্যক্তি ও সমাজের আপেক্ষিক গুরুত্বের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় এবং প্রতি যুগে এদের ভারসাম্যের মূল্যায়ন করতে হয়। যুক্তরাষ্ট্র ব্যক্তিত্ববাদের যুগে ছিল। নিজেদের কাজে গর্বিত শিল্পী আর কারুশিল্পী ছিল, ছিল দস্যু সর্দার, বিত্তশালী লর্ডের দল, দারিদ্রের পঙ্কিলতা, শত্রুর সম্পত্তি আত্মসাতের ব্যবস্থা আর লজ্জাকর রাজনৈতিক দুর্নীতি। ব্যক্তিত্ববাদের ভাল-মন্দ দুইই যুক্তরাষ্ট্র দেখেছে। সাম্য আর ব্যক্তিত্বে ভারসাম্য রাখার কাজও হাজার রকমে যাচাই হয়েছে।

মার্কিন সংগঠনগুলো পরিকল্পিত হয়েছিল ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর জোর দিয়ে। এই জোর দেওয়ার ভালমন্দও আমরা দেখেছি। কিন্তু সাম্প্রতিক-কালে আমরা জোর দিয়েছি গোষ্ঠী অথবা সমাজের উপর। 'দি অর্গানিজেশন ম্যান' বইয়ে উইলিয়ম, এইচ হোয়াইট জুনিয়ার বলেছেন, আমরা অনেকদূর অবধি চলে গিয়েছি। শিল্প সংগঠনে তিনি দেখেছেন, সাদৃশ্যের আর গোষ্ঠীগত পদ্ধতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে, ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তাধারাকে আমল দেওয়া হয়নি; জোর দেওয়া হয়েছে সানন্দে স্থিতাবস্থা মেনে নেওয়ার উপর যা তাঁর মতে হতবুদ্ধিকর। মানুষের সাংগঠনিক সমাজজীবনে গোষ্ঠীর উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যা ব্যক্তিগত গোপনতা গুরুতরভাবে ব্যাহত করে। সহরতলীর সমাজ গড়ে ওঠে সামাজিক গোষ্ঠীর ভিত্তিতে, যেখানে সম্প্রদায়ের ভিত্তিতেই, বলতে গেলে, বণ্টনের ব্যবস্থা হয়। পুরুষেরা দলবদ্ধ হয় তাদের কেন্দ্রের জন্য একটা ঘাসকাটা যন্ত্রের প্রয়োজনে, মেয়েরা বেবি সিটার ব্যাঙ্ক, গঠন করে তাদের বাচ্চা দেখা শোনার প্রয়োজনে। রুপোর তৈরী জিনিষ, থালা, বই, রেকর্ডের আদান-প্রদান পরস্পরের মধ্যে চলে।

এই সহরতলীগুলোর বেশ কিছু বেরিয়ে এসেছে সহর থেকে। সেখানে সামাজিক জীবন বলে কিছু নেই। ছোট্ট পাড়ার আনন্দ আর উত্তাপ পুনরা-বিষ্কার করে তারা শুধু অনেক দেরীতে পুরাতন আমেরিকাকেই আবিষ্কার করেছে। সে-আমেরিকা ছোট ছোট সহরে আগেই ছিল এবং বনানী উৎখাত করে স্থাপিত সেই প্রথম আস্তানা থেকেই তার ঐতিহ্য হল নতুনত্ব, সংক্ষিপ্ততা,

বৈদেশিক শক্তি নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্য এবং পারস্পরিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা। গোষ্ঠীর উপর এই নতুন করে জোর দেওয়াটা, আর দশটা নতুন জিনিষের মত, সেই পুরাতনেরই পুনরাবিষ্কার। এ সেই প্লিমাউথ, ওয়াগন ট্রেন আর ১৮৪০ এর সেই আদর্শ সমাজের কিছুটার পুনরুদ্ধার—ব্যক্তি আর গোষ্ঠীর ভারসাম্য রক্ষা আর মিলন।

গবেষণা আর প্রশাসন সম্পর্কে এখনকার দলগত কাজ আমাদের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে, এমন আশঙ্কা যাঁরা করেন, তাঁরা সমাজের ভারসাম্য রক্ষায় নিজস্ব ক্ষমতার কথা ভুলেই যান। সমাজ তো সেই লক্ষ লক্ষ দল, আর পৌর, অর্থ-নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আর সাংস্কৃতিক বিষয়ক সংগঠনের মিলনেই গঠিত।

এমন নানাত্ববাদী সমাজ, যেখানে নিয়ত প্রতিযোগীতা চলছে সমাদর আর সমঝোতার জন্যে, সেখানে মিষ্টতা আছে বৈ কি। এই অথবা সেই গাড়ী কিনতে, বিমানের বদলে ট্রেনে চড়তে, সরকারের পরিবর্তে ব্যক্তির উদ্যমকে সমর্থন করতে, কিংবা রিপাবলিকান অথবা ডেমোক্রাটিক দলকে ভোট দিতেই শুধু আমরা অনুরুদ্ধ হচ্ছি না, একই সঙ্গে মালিক ও শ্রমিক, খামার ও ডেয়ারীর চাষী, আলাপকারী ভাবীশাসনকারী, শিক্ষার প্রগতিশীল ও প্রাচীন ব্যবস্থা এবং নানান ধরণের ধর্মও আমাদের আবেদন জানাচ্ছে। যে জীবনে এত বৈচিত্র, যা এত কিছু গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানায়, তা মানুষকে উদ্দীপিত করে বৈ কি।

এই যথেচ্ছ পছন্দের সুবিধার সঙ্গে আবার কাজের সময় হ্রাস পাচ্ছে। জনৈক কর্মনিয়োগকারী শিল্পপতি সম্প্রতি তিনশত সিনিয়র কলেজ ছাত্রের ইনটারভ্যু নিয়েছিলেন। ছাত্রেরা কেউ জানতে চায় নি কত বেতন দেওয়া হবে। প্রাচুর্য ক্রমশঃ ব্যাপকভাবে বন্টিত হচ্ছে, তাই অন্যকে অতিক্রম করে উপরে উঠবার সেই প্রাণান্তকর পরিশ্রম, যাতে সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য দুইই নষ্ট হয় তার আর প্রয়োজন নেই। চেষ্টা চরিত্রেরও তেমন দরকার নেই আর। মনের শান্তি, পারিবারিক জীবন, শখের খেয়াল এবং আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতির মূল্য স্বীকৃত হচ্ছে অধিকতর প্রয়োজনীয় বস্তু হিসাবে। কাজের জন্যে এখন অনেক কম সময় আর কম চিন্তার অপচয় করা হয়।

সাফল্য এখন নির্ভর করছে অবসর সময় কতটা কার্যকরীভাবে যাপন করা হবে, তার উপর। কে খেলায় জিততে পারে, অনেক দূরে সাগ্রহে ভ্রমণ করতে পারে, কে নিজের জীবনে সাফল্য লাভের অভিজ্ঞতা সবিস্তারে বর্ণনা

করতে পারে, সমাজের কাছে নিজের প্রাধান্য যে জাহির করাতে পারে, বাস্তবতার বদলে অবসর সময় থেকে কে আনন্দ পেতে পারে—তার উপর নির্ভর করে সামাজিক জীবনের উন্নতির মান –। সংক্ষেপে ব্যক্তি, পরিবার আর সমাজের প্রয়োজনের দিক থেকে সময়ের দক্ষ ব্যবহারের উপর।

কৃতিত্ব

বিশ্বব্যাপী অশান্তির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন ধরনের উপাদানের সাহায্যে সজীব সমাজ রচনা করতে সক্ষম হয়েছে এবং দেখিয়েছে যে আলোচনা আর বন্টনের মাধ্যমে গঠিত সরকারই সভ্যজীবন যাপনের সহজতম পথ। স্বাধীনতা এখনও পূর্ণমাত্রায় রয়েছে আমাদের—খুশীমত যত্র তত্র যাতায়াতের অথবা সরকারকে সমালোচনা করবার, লাইনে না দাঁড়ানোর কিংবা অহেতুক বিধি নিষেধের বিরুদ্ধতা করবার স্বাধীনতা।

লেসলী, এ, ফীল্ডার বলেছেন, "মানুষের অক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত ইউরোপীয়েরা এই জাতটার দিকে সপ্রশংস ভীতির চোখে তাকিয়ে থাকে, কারণ তথ্য-কথা বোঝার ব্যাপারে কাঁচা হলেও, তত্ত্বের দিক দিয়ে যা অসম্ভব তাই সম্পাদন করে আর তা দেখায়ও।"*

মার্কিন কৃতিত্ব সম্পর্কে শেষ কথা বলার সময় এখনও আসেনি। তবে উচ্চ স্তরের বুদ্ধিজীবি আবহাওয়া, আত্ম-সমালোচনায় চির সতর্ক সমাজ, কারিগরী দক্ষতা আর সামাজিক বিজ্ঞানের সমন্বয়, শ্রেণী বিভেদের রেশটুকুর উপর চরম আঘাত, আণবিক যুগকে গণতান্ত্রিক স্বপ্ন সার্থক হবার যুগে পরিণত করার সংকল্প—এসবের অস্তিত্ব স্বীকার করা যেতে পারে।

এত বৈচিত্রময় আর বিরাট সমাজে কৃতিত্বের ফিরিস্তি দেওয়া অসম্ভব মনে হয়, তবে দৃষ্টান্তস্বরূপ যে কোন একজনের ইতিহাসের দিকে তাকালেই কিছু অনুভব করা যাবে। অনেকের মধ্য থেকে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি উইলিয়ম, ও, ডগলাসকে বেছে নিচ্ছি, কারণ বাইরে তাঁর পরিচিতি আছে। মিনেসোটায় জন্ম, ছ'বছর বয়েসের সময় ধর্মপ্রচারক বাবার মৃত্যু হলে উইলিয়ম ডগলাস পরিবারের আর সবাইয়ের সঙ্গে ওয়াশিংটন রাজ্যের পশ্চিম পারে গিয়ে পৌছুলেন। স্কুলে ভর্তি হলেন, বৃত্তি পেয়ে হুইটম্যান কলেজে ঢুকলেন। জানলা পরিস্কার আর একটা দোকানে কাজ করে ঘন্টায় দশ সেন্ট পেতেন, ওয়েটারের

* পার্টিসান রিভিউ, ১৯, ১৯৫২, ২৯৫ পৃষ্ঠা।

কাজ করে নিজের পেটের সমস্যা মেটাতেন। কলেজের শেষ চার বছরে খোলা জায়গায় একটা তাঁবুতে অবস্থান করে কিছু পয়সা বাঁচিয়েছিলেন। গ্রীষ্মের বন্ধের সময় ফল তুলতেন, উত্তর বনানীতে কাঠ সংগ্রহ করতেন, বনে আগুন লাগলে নিভাবার কাজ করতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ছেদ পড়ে, তারপর যখন কলেজ শেষ হয় তখন তিনি ছাত্রসংঘের সভাপতি।

দু'বছর নিজের সহরে হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তারপর মালগাড়ীতে মেষপালকহিসেবে পূর্বদিকে রওনা হন; সেইভাবে শিকাগো অবধি যান। সেখানে নিজের টাকায় একটি টিকিট কিনে মাত্র ছয় সেণ্ট সম্বল করে নিউ ইয়র্ক পৌঁছান। এবার কলম্বিয়া আইন কলেজে ভর্তি হলেন, টুইসানি করে আর বই লিখে ব্যয় নির্বাহ করলেন এবং ক্লাশে দ্বিতীয়স্থান অধিকার করলেন। পরে তিনি একটা বড় আইন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। কলম্বিয়া এবং ইয়েলে আইন বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। দেউলিয়াপনার মধ্যে এইভাবে পড়াশোনা করবার সময় ডাক আসে বাণিজ্য দপ্তর থেকে, তারপর আসে সিকিউরিটিজ অ্যাণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন থেকে—পরে নিজেই কমিশনের চেয়ারম্যান হন—আর্থিক দুনিয়ায় উল্লেখযোগ্য সংস্কারসাধনের জন্য চেষ্টিত হন। ১৯৩৯ সালে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিনিযুক্ত হন—এই পদে তিনি দ্বিতীয় তরুণ এই বয়সে যিনি এই সম্মানিত পদে নিযুক্ত হন। এরপর অনেক গ্রীষ্মকালই তিনি কাজে লাগিয়েছেন—বিশ্বের দূর অঞ্চল ভ্রমণের এবং অন্যান্য সংস্কৃতির সমস্যা আর সমাধান সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের স্পৃহায়।

আমেরিকানরা বিশ্বাস করে যে, তরুণদের মধ্যে আজ যারা দেশ জুড়ে কাগজ ফিরি অথবা লনের ঘাস কাটছে, তাদের মধ্যে আরও 'ডগলাস' সুপ্ত আছে এবং তাদের সামনে পুরুষানুক্রমে সমস্যা আসবে, তার সঙ্গে মোকাবিলা করার পথ তাদের জানা থাকবে।

দেশের সামনে এখন যে সমস্যা রয়েছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মাঝে মাঝে নৈরাশ্য এনে দেয়। সমস্যাগুলো হল অপরাধপ্রবণতা, সুরাসক্তি, মানসিক ব্যাধি, সংস্কার, দুর্নীতি। তবে আমরা প্রবণতাগুলোর উপর নজর রাখতে শিখেছি। কারণ আমরা জানি যে কুমতলব সব সময়েই সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। আমাদের অধিকাংশই ঝোঁকের মাথায় উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সরকারী আর স্বেচ্ছামূলক সংগঠনগুলো প্রতিটি সমস্যা সমাধানের জন্য যে শক্তি নিয়োজিত করছে, শুধু সেজন্য নয়, অনুসৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতির জন্যও তা উৎসাহদ্দীপক।

১৯৮০ সালের মধ্যে আমরা এমন সম্প্রসারিত অর্থনীতি আশা করছি যা শ্রমিকদের সারা বছরের মতো কাজের নিশ্চয়তা দেবে এবং সাপ্তাহিক কাজের মোট শ্রম ঘন্টা হবে তিরিশ। আগামী দশ পনের বছরের মধ্যে কলেজে পড়বার যোগ্যতা যারা অর্জন করবে, তাদের জন্যে কলেজ শিক্ষকদের সংখ্যা দ্বিগুণ করতে হবে এবং সেই সঙ্গে গত তিন শ'বছরে যত কলকারখানা করেছি ওদের স্থান দেবার জন্য ততটা বাড়াতে হবে।

এখানে যে প্রাচুর্যের অর্থনীতি অর্জন করা গেছে আমরা আশা করছি তা সারা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হবে এবং আমাদের আশা এই ব্যাপারে আমাদের কিছু ভূমিকা থাকবে। এই কর্মসূচীতে আগ্রহশীল রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্যদান ও শ্রদ্ধার ভিত্তিতে আমরা সহযোগীতা করব।

যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমের মর্যাদা এবং সমাজের সুসমাচার মিলেমিশে এক হয়ে যাচ্ছে এবং এ থেকে নতুন যে সংস্কৃতি দানা বাধছে, তার অভিজ্ঞতাও নতুন ও উত্তেজনাকর। এমন কি অবশেষে মেয়েদের বিশেষ অন্তর্দৃষ্টির ব্যবহার করতেও শিখছি এবং কোন সমস্যা সম্পর্কে মেয়েপুরুষের পরিপূরক মনোভাব বিনিময় থেকে লাভবান হচ্ছি। এইভাবে পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী নারীর যে কর্মক্ষমতা গৃহে সীমাবদ্ধ ছিল, আজ তা বর্তমানে সমাজের ভূমিকা কি এবং ভবিষ্যতে কি হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলছে।

মার্কিন অতিকথা

প্রতিটি জাতিরই কিছু অতিকথা (মিথ) থাকে যা থেকে প্রকাশ পায় তার আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং সেই হেতু তার ব্যর্থতা ও কৃতিত্বের কথা। জাতির অভীষ্ট লক্ষ্যপথের প্রতীক এই অতিকথা। মার্কিন অতিকথা হল তাঁকে নিয়ে (মুখ্যটি) যিনি ছিলেন ইউরোপের স্বাধীনতাপ্রেমী পর্যটক—(এনাসের মত) অসভ্যদের পরাভূত করে নতুন বাসভূমির সন্ধান পেলেন ; সেখানে, সেই অরণ্যানীতে, বর্বরদের মধ্যে তিনি সভ্যতা ও আইনানুবর্তী শাসনব্যবস্থার পত্তন করলেন। সকল মানুষই স্বাধীন আর সমান। নতুন দেশের বিরাট সম্পদ তাঁদের জন্যেই পড়ে আছে। সাহস আর বিচক্ষণতার সঙ্গে তাঁরা সেই অরণ্যানীতে সভ্যতার আলো ফুটিয়ে তুললেন। এই অতিকথার বক্তব্য এই যে, নীতিবোধ, ধর্ম আর কলাসম্মত দিক থেকে তারা স্থানীয় বাসিন্দাদের তুলনায় উন্নত, তাই নতুন মহাদেশ অধিকার আর তাকে গড়ে তোলার দায়িত্ব ছিল তাঁদেরই উপর।

সংস্কারক, উদ্ভাবক, বৈজ্ঞানিক, কারীগর এবং ব্যবসায়ী হিসেবে তাঁরা যে উৎপাদক যন্ত্র তৈরী করলেন, তা সকলের জন্য প্রাচুর্যের সেই স্বপ্নকে রূপ দিতে পারে। সকলের জন্যে শিক্ষা আর সুযোগ এই স্বপ্নের অপর দিক, যা সব সময়েই অধিক মাত্রায় রূপায়িত হচ্ছে।

পিতৃপুরুষের বাসভূমি ইউরোপকে যাঁরা নতুন দুনিয়ার জন্যে ত্যাগ করেছেন তাঁরা সবসময়েই অবহেলিত সাধারণ মানুষের প্রবক্তা। কর্তৃত্বকে সন্দেহের চোখে দেখেন এবং প্রতিরোধ করেন। অল্পবয়সী তরুণরা যাতে আনন্দ পায়, তাঁর আনন্দও সেইসব জিনিষে— বিধিনিষেধ ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া, সুঠাম তরুণী, পুরুষোচিত খেলাধূলো, আদিম আর উত্তেজক আনন্দ, আমেরিকান লিজিয়ন অথবা জাতীয় রাজনৈতিক সম্মেলনগুলোর ন্যায় বাহুল্যবহুল সভাসমিতি, চরম আশাবাদীতা এবং ক্ষণিকের জন্য আকস্মিক নৈরাশ্য, নিজস্ব শক্তিতে আনন্দ ও জ্ঞানার্জনের স্পৃহা, সৌন্দর্য ও অতীন্দ্রিয় আকাঙ্ক্ষা এবং নবযৌবন সম্পর্কে তরুণের সংবেদনশীল সচেতনতার মত সব কিছুর প্রতিই আগ্রহশীল।

ভাবী যুগের নবযৌবনের মুকুরে আমেরিকা এখনও নিজেকে দেখে, সম্ভবমত চিরকালই দেখবে, কারণ ইতিহাসই তাকে ভাবীকালের প্রহরী করে রেখেছে— বয়ঃবৃদ্ধ পিতার, অতীতের অথবা কর্তৃত্বের শাসনের বাধানিষেধ অগ্রাহ্য করে। তাই, কেউ যেন এই ভেবে ভীত না হন যে আমেরিকা কর্তৃত্ব করতে চাইবে, সহজ কথা কর্তৃত্ব করা আমেরিকার ধাতে নেই। বরং তারা সরে আসবে, নিজেদের জন্য নিবিড় অরণ্যভূমিতে নতুন করে বসতি স্থাপন করতে চাইবে, পিছনে ফেলে আসা পরিচিত জগতের প্রতিচ্ছায়া অস্বীকার করবে। ভাগ্যে রয়েছে চিরকাল বিদ্রোহ করা ; কর্তৃত্ব নয়, সহযোগীতার পথে দুনিয়াকে সব সময় জয় করে নেওয়া। এই জন্যেই সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ, শ্রেণী বিভেদ দূর করার কৌশল, সাধারণ কর্মচারী আর উপরওয়ালাকে সমপর্যায়ে নিয়ে আসা এবং শ্রমিক শ্রেণীর সাম্যবাদের উপর এত জোর দেওয়া।

ছ' দফা পদ্ধতি

যুক্তরাষ্ট্র নতুন যে সমাজ ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছে, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ বে-সরকারী প্রয়াস, ধনতন্ত্রবাদ এমন কি, গণতন্ত্রবাদ প্রভৃতি পুরাতন ভাষা দিয়ে আর তার ব্যাখ্যা চলে না। এ নিয়ে আর কেউ প্রশ্ন করেন না এখন।

আমাদের সমাজ ব্যবস্থার সুন্দর এবং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হয়েছে, কিন্তু এ সম্পর্কে এখনও কোন একীকরণের ভিত্তিতে মৌলিক তত্ত্ব লিখিত হয় নি।

মার্কিন সমাজকে সবচেয়ে ভাল করে বোঝা যাবে ছয়টি বিশেষ ধরণের কার্য ধারার মিলিত পদ্ধতির মধ্য দিয়ে। এই ছয়টি ধারা হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বেচ্ছাবাদ, কেন্দ্রীয়বাদ, ভারসাম্য, একের কার্যক্ষেত্রে অন্যের প্রবেশ এবং মিলন। এই পদ্ধতি এমন এক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়াস পাচ্ছে, যা এখনও তার পূর্ণতা পায় নি এবং ভবিষ্যতে পরিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার যুক্তির জোরেই ব্যাপক প্রসার লাভ করবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ কোন ব্যক্তিকে নিয়ে সুরু করা যাক। যেমন প্লাইমাউথের গভর্ণর উইলিয়ম ব্রাডফোর্ড, যিনি তরুণ বয়েসে স্বেচ্ছায় পিলগ্রিমস নামে পরিচিত বিধর্মী-দের দলে যোগদান করেন। সেই মুহূর্তে স্বীয় ব্যক্তিত্বকে তিনি প্রসারিত করলেন সম-মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের স্বেচ্ছামূলক সংগঠনে যোগদান ক'রে। ধর্মীয় উদ্দেশ্য থেকেই এই মিলন। অবশেষে তাঁরা উত্তর আমেরিকায় এলেন; স্বেচ্ছাবাদী নীতিকে সম্প্রসারিত করে প্লাইমাউথের ক্ষুদে কমনওয়েলথ আর বাণিজ্যিক ব্যাপারগুলো পরিচালনার জন্যে ব্যবসায়ী সহযোগীতার একটা ব্যবস্থার প্রবর্তন করলেন। কেন্দ্রীয়বাদী নীতি প্রাণ পেল নিউ ইংল্যাণ্ড কনফেডারেশনে, কয়েকটা দুর্বল গ্রামীণ গণরাজ্য (ভিলেজ রিপাবলিক), সামরিক উদ্দেশ্যে হাতে হাত মেলালে।

কিছুকাল এই ক্ষুদে শক্তিগুলি এদের পারস্পরিক ভারসাম্য রক্ষা করল, যেমন বোষ্টন আর প্লাইমাউথের মধ্যে প্রতিযোগীতা হল কনেকটিকাট ভ্যালি নিয়ে। পরবর্তী পর্যায়ে একে অন্যের সীমানায় প্রবেশ করল—ফলে এই ক্ষুদে বসতি গুলো, যেমন হার্টফোর্ড, ওয়েদারসফীল্ড, সেব্রুক প্রভৃতি—একত্রিত হয়ে প্রাদেশিক সরকার গঠন করল। এই সীমিত পরিবেশেই মিলিত হবার পরিবেশ তৈরী হল—তখন কনেকটিকাট একটি রাজ্যে পরিণত হল।

ফেডারেল সরকার গঠনেও এই পদ্ধতিই যে অনুসৃত হয়েছে তা অনায়াসেই ধরা পাবে।

এখন আমাদের আজকের সমাজে যে নীতি অনুসৃত হচ্ছে সেদিকে তাকানো যাক। শিক্ষার কথাই ধরুন। স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হয় প্রতিটি নাগরিক সমান সুযোগের অধিকারী এবং এই সুযোগের অধিকারী হবার একমাত্র উপায় শিক্ষালাভ—এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মতবাদের উপর। স্কুল ব্যবস্থার স্বেচ্ছাবাদী রূপ সুরু থেকেই সুস্পষ্ট, কারণ প্রতিটি সহরই তার নিজস্ব ধরণের স্কুল ব্যবস্থার

পত্তন করেছে, নাগরিকেরা করবহন করেছে তার ব্যয় নির্বাহের জন্যে, এবং শিক্ষকদের থাকবার ব্যবস্থা করেছে।

কিন্তু এই স্বেচ্ছাবাদ প্রবেশ করেছে আরও দুটো উপায়ে এবং আমাদের সমাজ কি ভাবে চলে বুঝতে হলে তার বৈশিষ্টটুকু প্রথমেই বুঝতে হবে। শিক্ষকের সামাজিক এবং বৃত্তিমূলক উদ্দেশ্যের মিলিত ভিত্তিতে স্বেচ্ছা-সংগঠন করেন। এই সংগঠনের সঙ্গে সংযোগ থাকে আঞ্চলিক ও জাতীয় সংগঠনের। এই ব্যবস্থাকে আমরা সাংগঠনিক কর্মব্যবস্থা বলতে পারি, কারণ শিক্ষকেরা নিজেদের সংগঠিত করেন পেশাগত প্রয়োজনে—নিজেদের শক্তিশালী করবার জন্যে, শিক্ষকের কাজটাকে উচ্চ মর্যাদা দেবার জন্যে।

অভিভাবক এবং শিক্ষকেরা গঠন করেন অভিভাবক-শিক্ষক সংগঠন। একে আমরা সামাজিক ব্যাপার বলতে পারি, কারণ এর বিচার্য্য বিষয় হল সমাজে স্কুলের স্থান, স্কুল ও পরিবার—এই দুটো মৌলিক সংগঠনকে একত্রিত করা। এসবের যা উদ্দেশ্য তার একটা সামাজিক মূল্য আছে এবং এ সমাজজীবনের একটি সম্পূর্ণ গ্রাহ্য অংশ বলেই ধরে নেওয়া হয়।

এই কেন্দ্রীকরণ নীতি সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে জাতীয় সংগঠনগুলোর কাজ এবং সামাজিক ব্যবস্থার মাধ্যমে। একবার কেন্দ্রীয় সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হলে এই দুর্বল স্থানীয় সংগঠনগুলোও অকস্মাৎ শক্তিশালী হয়ে ওঠে, জাতির জটিল শক্তিগুলোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে ; একদল যখন ভাল স্কুলকে সমর্থন করে, অন্য স্বার্থের প্রবক্তারা তখন নিম্নহারে কর নির্ধারণ, চাষীদের সাহায্য দান, শ্রমিকদের প্রতি আরও উদারদৃষ্টিতে আইন প্রনয়ন, বন্যপশুপক্ষী সংরক্ষণ এবং আরও হাজার বিষয়ের উপর জোর দেয়। কারণ আমাদের সমাজ গঠিত হয়েছে অসংখ্য স্বেচ্ছামূলক সংগঠনের দ্বারা, কেন্দ্রীয় রূপ নিয়েছে কনভেনশন আর জাতীয় সদরদপ্তরগুলোর মাধ্যমে—এবং এই ভাবে ওয়াশিংটনের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করবার শক্তি অর্জন করেছে।

এ যাবৎ এই ব্যবস্থা, বিরোধ ছাড়া অন্য কিছু সৃষ্টি করতে পারে বলে মনে হয়নি। কিন্তু এখন এসেছে একের অন্যের কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করার যুগ। নিজের পথে কাজ করতে গিয়ে অন্য সংগঠনের মধ্যে শুধু শত্রু ভাবই নয়, অনুকরণের স্পৃহাও সৃষ্টি করে। একদা শিক্ষাকে শুধুমাত্র স্কুল আর শিক্ষকদের এক্তিয়ারের মধ্যে মনে করা হত। এখন শিক্ষার ক্ষেত্রেও সমাজের অন্যান্য প্রসঙ্গ প্রবেশ করছে। শ্রমিক সংগঠনগুলো নিজেদের ক্লাশ আর স্কুল সুরু করছে। শিল্প

শিক্ষাদানের কার্যসূচী গ্রহণ করছে অথবা কর্মচারীদের মধ্যে যারা পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চান তাদের পড়াশুনার খরচ দিচ্ছে। কৃষি সংগঠনগুলো আলোচনা গোষ্ঠী, বক্তৃতা, শিক্ষাবিষয়ক চলচ্চিত্র (ডকুমেন্টারি ফিল্ম), প্রবন্ধ প্রতিযোগীতা প্রভৃতির আয়োজন করছে।

আমাদের সমাজের অন্য যে কোন গোষ্ঠীর জন্য এই একই আঙ্গিক পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। যে আইনজীবী স্থানীয় বার লাইব্রেরীর সদস্য (পেশার দিক থেকে), তিনিই আবার লিগাল এড সোসাইটি ও তার কমিউনিটি কাউনসিলের হয়ে কাজ করেন (উভয়ই সামাজিক ব্যাপার)—শত শত দৃষ্টান্তের মধ্যে এ হল একটি মাত্র যা থেকে বোঝা যাবে লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যে পেশা এবং সমাজের প্রয়োজনে কিভাবে সহযোগীতা করে—সমাজের মধ্যে ব্যক্তি মিলে মিশে যায়। একদা শিল্প ও শ্রমিকের যে বিরোধীভাবকে মৌলিক বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল, এখন সেখানেও বোঝাপড়ার আদান প্রদান সুরু হয়েছে। ইউনিয়নগুলো শিল্প পরিচালন সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়েছে, পরিচালক গোষ্ঠীও ইউনিয়নের সঙ্গে মানিয়ে চলতে শিখেছেন। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার দরুণ কাজের ঘণ্টা হ্রাস পেয়েছে এবং বেতন বেড়ে গেছে। এ থেকেই আসবে উভয় স্তরের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে মিলন যখন ম্যানেজার আর শ্রমিকের ব্যবধান ক্রমশঃ কমে আসবে এবং অবশেষে আর ধর্তব্যের মধ্যে থাকবে না, কারণ যে ব্যবধানটুকুর পরিমাপ হত উভয় পক্ষের বৈষয়িক সম্পদের তারতম্যে, অবসর সময়ে কাজকর্ম আর মনোভাবের মাপকাঠিতে সেটাও ধীরে ধীরে কমে আসছে।

এই বাস্তব জীবনযাপনের ছয় দফা কার্যক্রম তুলে ধরবার জন্যে আরও শতাধিক দৃষ্টান্তের কথা মনে পড়ছে। যেমন, একদা কেবলমাত্র ধর্মীয় কাজের মধ্যে আবদ্ধ চার্চের আজকের রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রম; রাজনৈতিক দলগুলোর ইতিহাস, যাদের মধ্যে খুব বেশী তারতম্য নেই, প্রায়শঃই ভোট পাবার জন্যে একইভাবে নতুন সমঝোতার মধ্যে যায়, অনিবার্যভাবে একই দল অন্য দলের প্রতিচ্ছবি কারণ, ক্ষমতা পেতে অথবা দখলে রাখতে হলে, দলের মধ্যে প্রভাবশালী সকল রাজনৈতিক শক্তিগুলোর মিলন চাইই।

এমন একটা কিছু দৃষ্টান্তস্বরূপ নেওয়া যাক যা এখনও চূড়ান্তরূপ নেয়নি। তথ্যগত বিচার করে তার ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ণয় করা যাক।

ইদানীংকালে দেশের সর্বত্র এমন অনেক ব্যক্তি গোষ্ঠী দেখা দিয়েছে যাঁরা লাভবান অর্থনীতিতে সম্পত্তির মালিক হিসেবে তাঁদের সঞ্চয় কাজে লাগাতে

চান। এরা অর্থ বিনিয়োগ ক্লাব গঠন করেন, সকলের অর্থ একত্রিত করে ফাণ্ড গঠন করেন, একজন অভিজ্ঞ লোকের কাছ থেকে শেয়ার আর বণ্ডের কথা শোনেন, সম্ভাব্য নিরাপত্তা সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং প্রতি মাসে মিলিতভাবে অর্থ বিনিয়োগ করেন।

নিশ্চিত বলা যায় এই গোষ্ঠীগুলো কেন্দ্রীয় কোন সংগঠনের অধীনে সংগঠিত হবে। এদের রাজ্য ও জাতীয় সম্মেলন (কনভেশন) হবে। নিউ ইয়র্ক অথবা ওয়াশিংটনে – হয়ত দু'জায়গাতেই— এদের অফিস বসবে। এরা যে চাপ সৃষ্টি করবেন, তা ব্যাঙ্ক, বড় কর্পোরেশন, প্রভৃতি বড় বড় বিনিয়োগকারীদের চাপের ভারসাম্য রক্ষা করবে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্যে এঁরা কর নির্ধারণ ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা দাবী করবেন। আবার এই ভাবে তাঁদের স্বার্থ মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। ব্যক্তিগতভাবে এরা সবাই শ্রমিক ও ক্রেতা, সংগঠনের দিক থেকে বিনিয়োগকারী, একটি জাতীয় সংগঠনের সদস্য হিসেবে রাজনৈতিক প্রভাবও থাকবে এঁদের। সামগ্রিকভাবে এঁরা যা করছেন তাতে মিলেমিশে যাওয়ার সাহায্য করা হচ্ছে। কালক্রমে এই সব কাজ আর স্বার্থের নিজস্ব কিছু থাকবে না বলে পৃথকভাবে এদের অস্তিত্বেরও প্রয়োজন হবে না।

মিলে যাওয়া বলতে কোন স্থায়ী পরিবর্তনশীল অবস্থার কথা বলছিনা। এ একটা বিশেষ দিকে ঝোঁক। আমাদের সমাজ নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে ; পরিবর্তনেই তার শক্তি বৃদ্ধি। কিন্তু প্রাচুর্য ও পূর্ণ উৎপাদন, নিয়ত সম্প্রসারণশীল পণ্য বন্টন ব্যবস্থা এবং শিক্ষা, শ্রেণী ও আয় বৈষম্যের বিলোপসাধন—এই মৌলিক উপাদানগুলো মতবাদের আদান-প্রদান অনিবার্য করে তোলে। শ্রমিক, ধর্মযাজক এবং কারখানার মালিকের ছেলে একসঙ্গে স্কুলে যায়—এমন কি কলেজেও। উপযুক্ত সকলেই যখন কলেজী শিক্ষা পাবে, তখন শিক্ষা আর মানুষে-মানুষে কোন ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারবে না। বহিরাগতদের মিলনের পথে জাতিগত মিলমিশ আর একটা উদাহরণ। প্রোটেস্ট্যান্টরা কেন্দ্রীয়ভাবে সংগঠিত হয়েছে, শেষপর্যন্ত সম্ভবতঃ তারাও মিলে যাবে।

নৈরাশ্যবাদীরা আমাদের যান্ত্রিক সমাজের মধ্যে শুধু সেইসব শক্তিই দেখেন যা মানুষকে একটা বড় যন্ত্রের আজ্ঞাবহ করে মানবসমাজকে বন্ধ্যা করে দিয়েছে। বাস্তববাদী মুখোসপরা কল্পনাবিলাসীদের ধারণা প্রাকশিল্প যুগে কারুশিল্পের যে নৈপুণ্য দেখতে পেয়েছেন, তা এখন হারিয়ে গেছে, নিজের জন্যে কাজ করার মধ্যে যে নিরাপত্তাবোধ ছিল তা এখন নেই বললেই চলে। একথার কোন মানে হয় না।

প্রতিযোগীতা, চিকিৎসকের আরোগ্যক্ষমতার বাইরে বলে স্বীকৃতব্যাধি আর অত্যাচারী সরকারের হাত থেকে বাঁচবার মত কি প্রতিশোক ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর কারুশিল্পের ? সেই বার ঘন্টা ধরে কাজ আর শিশু শ্রমিকের যুগে কে ফিরে যেতে চায় ? সপ্তাহে চল্লিশ (তিরিশের আর দেরী নেই) ঘন্টা কাজ, সামাজিক নিরাপত্তার সুযোগ, বেকার ভাতা, আধুনিক ঔষধ আর শিক্ষা 'মানুষকে যে নিরাপত্তাবোধ দিয়েছে, এমন কি পঞ্চাশ বছর আগেও মানুষ তেমন অবস্থার কথা ভাবতেও সাহস করত না। আর এ শুধু নিরাপত্তা নয়।

একটা ঝোঁক দেখা গেছে আগেকার সমাজকে রঙীন করে চিত্রিত করবার দিকে। সেখানে সব কাজ সম্পাদিত হয়েছে সকলের যৌথ প্রয়াসে—যেন তার ভিতরেই কিছু গুণ নিহিত ছিল। জটিল সামাজিক কাঠামোর অন্তর্নিহিত সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত মাধ্যম হোল স্বেচ্ছামূলক সংগঠন। এর মধ্য দিয়ে আদর্শকে যাচাই করে দেখতে পারি আমরা, পরে সরকার নিজেই এ সবের প্রবক্তা হতে পারেন। এইভাবে, প্রথমেই ছোট ভুল ভবিষ্যতে বড় ভুলে পরিণত হবার সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করা হয়।

বিভিন্ন স্বার্থ কেন্দ্রীয়ভাবে সংগঠিত, পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান ও ভারসাম্য রক্ষিত হলে, অনিবার্যভাবে দেখা দেবে সমঝোতা, এমন কি মত-নৈক্যের সুর থেকে গেলেও। বৈচিত্রের মধ্যে মিলনের সুরই মার্কিন জীবনের বৈশিষ্ট্য। মিলনের সুরকে মতৈক্য আরও তীক্ষ্ণ করে তোলে। ভারসাম্যকারী শক্তি এই বৈচিত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য আনে।

সমাজকে যারা সীমাবদ্ধ ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করেন, তাঁরা বুঝেই উঠতে পারেন না এত দল আর বিভিন্ন স্বার্থ নিয়ে মার্কিন সমাজ কাজ করে কি করে ? দর্শকেরা বাহিরে যে সমতার কথা বলেন তা সহজ ঐক্য নয়, বিরোধী স্বার্থের মিলন সাধনের নিয়ত সমন্বয় সাধন, মতৈক্যের ক্ষেত্র খুঁজে বার করা ও তাকে শক্তিশালী করা, বাস্তবকে জোরদার করার প্রয়াসেরই ফলস্বরূপ। বিরোধের মধ্য থেকে বিবেকসম্মত যুক্তিকে মেনে নিয়েছি এবং অনৈক্যের উপর ঐক্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। তাই আমাদের কষ্টার্জিত সমতাকে এত মূল্য দিই—তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। পর্য্যবেক্ষকরা যাই বলুন না কেন, একথা সত্যি নয় যে, বিভিন্ন মতাবলম্বী হওয়াটা কি বস্তু আমরা জানি না। যথেষ্ট সংযমের অভ্যাস করে আমরা বিরোধকে জয় করেছি। শক্তিশালী জাতির প্রতীক হিসাবেই সকলে একসঙ্গে বসবাস করতে চেয়েছি আমরা। আমাদের

ঐক্যের প্রতীককে যদি অস্পষ্ট মনে হয়, উত্তরে আমরা শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে ওর মধ্যেই আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। যে সব ব্যবহারিক আচরণের মধ্যে আমরা মিলিত হই—যেমন আমাদের সাম্যবাদী আচরণ, অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি, এই সবই আমাদের কাষ্টার্জিত সচেতনতার প্রতীক।

বহুর মধ্যে এক* আমাদের মুদ্রার একদিকে খোদিত লেখা, শুধুমাত্র লেখাতেই শেষ নয়। কারণ আমাদের সংস্কৃতিতে ধর্ম ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা একসঙ্গে প্রবাহিত হয়েছে, বে-সরকারী আর সরকারী ব্যবস্থা এক হয়ে গেছে। জাতীয় আর আন্তর্জাতীয় স্বার্থের ব্যবধান ঘুচে গেছে, রাজনৈতিক আদর্শ জন ডিউইর তত্ত্বাবধানে দর্শনের বিশেষ শিক্ষাতে রূপায়িত হয়েছে এবং আদর্শবাদীরা দেখছেন প্রাচুর্য্য আর সাম্যের দেশে তাঁদের আর বাস্তববাদীদের লক্ষ্যের মধ্যে কোন ব্যবধানই থাকছে না।

সাম্যবাদ এমনিতেই মিলিয়ে দেবার একটা নীতি, সত্য ও আদর্শ দুইই, নৈতিক নির্দ্দেশ ও বাস্তবতার সামাজিক দিক। "দি জিনিয়াস অব আমেরিকান পলিটিক্‌স্"-এ ড্যানিয়েল বুর্‌স্‌টিন ঠিকই বলেছেন, শরীরতত্ত্ব থেকে ধর্মতত্ত্ব অবধি সাম্যই ঐক্যের সূত্র।

এইসব আদান-প্রদান ও বিনিময় সুরু হতেই দেখা দেয়, নতুন ধরণের এক সমস্যা, পরে যা হয়ত মিলনের নতুন ক্ষেত্র তৈরী করবে। কারণ অনেক স্বার্থের ন্যায় অনেক উদ্দেশ্যও মিলেমিশে যায়।

জন ডিউই তাঁর আশা এইভাবে ব্যক্ত করেছেন :

"দর্শন যখন ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে সহযোগীতা করবে এবং দৈনন্দিন খুঁটি-নাটির অর্থ সুস্পষ্ট আর সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশ করবে, তখন বিজ্ঞান আর আবেগের বিনিময় হবে, বাস্তব আর কল্পনা পরস্পরের মধ্যে রূপায়িত হবে। কবিতা এবং ধর্ম জীবনের আঙ্গিনায় ফুলের সৌন্দর্য নিয়ে ফুটে উঠবে। ঘটনার চলতি প্রবাহের গ্রন্থন ও প্রকাশ পরিবৃত্তিকালের দর্শনের কর্তব্য ও সমস্যা।*

সাম্যবাদের ভিত্তি, কেন্দ্রীয়বাদ দ্বারা সংহত সামাজিক ভারসাম্য ও বিবর্তনের গতিশীলতার জন্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষামূলক কাজের সহজ প্রবৃত্তি, স্বার্থ, মান ও

* 'E. plurifbus unum—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শ।

* Reconstruction in Philosophy, ২১২ পৃষ্ঠা।

আচরণের পরিবর্তনশীল বিশ্লেষণ এবং একটি লক্ষ্যের গন্তব্যস্থান—দুই রেল-লাইনের মিলনের মতো যা অসম্ভব এবং যা কোন দিনই সম্ভব নয়—গতিশীল সমাজের এই হল চিত্র। ভবিষ্যতের, সম্ভবতঃ অপরের ভবিষ্যতেরও নক্সা, কারণ যাঁরা সোস্যালিষ্টের সামাজিক বিচারবোধ আর গণতান্ত্রিক শিল্পপতির উদ্যম আর গতির মিলন ঘটাতে চান, তাঁরা এর মধ্যেই পাবেন সমাধানের সূত্র। ইতিমধ্যেই আমরা এই উভয় লাইনের উপরেই এক চলন্ত ট্রেনে চেপেছি। এ ট্রেন ভারসাম্যকারী শক্তির সাহায্যে এগিয়ে চলেছে এবং নিজের গতির স্পন্দনেই কম্পিত কেবলমাত্র উভয়দিকের প্রতিক্রিয়াশীলরা মনে করেন আমাদের এই এগিয়ে চলা নিস্কণ্টকে হবে কোন একটা লাইন তুলে ফেলতে পারলে।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

আমেরিকান সভ্যতার পিছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য, কারণ সভ্যতা ভুলচুক অথবা কালক্ষেপ করলেও, জীবনের গতি অব্যাহত থাকে। ইউরোপের ন্যায় আমেরিকাও গ্রীক গণতন্ত্রের যুক্তিবাদ, সৌন্দর্য্যপ্রীতি এবং শরীর প্রীতির উত্তরাধিকারী। এমন কি যৌন ব্যাপারে স্পষ্টবাদীতা, ধর্মীয় উন্মত্ততা এবং সুরাশক্তির মধ্যেও প্রকাশ পায় সেই অতীত উৎসের কথা। নৈতিক আইন প্রচলন স্পৃহা, নিয়মানুগ ঈশ্বর নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব এবং সকলে তাঁর নির্বাচিত মানুষ—ইহুদীদের এই সকল বিশ্বাসেরও উত্তরাধিকারী আমরা। প্রেমের মর্যাদা, প্রতিবেশীকে সাহায্যদান ও যাদের প্রয়োজন তাদের সঙ্গে সবকিছু ভাগ করে নেওয়া এবং প্রতিটি ব্যক্তির ঐশ্বরিক প্রকৃতি এসব হল খ্রীষ্টধর্মের মূল্যবান ঐতিহ্য। আমাদের ইতিহাসের গতির মুখ্যশক্তি এবং সত্তার যুক্তি হিসেবে এই ঐতিহ্যকে মেনে নিয়েছি আমরা।

আইন ও শৃঙ্খলার প্রতি রোমানদের অনুরাগ, সকল প্রকৃতির অতীন্দ্রিয় ঐক্যের অনুভূতি, যা তুরীয়বাদীদের মাধ্যমে ভারত থেকে যা আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, আফ্রিকা থেকে আহরণ করা সঙ্গীত ও ছন্দ এবং বিশ্বের সকল প্রান্ত থেকে আগত ন্যায় বিচার বুভুক্ষু এবং সর্বশেষ শক্তির প্রয়োগের সুযোগ সন্ধানী মানুষের দুর্ধর্ষ শক্তি—নতুন দুনিয়ায় যে আশা আর শক্তি সৃষ্টি হবার কথা, তার সঙ্গে এগুলোও মিলে জড়িত হয়ে গেছে।

অতলান্তিকের উপকূলে যাঁরা প্রথম বসতি স্থাপন করেন, কী করছেন তা

এঁরা জানতেন। সচেতনতার সঙ্গেই তাঁরা পরীক্ষার কাজ চালিয়ে গেছেন, ছোট্ট একটা বাতি সহস্র বাতি জ্বালাতে পারে ; সেইরকম এখানে যে আলো জ্বালান হয়েছিল, তা অনেককে, বলতে গেলে সমগ্র জাতিটাকেই পথ দেখিয়েছে। আমেরিকানরা এখনও নিজেদের দিকে তাকান পরীক্ষকের দৃষ্টিতে, যেমন লিঙ্কন তাঁর গেটিসবার্গ ভাষণে গৃহযুদ্ধের ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণের সরকার সম্ভব কিনা, এতে তার পরীক্ষা হয়ে গেল।

শিল্পবাদ মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে স্থান, স্থায়ী গৃহ, নিজের কর্মদক্ষতার গৌরব উপলব্ধি করা যায় এমন চাকরী থেকে। জীবনের সঙ্গে মানুষের বন্ধন ছিন্ন হয়েছে। শান্তিপ্রদানকারী পারিবারিক জীবন প্রকৃতি, ঋতু, উর্বরা পৃথিবী—জীবনের তাৎপর্যের জন্য এই সব প্রতীকই ব্যবহৃত হত। শিল্পবাদ এদের অর্থহীন করে দিয়েছে।

তবে সাম্প্রতিক কালে সেই অর্থ আবার ফিরিয়ে আনছি। সমাজবিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি, জন ডিউই'র লেখনী, শিল্পের ক্রমবর্ধমান সমাজজ্ঞান, নতুন গৃহ ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় সমাজ সচেতনতা, স্কুলগুলোর সাহায্যসূচী এবং আরও শত শত পথে আমাদের সংস্কৃতি মানবীয় কার্যক্রমের অর্থ খুঁজে বার করছে এবং আগেকার দিনের সেই সহযোগীতার দিনগুলোকে ফিরে পেতে চেষ্টা করছে।

আমেরিকানরা, মনে হয়, সব সময়েই একসঙ্গে, দলবদ্ধ ভাবে কাজ করতে চেয়েছে। সুরুতে দল বলতে ছিল পরিবার। আমাদের দল, ক্লাব, সংগঠন, রাজনৈতিক দল এবং সজীব সমাজের অন্য সকল রকম দলীয় কার্যক্রমে—এই পারিবারিক পদ্ধতিটিই অনুসৃত হয়। আবেগসৃষ্ট সংস্কৃতিকে ভিত্তি করেই রচিত হয় সকল সমাজ, এবং যেহেতু শৈশবের মেলামেশা থেকেই আবেগ জন্ম নেয়, সকল সমাজকেই পারিবারিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে তার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। সম্প্রদায় সমাজের একটি কেন্দ্র, পরিবারের আবেগসৃষ্ট সংস্কৃতি যার দিকে সম্প্রসারিত হয়েছে। কলেজগুলোকে আমরা যে 'সহৃদয়া মা'* বলি সেও একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়। চার্চকে মা, দেশকে পিতৃভূমি, গোপন নির্দেশকে ভ্রাতৃত্ব বলি আমরা। পারিবারিক অনুভূতি আর প্রতীককে সম্প্রদায়ের স্তরে নিয়ে যাওয়ার অর্থই হল গণতন্ত্রের যুক্তিগ্রাহ্য পরিণতি, জাতি ও বিশ্ব আশা করে যে নাগরিকেরা সামাজিক রূপান্তরে সক্রিয়ভাবে

* alma mater

আগ্রহ দেখাবে। আগেও বলেছি, গণতন্ত্র শুধুমাত্র এক ধরণের সরকার নয়, এ হল এক ধরণের জীবনযাপন প্রণালী।

স্কট ফিটজারাল্যাণ্ড বলেছেন, "আমেরিকা হল অন্তরের ইচ্ছা।" একে যদি ভাবাবেগ বলে মনে হয়, স্বীকার করতে বাধা নেই, আমেরিকাও ভাবাবেগে আপ্লুত হয়।

বিশ্ব সমাজ ও যুক্তরাষ্ট্র

অনেক বছর ধরে নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিপ্লব, সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার, ব্যক্তির অধিকার, গণতান্ত্রিক সরকার, সকলের প্রতি ন্যায় বিচার ও সমান ব্যবহার—এই ছিল আমেরিকার আদর্শ। বহু বছর ধরে আমরা ছিলাম বিশ্বের বিবেকের প্রতিনিধি। পররাজ্য আক্রমণকে নিন্দা করেছি, সকল দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছি; পলাতক দেশভক্তদের আশ্রয় দিয়েছি, দেশের অর্থ দিয়ে বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনকে সাহায্য করেছি। একই সঙ্গে আবার পৃথিবীর ঝগড়া-বিবাদ থেকে আমরা দূরে থাকতে চেয়েছি, ওয়াশিংটনের উপদেশ আর 'মনরো ডক্ট্রিনের' নীতি অনুযায়ী।

একথা সত্যি যে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে আমরা স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছিলাম এবং প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে ফিলিপাইনে প্রসারিত হয়েছিল আমাদের দখলকারী মনোবৃত্তি। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের দিকে এই বিচ্যুতিতে আমরা লজ্জিতই হয়েছিলাম এবং দখলকরা জায়গাগুলোকে কখনই অধিকৃত এলাকা হিসেবে দেখি'নি। অবিলম্বে ফিলিপাইনকে স্বাধীনতা দেবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকি। ইউরোপীয় ধাঁচের সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যখনআমরা জড়িয়ে যাই, যেমন চীনের বকসার বিদ্রোহ, ক্ষতিপূরণবাবদ প্রাপ্ত টাকাটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চীনা ছাত্রদের শিক্ষার জন্যেই ব্যয় করি।

আমেরিকার অন্যান্য অংশের প্রতি সৎপ্রতিবেশীর সমবেদনশীল নীতি, যা অন্যান্য আমেরিকান রাষ্ট্রের সঙ্গে বহু চুক্তি ও সম্মেলনের মধ্য দিয়ে অনুসৃত হয়েছে, ফিলিপাইনকে স্বাধীন করবার কার্যসূচীর রূপায়ন, ঔপনিবেশিক বাসিন্দাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি কারণ আমরাও একসময় ঐ দলে ছিলাম, ১৯২০ ও ১৯২১ সালে শান্তিকামী নীতির সমর্থক হিসেবে নৌবাহিনী এক রকম গুটিয়ে ফেলা, এমন কি স্বীয় স্বার্থরক্ষার্থেও শক্তি প্রয়োগ না করার শপথ (১৯৩৩ সালের মন্টেভিডো সম্মেলন এবং ১৯৩৬-এর বুয়েনস এরেস সম্মেলন) গুয়াম অথবা ফিলিপাইনকে সামরিক শক্তিতে পরিণত না করতে সম্মতি দান (১৯২২ ও ১৯৩০)—এরকম আরও ঘটনায় প্রকাশ পায় আমাদের শান্তিপ্রিয়তা আর ছোট রাষ্ট্রসমূহের স্বাধানতাকামী মনোভাব। এ মনোভাব এত দৃঢ় যে স্বেচ্ছায় নিজেদের বেশ কিছু সামরিক শক্তি হ্রাস করেছি কিছুটা নিরাপত্তা লাঘবের বিনিময়ে—তাকে সফল করবার জন্য।

তিরিশ দশকে আমরা অনেক পারস্পারিক বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছি বিশ্বের অর্থনীতি কাঠামোর উন্নতি সাধনের জন্যে। ১৩৩৯ সালে কর্ডেল হাল জানাতে পেরেছিলেন যে, বিশ্ববাণিজ্যের পাঁচভাগের তিনভাগের মতো এলাকার উনিশটি দেশের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এর ফলে শুল্কের উচ্চ প্রাচীর লঙ্ঘন করা সম্ভব না হলেও, তার উর্দ্ধগতি রোধ করা সম্ভব হয়েছিল।

ইতিমধ্যে শান্তি রক্ষাকে কায়েমী করবার জন্যে আমরা একটার পর একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছি। এই কাজগুলোকে অর্থহীন আর শোচনায় ভাবে বিপরীত বুদ্ধির পরিচায়ক মনে হলেও, এর মধ্যে প্রকাশ পায় আমাদের গভীর অনুভূতি যার মূল কথা হল যুদ্ধ একটি অপরাধ এবং যে কোন রকমে হোক, শুধুমাত্র আমাদের মৌলিক স্বাধীনতা আর সরকার গঠনের ধাঁচ বিসর্জন দিতে না হলে, তাকে এড়িয়ে চলতে হবে। "জনকল্যাণে যুদ্ধ অথবা জন-অকল্যাণকর শান্তি বলে কিছু কোন দিনই ছিল না"—এই কথা কয়টি মার্কিন প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

১৯২৮ সালে আমরা কেলগ ব্রিয়াল্ড চুক্তিতে স্বাক্ষর করি। মার্কিন শক্তি আন্দোলন থেকে উদ্ভূত এই চুক্তিতে আমরা এবং অন্য উনষাটটি রাষ্ট্র যুদ্ধকে বে-আইনী ঘোষণা করেছি। আক্রমণকারীরা তখন নতুন করে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হচ্ছিল, তার মধ্যেই আমাদের সমরোপকরণ নির্মাতাদের আমরা দায়ী করলাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য, আমাদের কাজ করবার স্বাধীনতাকে সীমিত করলাম নিরপেক্ষতা আইনে, যা প্রকৃতপক্ষে হিটলার ও জাপানকে উৎসাহিত করা হল; তারা নিশ্চিত হল এই ভেবে যে তাদের আক্রমণকারীদের আমরা অস্ত্রশস্ত্র যোগাব না। মানচুরিয়া দখল থেকে পোল্যাণ্ড অভিযান অবধি আমেরিকা যুদ্ধের বাইরে থাকবার নীতি অনুসরণ করার ফলে, আক্রমণকারীদের সাহস বাড়িয়ে দিয়ে তাদের সরাসরি বিশ্বযুদ্ধে এগিয়ে দিয়েছে।

দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়কালে বিশ্বযুদ্ধের বাস্তবতার স্থলে স্থান দিতে চেয়েছি নৈতিক আইনসম্মত দৃষ্টিভঙ্গীর। অর্থ-নৈতিক কারণগুলোর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা স্বীকার করিনি, শুল্ক বৃদ্ধি করে প্রাক্তন বন্ধুরাষ্ট্রসমূহকে ঋণ পরিশোধ করতে দিই নি। জাপানকে আক্রমণ করতে উৎসাহিত করেছি আমরা জাপানী বহিরাগতদের স্থান দিতে এবং জাপানী পণ্য ক্রয় করতে অস্বীকার করে। বাধ্য হয়েই জাপান অন্যত্র পণ্যদ্রব্যের বাজার আর কাঁচামালের সন্ধানে গেছে।

নিজেদের শক্তিতে বিব্রত বোধ করে, আমাদের আন্তর্জাতিক দায়িত্ব আমরা

এড়িয়ে চলেছি। সুরাকে বে-আইনী ঘোষণা করে মদ্যপান বন্ধ করা এবং অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ বে-আইনী ঘোষণা করে যুদ্ধকে বিদায় দেওয়ার নীতি এসেছে ক্যালভিনের সেই অদৃষ্টবাদ থেকে, যা নৈতিক আইন প্রবর্ত্তন করে পাপকে জয় করবার আশা রাখে। নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচকদের স্বীকার করা উচিত যে, আক্রমণের বিরুদ্ধে এই ঘৃণা না থাকলে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সর্বশেষ ব্যাপক প্রস্তুতি কখনই গণ-সমর্থন পেত না।

অন্য কোন দেশেই রাষ্ট্রনীতি এতটা গণ-সমর্থনের উপর নির্ভর করে না। শাসন অথবা কূটনৈতিক শিক্ষা বলে কিছু নেই। আমাদের দুরন্তবেগে সম্প্রসারিত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সকল জটিলতার কথা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তাই এই প্রসঙ্গগুলো এমন ভাবে আর ভাষায় তাদের কাছে হাজির করা উচিত, যা তারা সহজেই বুঝতে পারে। তাই এই গর্বিত নৈতিক সুর, যা সাগরপারের বন্ধুদের কাছে এত বিরক্তিকর মনে হয়। এই জন্যেই আমাদের রাষ্ট্রনীতি দুর্বল, ক্ষুদ্র রাষ্ট্র, স্বাধীনতা ও শান্তিকামী এবং বর্ধিষ্ণু অর্থনীতির পক্ষে, যাতে এরা উৎপাদনের কিছু অংশ নিজেরা ভোগ করতে পারে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং তার পরবর্তী অধ্যায়

আবার ইউরোপে যুদ্ধ বাধল এবং ফ্রান্সের পতন হল। আমাদের স্বাভাবিক বন্ধুরাষ্ট্র গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে যোগ দিলাম, 'অতলান্তিক সনদের' সেই মুক্তি স্বাধীনতা এবং অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক অধিকারের উপর জোর দেবার জন্যে। এ আমাদের চিরকালের আদর্শ, এ আদর্শে পৌঁছাবার লক্ষ্যে দ্রুত এগিয়ে যেতে না পারলেও।

যুদ্ধ শেষ হওয়া অবধি আমরা 'ল্যাণ্ড লীজ এড' অনুযায়ী ৯০ বিলিয়ন ডলার সাহায্য দিয়েছি। এছাড়া সৈন্য পাঠিয়েছি। রাশিয়াকে বন্ধুভাবে পাবার জন্যে এবং তাকে রাষ্ট্রীয় পরিবারে স্বাগত আহ্বান জানাবার জন্যে আমরা, এমন কি, অতলান্তিক সনদ এবং আমাদের নিজেদের আদর্শ লঙ্ঘন করেছি। রাশিয়াকে বল্টিক রাষ্ট্রসমূহ, পোল্যাণ্ডের পূর্ব সীমান্ত উপহার দিয়েছি, বলকান অঞ্চল এবং মাঞ্চুরিয়ায় রাশিয়ার প্রভাব মেনে নিয়েছি। হিটলারের সৈন্যবাহিনী যখন রাশিয়াকে আক্রমণ করে তার নিজের সীমান্তের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল, আমরা

- চাওয়া অবধি সাহায্য প্রেরণ না করে নিজেদের সুবিধামত সর্তানু-

স্থায়ী সাহায্য দিতে পারতাম। কিন্তু আমরা আরও উদার হতে চেয়েছিলাম, কারণ আমরা সম্মানজনক ব্যবস্থাতেই বিশ্বাস করি।

যুদ্ধ শেষ হতেই আমাদের সৈন্যবাহিনী ভেঙ্গে দেওয়া হল, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হল, যুদ্ধকালীন এজেন্সীগুলো বন্ধ হল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে দীর্ঘদিনের ক্লান্তির পর, যুদ্ধাবসানের প্রশান্তি ফিরে পাব আশা করলাম। বিশ্বের সঙ্গে আনবিক শক্তি ভাগাভাগি করে নেবার প্রস্তাব করলাম আমরা। আধুনিক যুদ্ধকে বে-আইনী করবার জন্য অ্যাচিসন-লিলিয়েনথাল প্রস্তাবে আমরা অনেক কিছুই ছেড়ে দিতে চেয়েছি, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এই আশায়। রুশ সরকার আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না, জবাবে কিছু কৌতুক পরিবেশন করলেন শুধু।

এদিকে রাশিয়া ব্যস্ত হয়ে উঠল তার সাম্রাজ্য বিস্তার করতে। বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ গ্রাস করলে, পূর্ব জার্মাণীর সোভিয়েটিকরণ হল, পোল্যাণ্ডের দখলদারী নিল, তারপর ধীরে ধীরে চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া এবং আলবেনিয়াও রাশিয়ার শাসনাধীনে চলে গেল। রুশ প্রভাবাধীনে এলাকার সঙ্গে সংযুক্ত হল ৩৯২০০০ বর্গ মাইল এবং রাশিয়ার প্রজায় পরিণত হল আরও নয় কোটি মানুষ। এই সময়ে আমেরিকা ফিলিপাইনকে স্বাধীনতা দেবার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করল এবং গ্রেট ব্রিটেন ভারতবর্ষ, পাকিস্থান, সিংহল ও ব্রহ্মদেশকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি দিল। নেদারল্যাণ্ডস্ থেকে মুক্ত হল ইন্দোনেশিয়া ; এই পরিবর্তনের ফলে ৫৫৫,০০০,০০০ মানুষ আর ২,৮৯৪,০০০ বর্গমাইল স্বাধীনতা পেল।

এর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পর পর অনেকগুলো সম্মেলনের আয়োজন করেছে যার ফলে গঠিত হয় রাষ্ট্রসংঘ। আমেরিকানদের আশা ছিল জাতিসংঘ (লীগ অব নেশন্‌স্) আন্তর্জাতিক শক্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে ব্যর্থ হলেও, এই নতুন সংগঠন সফল হবে। কিন্তু রাশিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহকে গ্রাস করবার এবং দূরবর্ত্তী রাষ্ট্রসমূহকে তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করবার সংকল্পের ফলে তা সম্ভব হয়নি। এও সুস্পষ্ট হল যে অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রেও (রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে) সহযোগীতার ইচ্ছাও তার নেই। তার আগ্রহ শুধু কুটিল রাজনীতিতে।

১৯৪৭ সালে গ্রেট ব্রিটেন যখন ঘোষণা করল যে তুরস্ক ও গ্রীসকে আর অর্থ-নৈতিক ও সামরিক সাহায্য দেবার ইচ্ছে তার নেই, তখনই আমরা উপলব্ধি

করলাম যে আমাদের শক্তি আমাদের উপর এমন দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে যা এড়ান যায় না। 'ট্রুম্যান ডকট্রিন' গৃহীত হবার পর মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তিত রূপ চূড়ান্তভাবে নির্দ্ধারিত হল। আর নিজেদের নিরাপদ সীমান্তে ফিরে আসার স্বপ্নে ভুল বোঝবার পথ নেই। গ্রেট ব্রিটেন সাগরপথগুলি পাহারা দিয়ে সামরিক শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করবে অথবা প্রতিটি জরুরী সমস্যার সমাধানে রাষ্ট্রসংঘ এগিয়ে আসবে, এমন আশা করবার উপায় নেই। রাশিয়ার ক্ষমতা যতদিন সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের দিকে এবং অশান্তি ও বিদ্রোহ সৃষ্টির দিকে ধাবিত হবে, আমাদের রাষ্ট্রই একমাত্র শক্তি যা আসন্ন যুদ্ধবাদী জগতে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে।

ট্রুমান ডক্ট্রিনের সারকথা হল "সশস্ত্র সংখ্যালঘুর দাসত্ব অথবা বাইরের চাপের বিরুদ্ধে স্বাধীন দুর্বল জাতিসমূহকে সাহায্য করাই হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি।'

ইউরোপের অর্থ নৈতিক সঙ্কটের মোকাবিলা করবার জন্যে আমরা এগিয়ে এসেছি মার্শাল পরিকল্পনা নিয়ে। কোন দেশকে অর্থ-নৈতিক সাহায্যদানের এর চেয়ে ব্যাপকতর প্রস্তাব অন্য কোন দেশ কখনও করেনি। সাহায্যপ্রাপ্ত দেশগুলোকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করার কোন বাসনাই ছিল না এই পরিকল্পনায় সাহায্যপ্রাপ্ত দেশগুলো তাদের প্রয়োজনমত স্বাধীনভাবে চলুক, এই ছিল উদ্দেশ্য। এর মধ্যে আমাদের স্বার্থও জড়িত ছিল, কারণ সারা স্বাধীন দুনিয়ায় সুস্থ অর্থনীতিকে আমাদের নিরাপত্তার পক্ষে অপরিহার্য বলেই ধরে নিয়েছি আমরা।

১৯৪৭ সালে পশ্চিম দুনিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে আমরা প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদন করি এবং প্রতিরক্ষা দপ্তর স্থাপন করে আমাদের সামরিক শক্তিকে সংহত করি। পরবর্তী বৎসরগুলোতে এই চুক্তির সীমা সম্প্রসারিত হয়, ইউরোপ ও প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলও তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৪৮ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিষ্ট বিদ্রোহ সম্ভব হয়েছিল সীমান্তের নিকটে শক্তিশালী রুশ সৈন্যবাহিনী ছিল বলেই। আমরা এই সময় উপলব্ধি করলাম যে আমাদের প্রতিরক্ষা নীতির প্রতি উদাসীন থাকলে চলবে না। জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিচার করলে রাশিয়ার সামরিকবাহিনী আমাদের তুলনায় সাড়ে তিনগুণেরও অধিক।

অতঃপর কোরিয়া আক্রান্ত হল। সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে কমিউনিষ্ট নেতারা তাঁদের অন্যান্য দেশ দখলের কার্যসূচী রূপায়িত করবার জন্তে যে কোন জায়গায়

যুদ্ধের ঝুঁকি নিতেও পেছপা হবে না। তবে আমেরিকার তৎপর ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র সংঘের সঙ্গে সঙ্গে সমর্থনের ফলে সে হুমকী কার্যকরী হয়নি।

নিজের দেশের ঔপনিবেশিক দাসত্ব অবসানের যুদ্ধের মধ্যেই আমেরিকা নতুন করে জন্ম নিল এবং দক্ষিণ আমেরিকা, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও অন্যান্য স্থানে সে স্বাধীনতাকামীদের সমর্থকের ও সাহায্যকারীর ভূমিকা নিয়েছে।

অপর দিকে রাশিয়া তার চারপাশের স্বাধীন দেশগুলোকে গ্রাস করতে ব্যস্ত ছিল, তবুও সে দেখাতে চেষ্টা করে যে আমেরিকা ঔপনিবেশিকতার পক্ষপাতী। এ কথা সত্যি যে ইউরোপের মিত্র রাষ্টসমূহকে সাহায্য করবার সময় আমরা আল· জেরিয়া প্রভৃতি উপনিবেশ এলাকাগুলোর আদি অধিবাসীদের সমস্যাগুলো তত আমল দিই নি বরং সেখানে জন্মেছে এমন ইউরোপীয়দের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দেবার দরকার ছিল, তবুও গত দশ বছরের যে কোন নিরপেক্ষ পর্যালোচনা থেকে সুস্পষ্ট হবে যে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা অর্জনে যখন সাহায্য করেছে, রাশিয়া তখন কাদের দাসত্ব শৃঙ্খল পরিয়েছে অথবা প্রতিবাদ করলে তাদের নির্মূল করে দিয়েছে।

বিরোধীরা অস্ত্র ত্যাগ করলে আক্রমণকারীরা ভয় পায় না এই কঠোর সত্যটা উপলব্ধি করবার পর, আমেরিকার জনগণ অবশেষে আক্রমণ প্রতিহত করার নীতি গ্রহণ করেছে—নিজেদের পর্যাপ্ত সামরিক শক্তি রক্ষা করে এবং বন্ধুরাষ্ট্র-সমূহের সঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষমতা ভাগ করে নিয়ে। দুনিয়াকে তাঁবে আনার সোভিয়েট মতলবের বিরোধী রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবার জন্যেই এই ব্যবস্থা। এই কঠিন এবং ব্যয়বহুল সিদ্ধান্ত করবার পরেই আমেরিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি হল দেখে বিস্মিত হতে হয়। শেষ পর্যায়ে আমেরিকা এইটুকু শিখেছে যে নিজেদের শক্তিসামর্থ বজায় রেখে যুদ্ধ প্রতিরোধ করাই তার দায়িত্ব। এখন এই জন্যই আমেরিকাকে যুদ্ধের সমর্থক বলে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে, অথচ এ রকম কিছু করা হয়নি বলেই উভয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েই আমেরিকা কর্তব্যে অবহেলা করেছে বলা হয়েছে।

এখনও যুদ্ধমুক্ত বিশ্বের স্বপ্ন দেখি আমরা, তাই বারংবার চেষ্টা করা হয়েছে নিরস্ত্রীকরণ চুক্তির জন্যে। প্রথম প্রয়াস আনবিক যুদ্ধ বে আইনী ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে, তার পর পর্যবেক্ষণ সূচীর মাধ্যমে সামরিক ঘাঁটিগুলির দেখবার ব্যবস্থা করা কারণ তা না হলে নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে। বছরের পর বছর ধরে ধৈর্য সহকারে যে আলোচনা চালান হয়েছে, তার থেকে শুধু

একটি মাত্র ফলই পাওয়া গেছে ; প্রমাণিত হয়েছে যে রাশিয়া সত্যকার কোন পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থায় কিছুতেই সম্মত হবে না।

যুক্তরাষ্ট্র তার অতীত ইতিহাসের বড়াই করতে পারে, কারণ সোভিয়েট রাশিয়া যেমন ফিনল্যাণ্ড আর পোল্যাণ্ডকে আক্রমণ করেছিল আমরা কোন দিনই তেমন কিছু করি নি। লক্ষণীয় ভাবেই আমরা ঐ সব ব্যাপার থেকে মুক্ত ছিলাম, আর এসবের জন্যে যা বদনাম হয়েছে তা কোন তৃতীয় শক্তির যাকে প্রায়শঃই সেকেলে কূটনীতির আশ্রয় নিতে দেখা গেছে। এমন কি মাঞ্চুরিয়ার উপর রুশ প্রভাব সম্পর্কিত ইয়ালটা চুক্তি অনুসারে (যা অধিকাংশ আমেরিকানকেই লজ্জা দিয়েছে) চীন শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার জন্যে যেটুকু অংশ ছেড়ে দিতে সুপারিশ করতে চেয়েছিল, তার থেকে অধিক দিয়ে বসল।

যুদ্ধ সাধারণতঃ যে ধরণের সামরিকীকরণ, ঋণ, উঁচুহারে কর আর ধ্বংস বয়ে আনে, যে সভ্যতা প্রচুর উৎপাদনকে মূল্য দেয় তার কাছে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে মনে হবে শিল্পপতিরা যুদ্ধমনোভাবাপন্ন তার মোটা মুনাফার জন্য—এই যুক্তির জবাবে দেখান যায় যে নতুন করে যুদ্ধকালীন কণ্ট্রাক্ট স্থির করবার মার্কিনী ব্যবস্থার ফলে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে এবং শেষ হবার পরে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে ১০, ৪৩১, ৬৩১,০০০ ডলার ফেরৎ দেওয়া হয়। বাকী মুনাফার উপর সাধারণ হারে ধার্য করের তুলনায় শতকরা পচানব্বুই ভাগের উপর অধিক হারে কর চাপান হয়। এরপর মুনাফার যে অংশটুকু ব্যক্তি বিশেষের পকেটে গেছে, তার উপর ধার্য হয়েছে ক্রমবর্ধমান হারে আয়কর।

যে শত্রু সশস্ত্র অভিযানকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করেন, মার্কিন জনগণ তার সঙ্গে এঁটে উঠবে কি করে? ঐ ভাবে তারা কখনই ভাবতে পারবে না। সব সময়েই তারা বসে থাকবে কবে শত্রুপক্ষ প্রথম আঘাত হানে কারণ যুদ্ধকে তারা কখনই নীতিকৌশল হিসেবে দেখেনি এবং নীতি যে সরকার অনুসরণ করবেন তার পক্ষে জনগণের সমর্থন পাওয়াও সম্ভব নয়।

চিরকালই দুনিয়ায় আমরা নৈতিক ভূমিকা নিয়েছি (কারণ আগেই বলেছি) স্বাধীনতায় আমাদের বিশ্বাস আজকের নয়। যে সরকার আমাদের এই মূলমন্ত্রের বিরোধী তাকে বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সোভিয়েট শক্তিকে সংযত রাখবার আর কোন উপায় নেই, যেমন হিট্লার

আর মুসোলিনীর ঔদ্ধত্যের সময় রাশিয়াকে মিত্ররাষ্ট্র হিসেবে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এমন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে হবে, যা বিশ্বের সকল প্রান্ত থেকে আগত মার্কিন জনগণের সমর্থন পায়। বিদেশী ভাষাগোষ্ঠী-সমূহ বিশেষ দাবী করতে পারে, যেমন আমেরিকান পোলিশ অ্যাসোসিয়েসনের কো-অর্ডিনেটিং কমিটি দাবী করেছিল, সকল সোভিয়েট তাঁবেদার সরকারসমূহ থেকে যেন আমাদের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করি এবং নির্ব্বাসিত সরকারসমূহকে সমর্থন করি। শ্রমিক, ব্যবসায়ী, কৃষক, প্রবীণ, মহিলা এবং ধর্মীয় গোষ্ঠীসমূহও পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে আগ্রহশীল এবং ওয়াশিংটনে নিয়ত তাঁদের কথা শুনিয়ে যান।

আমাদের অন্যান্য দেশ থেকে আগত প্রবাসীদের সম্পর্কে অনুসৃত নীতি সম্পর্কেও প্রতিযোগী শক্তিসমূহ কাজ করছে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে বিদেশীদের যে আতঙ্কজনক বন্যা এই দেশে প্রবাহিত হয়েছে, তার গতি নির্ঘাত আমাদের গ্রহণক্ষমতার অধিক ছিল। তখন কংগ্রেস বহিরাগমন সীমিত করে পরপর কতকগুলো আইন প্রণয়ন করে। সর্বশেষ আইন হল ১৯৫২ সালে প্রবর্তিত ম্যাককারাণ-ওয়ালটার আইন। এর ফলে আশ্রয়দানের পক্ষে উপযুক্ত অনেক ভাগ্যহীনের, যাঁরা অতীতে শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের দিকেই তাকিয়েছে আশ্রয়ের আশায় আর দারিদ্র্য আর নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্যে, আমেরিকায় আসা বন্ধ হয়েছে। এর ফলে সমগ্র বিশ্বে নির্যাতীতের ভরসার স্থল হিসেবে যে চিত্র অঙ্কিত ছিল, তাও অস্পষ্ট হয়ে গেল।

চলতি আইনের সংশোধনকল্পে অনেকগুলো বিল উত্থাপিত হয়েছে, প্রশাসন ব্যবস্থা এবং অনেক ধর্মীয়, পৌর, শিক্ষক এবং শ্রমিক সংগঠনের সমর্থনও পেয়েছে। এঁরা সকলেই পরদেশে বাস সম্পর্কে আরও উদার নীতি দাবী করছেন। হাঙ্গেরীর কমিউনিষ্টতাণ্ডব কর্তৃক বিতাড়িত বাস্তহারাদের আশ্রয় দেবার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবে বিশ্ব-পরিস্থিতির জন্য বিদেশীদের এদেশে আগমন নীতি সম্ভবতঃ আরও বহু বছরের জন্যে বিতর্কের বিষয়বস্তু হয়ে থাকবে।

শতাধিক বছর যে রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি বলে কিছু ছিল না, যাকে বয়ঃবৃদ্ধ রাষ্ট্রসমূহ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যা শিখেছে, বাধ্য হয়ে রাতারাতি তা শিখে ফেলতে হয়েছে, তার ক্ষেত্রে এ রকম অসুবিধা হওয়াটাই স্বাভাবিক। পররাষ্ট্র-

নীতির ক্ষেত্রে আমরা যথেষ্ট কৃতিত্বের অংশীদার হয়েছি এবং আমাদের জনসাধারণ তাদের নৈতিক আর বৈষয়িক সম্পদ সারা বিশ্বের জীবনধারণের মান উন্নয়ন ও মুক্তির জন্যে নিয়োগ করতে কৃতসংকল্প।

১৯৪৬ পর্যন্ত নিরপেক্ষতা ছিল আমাদের চলতি ক্রুটী। অবশেষে আমরা জেগে উঠেছি। আমাদের আগেকার সেই নীতি ভারতবর্ষের ন্যায় দেশগুলিকে অনুসরণ করতে দেখে আমরা দুঃখ পাই। অথচ আমাদের স্বাধীনতার লড়াই শেষ হবার পর যে পরিস্থিতি দেখা দেয়, ভারতবর্ষ তার মধ্য দিয়েই যাচ্ছে। আমাদের একমাত্র চিন্তা ছিল বিজিত দেশকে কি করে গড়ে তোলা যায়।

আমরা গুরুতর দায়িত্ব আর উত্তেজনার ঝুঁকি নিয়েছি বলেই মনে হয়েছে যে এই প্রয়াসের পুরস্কার হিসেবে ভালবাসা অথবা শ্রদ্ধা পাব। তাই অত্যন্ত ব্যথা পাই যখন দেখি আমাদের মিত্ররাষ্ট্রসমূহ কঠোর ভাষায় আমাদের জীবনযাপন পদ্ধতির বিরূপ সমালোচনা করেন, আমাদের দক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন অথবা আমাদের শক্তি দেখে ক্রুদ্ধ হন। দেখতে পাই ইউরোপ আমাদের কাছ থেকে উন্নত ধরণের আচরণ আশা করেন, অথচ সুখী হয় আমরা অধঃপাতে গেলে। পি জি ওর্‌সগ্রোন * ঠিকই বলেছেন, ইউরোপ আশা করে যুক্তরাষ্ট্র একই সঙ্গে নিজের এবং বিবেকের তাড়নায় অন্যান্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করবে অথবা ইউরোপের মর্জিমত অন্য কিছু হবে। তাই গ্রেট ব্রিটেন চেয়েছে ইন্দোচীনে আমরা আমাদের ঔপনিবেশিকতা বিরোধী নীতির উপর জোর দিই। কিন্তু ইরাণে সে চায় আমরা আদর্শবাদ ভুলে যাই আর ব্রিটীশের ঔপনিবেশিক নীতি সেখানে সমর্থন করি।

মার্কিন কূটনীতিকে আরও যে একটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় সে হল তাকে সকল রকমের সলাপরামর্শ করতে হয় আলোকিত মঞ্চের উপর থেকে (আমাদের সরকার যা নীতিগত ভাবে সমর্থন করেন)। সামনে থাকে সাংবাদিকগণ, স্বাভাবিকভাবে যারা বিরোধ আর মতানৈক্যের উপর জোর দেয়, প্রতিটি পরিস্থিতি যুক্তরাষ্ট্রের জয় হল কি পরাজয় হল তার ভিত্তিতে পর্য্যালোচনা করে। অথচ অনিবার্য্য কারণে কূটনীতি মানেই হল আপোষ। রাষ্ট্রসংঘের সংগঠনগুলোর উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পূর্ণ বিবরণ ও প্রচুর প্রকাশ পারস্পরিক আলোচনার উপর আস্থা ফিরিয়ে আনবে।

* এনকাউন্টার, তৃতীয় সংখ্যা (অক্টোবর, ১৯৫৪) ১৫-২২ পৃষ্ঠা।

দুঃসাহসিক নতুন কার্যক্রম

আক্রমণের হুমকী ক্রমশঃ পরিব্যাপ্ত হল এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়, বাধ্য হয়েই যুক্তরাষ্ট্র অর্থ-নৈতিক সাহায্যদানের বদলে সামরিক সমঝোতার উপর জোর দিল। তবুও যুদ্ধের পর থেকে এযাবৎ যে অর্থ-নৈতিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে তার পরিমাণ ৫৬ বিলিয়ন ডলারের অধিক। অঙ্কটা এত অধিক যে কত তা ভাবাই দুঃসাধ্য। এর উপর রয়েছে বিদেশে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ। সেও ১০ বিলিয়ন ডলারের মতই হবে। প্রায়শঃই মুনাফাবাজরা লাভের টাকা চোরা পথে পাচার করছে। প্রায়শঃই অর্থ সাহায্য করা হয়েছে আমাদের সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ রাষ্ট্রসমূহে, সমানভাবে প্রয়োজন থাকলেও অন্যান্য অনুন্নত দেশে এই সাহায্য যায়নি। তবুও একথা বলা চলে যে অর্থ-নৈতিক সাহায্যের এমন দৃষ্টান্ত মানুষের ইতিহাসে আর পাওয়া যাবে না।

ইউরোপীয় শিল্পকে যে জীবনীশক্তি দেওয়া হয়েছে তার ফলে সেখানকার উৎপাদন যুদ্ধ পূর্ব সময়ের তুলনায় শতকরা সত্তর ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর উপরে আমেরিকান টুরিষ্ট আর সৈন্যেরা দিয়েছে ফি বছরে ৩২ বিলিয়ন ডলার। এর ফলাফল ইউরোপের প্রতিটি গৃহেই অনুভব করা যাবে। বৃটেনের প্রখ্যাত-নামা অর্থনীতিবিদ বারবারা ওয়ার্ড জোর করেই বলেছেন যে সাহায্যসূচী আমেরিকার বিশ্বনেতৃত্বের দাবীকে সুপ্রতিষ্টিত করেছে এবং "সেজন্যই স্বাধীন মানুষের ঐক্যসূত্র সুন্দর ভাবে গ্রথিত হয়েছে।"

ফরেন অপারেশন অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন-এর তৎকালীন ডিরেক্টর হ্যারল্ড, ই, ষ্ট্যাসেন-এর একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, কারিগরী সহযোগীতা কথাটি আর কিছুই নয়, মার্কিন সীমান্তে গড়ে ওঠা একটা অভ্যাসের, সৌখীন নামমাত্র—যেখানে নতুন বসতি অঞ্চলে অর্জিত অভিজ্ঞতা স্বেচ্ছামূলক সহযোগী-তার পথে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ান হত। তারপর সে সীমান্তের বসবাস সমস্যার সমাধান হত এবং সেখানকার অভিজ্ঞতা পরবর্তী আস্থানা স্থাপনে কাজে লাগান হত। 'পয়েন্ট ফোর প্রজেক্ট'-এর পিছনে এই নীতিই কাজ করেছে আর এজন্যেই মার্কিন আর অন্যান্য দেশের কারিগরী বিশেষজ্ঞরা স্বেচ্ছামূলক সহযোগীতার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছেন। এর ফলাফল দেখা যাবে হাসেমাইট রাজবংশের শাসনাধীনে জর্ডনের অনুর্বর, রন্ধ্রে —খাঁ খাঁ করা মরুভূমিতে, যেখানে আজ সতেজ সবুজ ঘাসের হ্রদ সৃষ্ট হয়েছে। এ জন্যেই ভারতবর্ষের গমের উৎপাদন পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আরও দৃষ্টান্ত দেখতে

হলে দৃষ্টি দিতে হবে ইরাণের কৃষি গবেষণার দিকে। তাকাতে হবে গ্রাম উন্নয়নের পরিকল্পনার দিকে, যা সমবায়পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে। বলিভিয়া থেকে লেবানন এবং পাকিস্থান থেকে থাইল্যাণ্ড অবধি বিরাট অঞ্চলে স্বাস্থ্য রক্ষার ও নিরাপদ পানীয় জলসরবরাহ করার ব্যবস্থা করেছে।

"পয়েন্ট ফোর' কার্যক্রমের বর্ণনায় লেবাননে বলা হয়েছে, এ হল এমন একটা বাহন যার মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, কারিগরী উদ্ভাবন এবং বৈষয়িক প্রগতি মার্কিন আদর্শ, মার্কিন আশা এবং মার্কিন আকাঙ্খার ভ্রমনসঙ্গী হয়েছে মানুষের মধ্যে সত্যকার ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে।

অপেক্ষাকৃত কম পরিধির হলেও চার্চ এবং 'কেয়ার', 'ওয়ার্ল্ড লেবাস''-এর ন্যায় সংস্থার উদ্যোগে পরিচালিত অনেক স্বেচ্ছামূলক পরিকল্পনাও উল্লেখযোগ্য, কারণ এই প্রয়াসগুলোর মধ্যে আমাদের সৌভাগ্য আর কারিগরী দক্ষতা অন্যের সঙ্গে ভাগ করে উপভোগ করবার ইচ্ছাই প্রকাশিত হয়েছে।

একটা ভাল দৃষ্টান্ত হলেন পল রাশ। এই আমেরিকান ভদ্রলোকটি যুদ্ধের পূর্বে টোকিওর এক বিশপের অধীনস্থ কলেজে অধ্যাপনা করতেন। যুদ্ধের পর জাপানে ফিরে গিয়ে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা আর সীমিত খাদ্য সরবরাহের নৈরাশ্য-জনক অবস্থা দেখে অভিভূত হয়ে পরেন। নিজের চেষ্টায় অর্থ সংগ্রহ করে ছোট্ট পাহাড়ী গ্রাম কিয়োসাটোতে পরীক্ষামূলক দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রামীন চর্চ্চা চালাতে লাগলেন। তিনি জানতে চাইলেন এতদিন অনুর্বর পড়ে থাকা পাহাড়ী জমিতে কিছু করা যায় কিনা। এখন কীপ * উনিশ রকমের সবজী আর সাত রকমের শস্য উৎপাদন করছে, হিয়ারফোর্ড আর জার্সি গরু ও আধুনিক ডেয়ারী, এবং হাজর হাজার মুরগী পালন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। তাঁর মার্কিন বন্ধুরা গোড়ার দিকে গরু আর মুরগী দান করে ছিল। চাষীদের মধ্যে যারা দশটা মুরগী পেয়েছে, দশটা ডিম মুরগীর বাচ্চা করবার জন্য এবং অপর চাষীকে দশটা স্বাস্থ্যবান মুরগী দিতে প্রতিশ্রুত আছে।

কয়েক বছর আগে যারা কোনমতে পেটে খেয়ে বেঁচে থাকত, এখন তাদের সেবায় নিয়োজিত হয়েছে একটা চার্চ, একটা গ্রন্থগার এবং একটা আধুনিক হাস-পাতাল। সবচেয়ে বড় কথা কিয়োসাটোর মানুষ জেনে ফেলেছে কি করে

* KEEP (kiyosato Educational Experiment Project.)

নিজেদের সাহায্য করতে হয় পারস্পরিক সাহায্যদানের পথে। নতুন রাস্তা নির্মাণের কাজে দুই শত লোকে এক একটা দল একসঙ্গে নেমে পড়ে। জোরদার 'ফোর—এইচ' আন্দোলন চলেছে। রুগ্ন কোন ব্যক্তির গৃহে অন্নাভাব দেখা দিলে, চার শত খামারের কর্মীরা একটি করে আলু নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে এবং চারটে সাড়ে-নয়-সেরি ধামায় সেগুলো ভর্তি করে তাদের উপহার পাঠায়। পূর্ববর্তী পাঁচ শতাব্দীতে যতটা এগিয়েছে, গত পাঁচ বছরে এখানকার সমাজ তার থেকে অনেক, অনেক বেশী এগিয়ে গেছে। হাজার হাজার দর্শক আসেন সেখানে কি হচ্ছে দেখতে। জাপানে অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চলেও পরিকল্পনানুযায়ী অনুরূপভাবে কাজ চলছে।

ঠিক এই ধরণের কাজ করবার ইচ্ছে আছে ক্লিফোর্ড ক্লিনটনের যাঁর 'লক্ষ লোকের খাবার' বিনালাভে সস্তায় সর্বার্থসাধক খাদ্য প্রয়োজনীয় অঞ্চলের চাহিদা মেটায়।

অ্যারিজোনার পশ্চিমের বিরাট শুষ্ক অঞ্চলের মধ্যে আট হাজার মানুষের বসতিপূর্ণ ছোট্ট শহর ফ্লাগষ্টাফ। এখানকার সংবাদপত্রে ঘোষিত হয়েছে নভেম্বর মাসে 'কেয়ার' ভাণ্ডারে যত ডলার সংগ্রহিত হবে, স্থানীয় প্রতিটি বাসিন্দা তত ডলার চাঁদা দেবেন। আর এই প্রতিটি ডলার থেকে বাইশ পাউণ্ড পর্য্যন্ত মার্কিন খামারজাত খাদ্যদ্রব্য পাঠান হবে সাগরপাড়ের সঙ্কটাপন্ন উনিশটি অঞ্চলের কোন না কোন উদ্বাস্তু অথবা বেকার পরিবারে। খামারজাত পণ্যের মধ্যে রয়েছে গরুর দুধ, চীজ, চাউল, বীন, ময়দা এবং শস্যজাত অন্যান্য খাদ্য।

এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছিল: 'বুভুক্ষু' মানুষের মুখে খাদ্য যোগাবার আর তাদের বন্ধুত্বভাবে পাবার মস্ত সুযোগ রয়েছে এর মধ্যে। ফ্লাগষ্টাফের জনসাধারণের এই খাদ্য প্যাকেটগুলো যারা পেয়েছে, তাদের দেখবার সুযোগ কোনদিনই হবে না। তবুও দান করে তারা আনন্দ পাবে। কমপক্ষে আরও পঞ্চাশটা স্বেচ্ছামূলক সাহায্য সংগঠন বাইরে সাহায্য পাঠাচ্ছে। এদের মধ্যে বড় দশটি সংস্থা ১৯৫৬ সালের প্রথম ছয় মাসে ১৬২,০০০,০০০ ডলার ব্যয় করেন।

'ওয়ার্ল্ড লেবর'-এর জন্ম জনৈক যাজকের ধর্মোপদেশ থেকে। তিনি বলেছিলেন, ব্যক্তিগত দানের উপর ভিত্তি করে রচিত স্থানীয় সাহায্যসূচীই কমিউনিজম-এর শ্রেষ্ঠ জবাব। এই সংস্থা এশিয়ায় ও আফ্রিকায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ও কৃষি সম্পর্কে পরীক্ষামূলক সূচী অনুসরণ করে যাচ্ছেন। শুধুমাত্র যেখান থেকে

ডাক আসে, সেখানেই যায় এই সংস্থা। এর বৈশিষ্ট হল গ্রামবাসীকে নিজেদের সাহায্য করতে, সাহায্য করা। কৃষি, কারুশিল্প, স্বাস্থ্য ও শিশুস্বাস্থ্য সম্পর্কে পরীক্ষাকার্য্য প্রদর্শন করেই এই কাজ করা হয়।

'ওয়ার্ল্ড লিটারেসি'র কাজ হল ডাঃ ফ্রাঙ্ক লবাচ-এর প্রাপ্তবয়স্কদের পড়ানোর পদ্ধতি অনুসরণ এবং সেই পথে কৃষি ও স্বাস্থ্য বিষয় সহায়ক যন্ত্রাদি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হতে সাহায্য করা। 'ফষ্টার পেরেন্টস্ প্লান ফর ওয়ার চিল্ডরেন', 'সেভ দি চিল্ড্রেন ফেডারেশন', 'ন্যাশানাল কমিটি ফর এ ফ্রি ইউরোপ', 'ক্রুশেড ফর ফ্রীডম', 'ইন্টারন্যাশানাল রেসকু কমিটি' প্রভৃকি বহু সংগঠন প্রচুর স্বেচ্ছাদান সংগ্রহ করেছে সাগরপারের দুর্দশাগ্রস্ত দেশগুলিতে ব্যয় করবার জন্যে।

অনেক কিছু হতে পারে যদি আরও মার্কিন স্বেচ্ছাসংগঠন, শ্রমিক ইউনিয়ন, বিজ্ঞদের সংগঠন এবং রোটারি ক্লাবের ন্যায় সাহায্য ক্লাব প্রভৃতিদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এবং সাহায্যপোযোগী দেশের অনুরূপ সংগঠনের সঙ্গে সহযোগীতা করে। বিভিন্ন সরকারের মধ্যে যে কূটনৈতিক সম্পর্ক, তাতে তেমন ঘনিষ্ঠতা আসতে পারে, না যা জগতকে জানবার জন্যে দরকার এবং সত্যিকার বিশ্বসমাজ ততদিন কিছুতেই গড়ে উঠবে না যতদিন না লক্ষ লক্ষ মানুষ মেলামেশা আর ভাবের আদান-প্রদান করবে। ঘনিষ্ঠতা আসতে পারে শুধুমাত্র ভাবাবেগের মধ্য থেকেই।

অনুমান করা যাক্ এমন ভাবের আদান-প্রদান কুড়ি, ত্রিশ কি পঞ্চাশ বছর ধরে অপ্রতিহতভাবে চলল। তা হলে কি আজকের সংস্কার আর শত্রুভাব কি লোপ পাবে না? আমেরিকার ক্ষেত্রে কন্‌ফেডারশনের সময় যা আমাদের পৃথক করে রেখেছিল, তা তো আজ আর নেই! একথা কি চিন্তা করা যায় না যে, মানুষের এই স্বেচ্ছায় কাজ করে যাবার ফলে যে সংগঠন গড়ে উঠবে, তা একদিন রাষ্ট্রসংঘকে প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত করবে, যেমন আমাদের জাতীয় সংগঠনগুলো যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে?

নতুন বিশ্ব সংস্কৃতি

নিয়ত সঙ্কটাপন্ন বিশ্বে সত্যকার সৌহার্দ্যের ভাব প্রতিষ্ঠাকল্পে যুক্তরাষ্ট্র কি করতে পারে?

সঙ্কটের সঙ্গে আর যে দুটো চীনদেশীয় বৈশিষ্টতা মিশেছে তা হল বিপদ আর সুযোগ। মানুষের ইতিহাসে এমন বিশ্রীভাবে এই দুটো আর কখনও

মেলেনি। এখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং ঐশ্বর্য্যের আশায় আমাদের পথ আটকে গেছে মনুষ্যসৃষ্ট বিরোধ দিয়ে—বুভুক্ষা আর ব্যাধির অলঙ্ঘনীয় অন্তরায় আর নেই।

চেষ্টার বোল্স ঠিকই বলেছেন. "মধ্য দুনিয়ার জনগণকে, যে চারটে বৈপ্লবিক চিন্তা চালিত করে" তা হল জাতীয় স্বাধীনতা, মানুষের মর্যাদা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও শান্তি। লৌহ যবনিকার কোন দিকে এই উদ্দেশ্যগুলো চরিতার্থ হতে পারে, তা কোন নিরপেক্ষ ছাত্রের পক্ষে বোঝা কঠিন হবার কথা নয়।

মার্কসবাদীদের মতো আমাদের কোন পেটেন্ট ওষুধ নেই যা সবরকম খারাপকে ভাল করে দিতে পারে। কিন্তু এই তথ্যের উপরেই তো গণতন্ত্রের ভিত্তি, কারণ আমাদের বিশেষ ধরণের সমাজব্যবস্থা আমরা কারও উপর চাপাতে চাই না। চাই শুধু স্বাস্থ্য আর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অবস্থা আনতে, যা মানুষকে তাদের লক্ষ্য নির্বাচনে সাহায্য করতে পারবে। যে হাত ধরব, তাতে হাতকড়ি না পরিয়েই আমরা সাহায্য দিতে পারি। বাইরে থেকে রাশিয়ার মত বিপ্লবের পক্ষে উস্কানি দিতে পারিনা আমরা, কারণ আমাদের ইতিহাস আমাদের শিখিয়েছে যে, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি আসতে পারে শুধুমাত্র দেশের ভিতর থেকেই। আর আসতে পারে, মানুষের অধিকার মেনে নিয়েছে এমন সব বিধানের ভিত্তিতে, রাজনৈতিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে। আমাদের ইতিহাস অধিক হারে মানুষের জীবনযাপন মান উন্নয়নের জন্য—অধিক হারে ভাল খাদ্য, স্বাস্থ্য, অবসর সময়ে শিক্ষা, সাম্য এবং সুযোগের কথা বলেছে—স্থায়ী বিপ্লবের কোন নক্সা এঁকে দেয়নি।

দেশে কিভাবে আমাদের সমস্যাগুলির সমাধান হয়, তার উপরেই বিদেশে মার্কিন সরকারের শ্রদ্ধা পাওয়া না পাওয়া নির্ভর করে। এই সমস্যাগুলো হল অপরাধ এবং অপরাধ প্রবণতা, বস্তি এবং শিল্প সভ্যতার কার্যকলাপ, নাগরিকদের সকলকে সমানভাবে রক্ষা করা ও সুযোগ দেবার সমস্যা এবং বিশ্বে নেতৃত্ব করার মত অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও দায়িত্ববোধ। আন্তর্জাতিক মৈত্রী সম্পর্কে যত বড় বড় কথাই বলি না কেন, দেশে যা মেনে চলা হয় তার তার প্রভাব এর উপর পড়বেই।

সকলকের সঙ্গে ভাগ করে উপভোগের অত্যুগ্র আগ্রহে আমেরিকানরা প্রায়ঃশই পৃথিবীকে গণতন্ত্র সম্পর্কে "শিক্ষা" দেবার অবাস্তব ভূমিকা নিয়ে বসেন। কাজ ও ইন্দোনেশিয়া এবং গ্রীস ও ফিনল্যাণ্ডে যারা স্বাধীনতার জন্যে

লড়াই করেছেন, তাঁদের কিছু 'শেখাবার দরকার নেই'। এমন কিছু জোর করে বলার দরকারও নেই, যে প্রত্যেককে রাশিয়া বা আমেরিকা উভয়ের মধ্যে কোন একটাকে বেছে নিতে হবে। শতাব্দীর অধিককাল আমরা নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করেছি এবং তখনকার তুলনায় পৃথিবীর বুকে যদি অনেক বড় রকমের বিপদ এসে নামে, নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের আদর্শে কেউ নির্লিপ্ত থাকলে তাঁদের প্রতিও আমরা যেন সহানুভূতি দেখাই। এমন আশা করা উচিত হবে না যে আমাদের সাংগঠনিক রূপ অন্য দেশেও গড়ে তোলা সম্ভব হবে। শুধু পদ্ধতি আর মনোভাবের বিনিময়ের আশাই আমরা করতে পারি।

সারা দুনিয়া সানন্দে পশ্চিমের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা, সার্বজনীন শিক্ষার মান, আইনের ভিত্তিতে গঠিত সরকার, জনস্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা এবং ব্যক্তিগত অধিকার আর সেই সঙ্গে সরকারের জনকল্যাণ সাধনের দায়িত্ব মেনে নিয়েছে। কিন্তু পশ্চিমী সভ্যতারও অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে শিখবার অনেক কিছুই আছে।

প্রাচ্যের বৈশিষ্ঠ হল সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত নৈতিকতার চিরন্তন ধারা। সময় তার কাছে শান্ত পুকুর, গতিশীল নদী নয়। পশ্চিম যেখানে অতীতের সকল অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করে দেখতে আর জানতে চায়, পূর্ব দুনিয়া সেখানে সব-কিছুকেই অনন্ত অসীমের অংশ হিসেবে দেখে। তাই বিজ্ঞ যিনি তিনি কিছুকেই অবধারিত বলে ধরে নিতে পারেন না, কারণ আগে থেকে কোন পথে যাবেন ধরে রাখলে, অবস্থা পালটে গেলে তাঁকে পেছিয়ে আসতে হয়। বিশ্ব রাজনীতির উপর এ যুক্তির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হল এমন দৃষ্টিভঙ্গী, বিজ্ঞানের দিক থেকে সবিশেষভাবে অগ্রণী রাষ্ট্রসমূহের জীবনযাপনের উচ্চমান এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্বাসী পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের প্রাচ্যের সৌন্দর্যের প্রতি সংবেদনশীলতা মনের স্থিরতা, আধ্যাত্মিকতা ও অভিন্নতার মিলন ঘটাবে।

মার্কিন তুরীয়বাদীরা যেদিন থেকে জড়বাদকে আক্রমণ এবং প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক সম্পদ আহরণে মন দিয়েছেন, তখন থেকেই প্রাচ্যচিন্তা ও কলা, সম্পর্কে নীরব আগ্রহ দেখা গেছে। চীন থেকে দ্রুতগামী জাহাজে ধনরত্নাদি নিয়ে আসার সময় থেকেই মার্কিন আর্টে প্রাচ্যের প্রভাব প্রকাশ পেয়েছে। চিত্র এবং বিশেষ করে স্থপতিতে জাপানী প্রভাব অত্যন্ত বেশী এবং আরও বাড়ছে। প্রাচ্য দুনিয়ার ধর্মই এখানকার অনেক সম্প্রদায়ের ভিত্তিমূল। সকল বিখ্যাত বিশ্ব-

বিদ্যালয়েই দ্রুত প্রাচ্যবিদ্যা সম্পর্কে চর্চা শুরু হয়েছে। সৈন্যবাহিনীর লোকেরা এবং পর্যটকেরা অধিক সংখ্যায় প্রাচ্য দেশসমূহে গিয়ে সেখানকার সভ্যতা সম্পর্কে কিছু জ্ঞান নিয়ে ফিরে আসেন। আগে সাধারণ মানুষ পুস্তক আর চিত্রের মাধ্যমেই এই জ্ঞান অর্জন করত। 'হাওয়াই'-এ পূর্বপশ্চিমের মিলন হয়েছে অনেক স্তরে। সেখানকার মার্কিন সীমানায় জীবন সম্পর্কে প্রাচ্য প্রতীচ্যের দু'টি ধারণাই মিলে মিশে যাচ্ছে।

বিদেশভ্রমণ এবং প্রচার মাধ্যমগুলি কর্তৃক প্রচারিত সংবাদ প্রবাহের দৌলতে আমেরিকা আগের তুলনায় বাইরের পৃথিবীর অনেক বেশী নিকটে এগিয়ে এসেছে শ্রমিক, খামার, যুব, মহিলা এবং সেবা সংগঠনসমূহ পররাষ্ট্র সম্পর্কে সভ্যদের মধ্যে তথ্য বিতরণের উপর যথেষ্ট সময় দিয়ে থাকেন। এখনকার যে কোন সার্ভিস ক্লাব অথবা ইউনিয়নের যে কোন পত্রিকা খুললেই অনেকগুলো অন্ততঃপক্ষে একটা, প্রবন্ধ দেখবেন পররাষ্ট্র সম্পর্কের উপর। এই সংগঠনগুলো পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক বিষয়ে সচেতনতার ভিত্তিস্বরূপ। বৈদেশিক ঘটনাবলীর উপর এদের উদার সমালোচনা কংগ্রেসকে প্রভাবিত করে এবং শাসনযন্ত্রকে সমর্থন করে। ভালভাবেই প্রমাণিত হয়েছে যে মার্কিন জনমতের বড় রকমের ওলট পালট অতীতেই সম্ভব ছিল।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ, স্বেচ্ছাবাদ এবং কেন্দ্রীয়বাদের মার্কিন পদ্ধতি এগিয়ে চলেছে মার্কিন দায়িত্ববোধ এবং বিশ্বসমাজে যোগদানের চিন্তাধারার সঙ্গে। পল রাস এবং ক্লিফোর্ড ক্লিনটনের মতো সংগঠনের গোষ্ঠীর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সেবাকার্য এবং রাষ্ট্রসংঘ ও সহযোগী সংস্থার ছোট ছোট কেন্দ্রীয় সেবানীতি সময়ের প্রগতির প্রতীকস্বরূপ। আমাদের দুনিয়াটা এমন, যেখানে ভবিষ্যতের শক্তিসাম্য ততটা উল্লেখযোগ্য নয়, যতটা সংস্কৃতির বিনিময়—যা আমাদের নিয়ে চলেছে বিশ্ব সভ্যতা, বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ এবং আর্টের সংশ্লেষণের সাম্য, বৈষয়িক মান উন্নয়নের দিকে—যাতে সকলে তাদের বুদ্ধি এবং আত্মিক ঐতিহ্যকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারে।

১৯২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান বলতে বণ্ড অথবা শেয়ার বোঝাত —জর্জ সোল ঠিকই লক্ষ্য করেছেন। ত্রিশ দশকে নিরাপত্তা বলতে বোঝাল— বার্ধক্যের অথর্বতার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করা। চল্লিশ দশকে বোঝাল ডিক্টেটরের হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষা করা। পঞ্চাশ দশকে প্রায়শঃই বোঝান হল শক্তিশালী শত্রুর হাত থেকে রাষ্ট্রীয় গোপনতা রক্ষা। ষাট দশকে এর অর্থ

হতে পারে—যদি কার্যক্ষমতাকে আমরা কাজে লাগাই সৃজনী এবং প্রয়োজনীয় কর্মসূচীর পথে নিরাপদ হবে আমাদের জীবন।

ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ ইতিমধ্যেই বপন করা হয়েছে। মুক্ত সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছি আমরা। এতদিনের সংগঠনগুলোর পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করছি উন্নতি বিধানের আশায়। আমাদের স্বাধীনসমাজ এগিয়ে চলার গতিতে অনমনীয় হলেও, ঘরোয়া এবং বন্ধুভাব রয়েছে সেখানে। এ সমাজ তার বিরোধ ও অসঙ্গতির প্রতি সংবেদনশীল, ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা, বর্তমানের অবিচারে রুষ্ট হলেও আত্মিক, শারিরীক এবং মানসিক শক্তিতে উদ্দীপিত এর যৌক্তিকতা এর যৌবনের সৃষ্ট অবদান, এর আশাবাদ ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যের ফলস্বরূপ।

সম্ভবতঃ এ সম্পর্কে সব থেকে ভাল যা বলা যায় তা হল এর নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর বদলে আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, নিরাশার বদলে প্রেমের উপর জোর। ধ্বংস করতে নয়, নির্মাণ করতে চায়। শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীকে উস্কে দিতে চায় না। শ্রেণীবিভেদ মুছে ফেল্‌তে চায় ব্যবধান ঘুচাবার জন্যে বিশ্বের অপর্যাপ্ত উৎপাদনের বন্টন চায় না, উৎপাদনকে এমন উচ্চস্তরে নিতে চায় যা সামান্য কয়েকজন যা ভোগ করে, সবাইকে তা ভোগ করবার সুযোগ দিতে পারবে। যাদের শতাব্দীব্যাপী জীবন পুষ্টি হয়েছে শুধুমাত্র প্রতিবেশীর সহযোগীতায়, তারা সহজেই মেনে নিয়েছে নতুন পরিবেশই আজকের জগতের প্রতীক।